আনা লুইস্ স্ট্রং

স্তালিন যুগ

স্তালিন যুগ

আনা লুইস স্ট্রং

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড
৭২, মহাত্মা গান্ধী (হ্যারিসন) রোড, কলিকাতা ৯।

॥ প্রথম সংস্করণ ॥

জুলাই, ১৯৫৭



মূল্য : তিন টাকা ২৫ নয়া পয়সা

শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড হইতে প্রকাশিত। শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১২, মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

অনুবাদকের বক্তব্য

বিংশ পার্টি কংগ্রেসে খ্রুশ্চেভের প্রদত্ত অলিখিত বক্তৃতার রিপোর্ট বলে মার্কিন সরকারের বৈদেশিক দপ্তর থেকে যা প্রচারিত হয়, সেটা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আরো দশটা ধনিকতন্ত্রী দেশের মত এদেশেরও কাগজে কাগজে স্তালিনের সম্পর্কে একটা মূঢ় ও কুৎসিত নিন্দাবাদ শুরু হয়েছে। এ নিন্দা কতখানি ধোপে টেকে—সেটা আনা লুইস্ স্ট্রং এ গ্রন্থে বিচার করেছেন।

কোনো বিরাট বিপ্লবই—তা প্রকৃতিতেই হোক বা মানব-সমাজেই হোক—প্রথমে কল্যাণের রূপে আসে না; তার জন্যে রুদ্রের ঋণ পরিশোধ করতে হয়। অনুন্নত রুশিয়াকে সমস্ত ধনিকতন্ত্রী জগতের শত্রুতার মুখে আধুনিক সোবিয়েৎ রাষ্ট্রে পরিণত করতে গিয়ে, পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের বিজয়াভিযান নিশ্চিন্ত করতে গিয়ে, রুশিয়ায় স্তালিনের নেতৃত্বে যেসব অত্যাচার ঘটেছিল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে তৎকালীন অবস্থায় তাকে একান্তই স্বাভাবিক ও অনিবার্য বলে মনে হবে। স্তালিনের মহত্ত্ব এই যে, মানব-সমাজের কল্যাণের আদর্শে তিনি যে বিপ্লব-জয়ের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাকে তিনি সুদৃঢ় ও দুর্জয় করে গিয়েছেন। বিশ্বের মানুষ এই কারণেই স্তালিনের কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

স্তালিনের অত্যাচারকে যারা বড় করে তুলে ধরছে, তাদের বোঝা উচিত, ইতিহাসে স্তালিনের স্থান কোথায়? এদিকে অন্ধ থাকলে সত্যকে অস্বীকার করা হয়। আনা লুইস্ স্ট্রং এই গ্রন্থে সত্যের বিভিন্ন দিককে বিশদ করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয় বলে আমরা মনে করি। প্রকৃত স্বাধীনতা পশ্চাদ্‌পদ একটা জাতির অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে কী বিপুল কর্মোদ্যোগের সৃষ্টি করতে পারে, কর্মযজ্ঞের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সে জাতি জীবনের বিভিন্ন দিকে কী বিস্ময়কর অভাবিত পরিবর্তন ও অগ্রগতি সাধন করতে পারে, তা বুঝবার পক্ষেও এ গ্রন্থের দান অনস্বীকার্য।

বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে এই গ্রন্থের অনুবাদ পরিবেশন করতে পেরে আমরা গৌরব বোধ করছি। এ জাতীয় গ্রন্থ-অনুবাদের দায়িত্ব কত অপরিসীম, সেদিকে আমরা সর্বদা সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি।

প্রাক্-কথন

আমার মনে হয়, পিছনের দিকে তাকিয়ে, লোকে এ যুগটার নাম দেবে স্তালিন-যুগ। লক্ষ লক্ষ লোকে দুনিয়ার এই প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি গড়ে তুলেছে, সত্যি; তবু স্তালিন ছিলেন তার স্থপতি—তার ইঞ্জিনিয়ার। চাষীদের দেশ রুশিয়া যে এটা করতে পারে, [illegible] ভাবনাকে প্রথম ভাষা দেন স্তালিন। তারপর থেকে, এর সব কিছুর উপর—এর সকল সাফল্য ও সকল অকল্যাণের উপর পড়েছিল তাঁর [illegible] হাতের চিহ্ন।

এ যুগের আখেরী হিসেব নেওয়ার সময় এখনও হয়নি; তবু সে চেষ্টা না করলে নয়। কারণ, এ নিয়ে তর্ক উঠেছে, দুনিয়ার সর্বত্র অনেকের মনে সংশয় জেগেছে। সমাজতন্ত্র প্রথম গড়ে তোলার সময় যেসব অমানুষিক অন্যায় ও কঠোর উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, খ্রুশ্চেভ সেগুলো প্রকাশ করে ধরার ফলে সবচেয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সবচেয়ে ভাল লোক। তাঁরা প্রশ্ন করছেন: এর কি কোনো দরকার ছিল? এটাই কি সমাজতন্ত্রের অনন্য পথ? না, কোনো ব্যক্তিবিশেষের শয়তানী?

আমার মনে হয়, রুশরা এ প্রশ্ন করে না। তারা স্তালিনের আমলকে অনেক পিছনে ফেলে গড়ে চলেছে। অতীতকে তারা বিশ্লেষণ করছে ভবিষ্যতের পথকে সুগম করার জন্যে। তারা জানে, সমস্ত প্রগতির জন্যেই মানুষকে তার চরম মূল্য দিতে হয়; তার জন্যে বীরদেরই শুধু যুদ্ধে জীবনাহুতি দিতে হয় না, অন্যায়ভাবে অনেককে বলি পড়তেও হয়। তারা এ কথাও জানে যে, বিপ্লবের পরেই পশ্চিমী

জগৎ সামরিক হস্তক্ষেপের লড়াই চালিয়ে তাদের উপর যে দুর্ভোগ চাপিয়েছিল, হিটলারের আক্রমণে তাদের যে যন্ত্রণা ভুগতে হয়েছে, এমন কি, দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলবার প্রতিশ্রুতিপালনে আমেরিকা বিলম্ব করায় তারা যা ভুগেছে—সে সবের তুলনায় স্তালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র গড়ার সময় প্রয়োজনের তাগিদে বা দোষত্রুটির ফলে যে দুঃখকষ্ট তারা পেয়েছে, তা একান্তই তুচ্ছ। আমাদের পরামর্শ ছাড়াই তারা গাদের গলদগুলো সেরে নিতে পারবে।

পশ্চিমী বন্ধুদের কাছে আমার বক্তব্য : এ যুগটা ছিল ইতিহাসের একটা মহান্ গতিশীল যুগ, হয়তো মহত্তম যুগ। এ যুগ শ শুধু রুশিয়ার জীবন নয়, সমস্ত পৃথিবীর জীবন বদলে দিয়েছে। য যারা এ যুগ সৃষ্টি করেছে এ যুগ তাদের কারও জীবন অপরিবর্তিত রা খেনি। এ যুগ কোটি কোটি বীরের জন্ম দিয়েছে, তেমনি জন্ম দিয়ে ছে কিছু শয়তানেরও। ইতর লোকে এর পানে পিছন ফিরে ত তাকিয়ে এর দোষত্রুটির ফিরিস্তি তৈরি করতে পারে, কিন্তু যারা এ যুগের সংগ্রামের মধ্যে জীবন কাটিয়েছে, এমন কি সে দ্বন্দ্বে যারা প্রাণ খুইয়েছে, তারা সমাজতন্ত্র গড়ার মূল্য বলেই সেসব দোষত্রুটি সয়ে গিয়েছিল।

১৯৪০ সালের ইউরোপের কথা কি আমরা ভুলে যাব, যখন ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী এগারো দিনের মধ্যে হিটলারের আক্রমণে ধ্বসে পড়েছিল, যখন ইউরোপের চোখে ফুটে উঠেছিল আর একটা সহস্র-বর্ষব্যাপী অন্ধকার যুগের বিভীষিকা। 'দাস জাতি'গুলোর উপর 'প্রভু জাতির' আধিপত্যকে স্বভাবধর্ম বলে প্রচার করে যারা সমগ্র মানব-জাতির উপর আঘাত হেনেছিল, তাদের সে আক্রমণের কথা কি আমরা ভুলে যাব? স্তালিনগ্রাদের নর-নারীর উপর আছড়ে পড়ে সে আক্রমণ কি ভাবে চূর্ণ হয়েছিল সে কথা কি আমরা ভুলে যাব? মরিয়া হয়ে তারা তাদের শক্তি গড়েছিল, গড়তে গিয়ে অনেক কিছু তারা অযথা বরবাদ করেছিল, তবু তারা এমনি একটা শক্তি গড়ে নিয়েছিল, যা, সারা দুনিয়া যখন টলে পড়ছে, তখনও

খাড়া থাকতে পেরেছিল। এর জন্যে দুনিয়া আজ তাদের কাছে ঋণী।

শুধু এরই জন্যে নয়। স্তালিন-যুগ শুধু পৃথিবীর প্রথম সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রই গড়েনি, যে শক্তি হিটলারের গতিরোধ করেছিল শুধু সে-শক্তিই গড়ে তোলেনি, মানব-জাতির এক তৃতীয়াংশ আজ যেসব সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে, তাদেরও জন্যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছে এ যুগ। এশিয়া আফ্রিকার প্রাক্তন উপনিবেশগুলোর লোকে আজ যার জোরে, খোলাবাজারে তাদের বিকাশের পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা পেয়েছে সেই উদ্বৃত্ত ধন সৃষ্টি করেছে এ স্তালিন-যুগই। সুতরাং এ স্তালিন-যুগই তৈরি করেছে সেই ভিত্তি, যার উপর দুনিয়ার নানা জাতির স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য গড়ে উঠতে পারে, স্থায়ী শান্তির মধ্যে তাদের ঐক্য গড়ে উঠতে পারে। এ যুগের দোষত্রুটির কারণ ছিল অনেক: রুশিয়ার অতীতের যত অভ্যাস, শত্রুদের পরিবেষ্টনের চাপ, হিটলারের পঞ্চমবাহিনী এবং আংশিক ভাবে, এ যুগের নেতার চরিত্র—এ সবই তার জন্যে দায়ী। সবচেয়ে বড় কথা, এ সব দোষত্রুটি ঘটেছিল, কারণ পশ্চিমের গণতান্ত্রিক এবং যন্ত্রশিল্প-কুশল শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্র গঠনের কাজটা ছেড়ে দিয়েছিল একটা অশিক্ষিত, যন্ত্রশিল্পে একেবারে আনাড়ি, চাষী জাতের উপর—যে জাতির লোক জানত, সে কাজ করার মত যোগ্যতা তাদের নেই; আর তা জেনেও, সে কাজে যারা হাত দিয়েছিল।

আনা লুইস্ স্ট্রং

এক দেশে সমাজতন্ত্র

সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল পশ্চাদ্‌পদ একটা চাষীদের দেশে। অতীতের সকল মতবাদ অনুসারেই, তা হওয়া ছিল অসম্ভব। সমাজতন্ত্র বলতে বোঝায়, বা বোঝায় বলে মনে করা হত: উদ্বৃত্ত ধনের ভিত্তিতে গড়ে-তোলা সচ্ছল জীবন, যে জীবনে মানুষের স্বাধীনতা ও কৃষ্টি উত্তরোত্তর প্রসারিত হতে থাকবে। পুঁজিতন্ত্র যখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি পুরোপুরি বিকশিত করে ফেলবে, অথচ উদ্বৃত্ত মালের ঠিকমত বিলিব্যবস্থা করতে পারবে না, তখনই আসবে সমাজতন্ত্র—এই ছিল আগেকার ধারণা। তখন ধরে নেওয়া হত যে, সমাজতন্ত্র আনবে যন্ত্রশিল্প-কুশল শ্রমিকরা, যারা পুঁজিতন্ত্রের গলদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে, এবং সর্বজনের জন্যে প্রাচুর্য সৃষ্টি করার মত সমবেত শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকবে। তারা রাজশক্তি দখল করবে, উৎপাদনের জন্যে যা-কিছু প্রয়োজন সব জাতীয় সম্পত্তি করে নিয়ে, সেগুলোকে সকলের কল্যাণে ব্যবহার করবে। এ সব করার জন্যে কতখানা জোরজবরদস্তির দরকার হবে, তা নিয়ে ছিল তর্ক।

জার-শাসিত রুশিয়ায় উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল না, উদ্বৃত্ত ধনও ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধে রুশিয়া যখন বিপর্যস্ত হল, তার না ছিল তৈরী মাল, না যথেষ্ট খাদ্য। তখন সে দেশে কর্মকুশল শ্রমিক ছিল না, চাষীরা ছিল মধ্যযুগীয় অবস্থায় পড়ে। বলশেভিক পার্টি যে লেনিনের নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল, সেটা সমাজতন্ত্রের বিশেষ কোনো চাহিদা ছিল বলে নয়; জনসাধারণের 'শান্তি, জমি আর রুটি'র দাবি জানাবার মত আর কোনো শৃঙ্খলাবদ্ধ দল ছিল না বলে। দেশময় তখন বিশৃঙ্খলা—চাষীরা জমিদারদের জমি দখল করছে; কাঁচামালের অভাবে কারখানা বন্ধ হলে শ্রমিকরা উপবাসী থাকছে, সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে আসছে। এই সব শ্রমিক আর সৈন্যরা সোবিয়েৎ বা 'পঞ্চায়েৎ' খাড়া করেছিল তাদের দাবি

জানাবার জন্যে। লেনিন বললেন, এই সব সোবিয়েৎই হচ্ছে জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক শাসনের ভিত্তি। 'সব ক্ষমতা সোবিয়েৎগুলোর হাতে চাই'—এই রণধ্বনি তুলে বলশেভিকরা রাজশক্তি দখল করল।

শক্তি হস্তান্তর হল সোজা ভাবেই। সৈন্য আর শ্রমিকরা—টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, সরকারী অফিসগুলো দখল করে 'শীতকালীন প্রাসাদ' চড়াও করল। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে, শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের নিখিল রুশ সোবিয়েৎ কংগ্রেস—সে সময়ে এ কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল—নিজেকে রাজ-সরকার বলে ঘোষণা করে দিল। কালবিলম্ব না করে এ মহাসভা তিনটা বিধান জারী করল: শান্তি সম্পর্কে, জমি সম্পর্কে, রাষ্ট্রশক্তি সম্পর্কে। শান্তি সংক্রান্ত বিধানে, যুদ্ধরত সমস্ত গবর্নমেণ্টের কাছে—যুদ্ধ তখনও চলছে—শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রস্তাব করা হল। জমি সংক্রান্ত বিধানে, সমস্ত জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি করে দেওয়া হল; যারা চাষ করে, সে সম্পত্তিতে তাদের ব্যবহারকারী হিসাবে একটা স্বত্ব স্বীকার করা হল। রাষ্ট্রীয় শক্তি সংক্রান্ত বিধানে, সমস্ত ক্ষমতা সোবিয়েৎগুলোর হাতে ন্যস্ত করা হল। দেশের সমস্ত অঞ্চল থেকে স্থানীয় সোবিয়েৎ-নির্বাচনের টেলিগ্রাম আসতে লাগল। চাষীদের সোবিয়েৎগুলো নিজেদের কংগ্রেস ডেকে নতুন সরকারের সঙ্গে হাত মিলাল; এই নতুন সরকার নাম নিল সোবিয়েৎ সাধারণতন্ত্র।

ক্ষমতা দখল করা কঠিন হয়নি; একদিনেই হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতা ধরে রাখা অত সহজ হয়নি; তার জন্যে অনেক বছর লেগেছিল। সম্পত্তিচ্যুত জমিদার আর পূর্বতন সরকারী প্রধানেরা বৈদেশিক শক্তিবর্গের সাহায্যে সৈন্যবাহিনী গড়ল। জার্মানির কাইজার পোলাণ্ড ও বাল্টিক রাজ্যগুলো অধিকার করে নিলেন, ব্যারন ম্যানারহাইমকে একটা বিপ্লববিরোধী সরকার গড়তে সাহায্য করার জন্যে ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠালেন; শস্য, কয়লা, লোহা আর পেট্রল কেড়ে নেওয়ার জন্যে উক্রাইন আর উত্তর ককেশিয়াতেও তাঁর সৈন্য ঢুকল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর মেরুপ্রদেশের বন্দরগুলোতে, ব্লাদিভোস্তকের মধ্যে দিয়ে সাইবেরিয়াতে, ককেশাসে ও মধ্য এশিয়ায় সৈন্য পাঠাল। বহিঃ-শক্তিগুলোর এই সামরিক হস্তক্ষেপের লড়াই চলল ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত। সে লড়াই যখন শেষ হল, তখন ফিনল্যাণ্ড, পোলাণ্ড, লাৎভিয়া, এস্তোনিয়া আর লিথুনিয়া এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হয়ে রুশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; বেসারাবিয়া রোমানিয়ার দখলে গিয়েছে আর অবশিষ্ট রুশিয়ার উপর সোবিয়েৎগুলোর কংগ্রেসের শাসন চলেছে।

রুশিয়া তখন ফতুর হয়ে গিয়েছে; শস্য নেই, কাঁচামাল নেই, যন্ত্রপাতি নেই। চাষীদের ঘরে ঘোড়া-ভেড়া যা ছিল মারা হয়ে গিয়েছে, তাদের চাষের যন্ত্রপাতি যুদ্ধের সাত বছরে ক্ষয়ে গিয়েছে। ১৯২০ আর '২১ সালে পর পর দুই বছরে দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গিয়েছে। ভল্‌গা নদীর দু'পাশের অঞ্চল এককালে বেশ উর্বর ছিল। ১৯২১ সালে আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, দেখেছিলাম, পাঠশালা থাকলেও চাষীদের ছেলেরা পাঠশালায় যেতে পারছে না। চাষী ছেলেদের পায়ে জুতো নেই; পরনের বস্ত্র নেই। সে বছর সারা শীতকালটা তারা বাড়ির বড় উনুনের উপর গুটিসুটি মেরে বসে কাটিয়েছিল। তাদের পরনে ছেঁড়া ন্যাতা; ঘরের বাইরে বেরুবার উপায় ছিল না তাদের। দেশের আর্থিক অবস্থাকে চাঙ্গা করার জন্যে লেনিন 'নতুন আর্থিক নীতি' (নেপ্‌) প্রবর্তন করলেন। এই নীতি অনুসারে সমাজতান্ত্রিক, সমবায়মূলক, এমনকি পুঁজিতান্ত্রিক —সব রকম উৎপাদন প্রথাই বৈধ করা হল। রাষ্ট্রের হাতে রইল খনি, রেলপথ আর ভারী শিল্পগুলো;—এ সবেরই তখন ভীষণ দুরবস্থা। ছোটখাট শিল্পে, দোকানপাটে আর চাষবাসের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মালিকানা চলতে থাকল।

দেশে আবার প্রাণের সাড়া জাগল, কিন্তু লেনিনের জীবন এল ফুরিয়ে। ১৯২৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি যখন মারা গেলেন, তখনো রুশদের জীবনযাত্রার মান রয়েছে অনেক নীচু—এমনকি যুদ্ধের আগে জারের আমলের নীচু স্তরের মানের চেয়েও যথেষ্ট নীচু।

সাত বছরের যুদ্ধে শ্রমশিল্প ও কৃষিশিল্পের যে সাংঘাতিক অবনতি ঘটেছিল, রুশিয়া তা সেরে উঠতে পারেনি। শাসকদের পার্টি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে উৎসাহ দিলেও দেশ তখনো সমাজতন্ত্রী হয়নি। মূল শ্রমশিল্পগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছিল; শ্রমিকদের আত্মত্যাগের ফলে সেগুলো আবার সারানো হচ্ছিল; শ্রমিকরা প্রথম দিকে খাদ্য ছাড়া অন্য কোনো মজুরী নিত না, পরে অল্প মজুরীতে কাজ করত; সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্যে তারা তাদের ছুটির দিনগুলোতেও ইঞ্জিন, রাস্তায় চলা গাড়ি ও অন্য নানারকম সাজসরঞ্জাম তৈরি করত। সাধারণের সম্পত্তির প্রতি শ্রমিকদের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করে লেনিন ঠিকই করেছিলেন। তবু শ্রমশিল্প ও ব্যবসাবাণিজ্যের একটা বড় অংশ ছিল পুঁজিতন্ত্রী। বিশেষ করে চাষবাস ছিল ছোট ছোট মালিকদের হাতে; তাদের মধ্যে যারা ছিল সবচেয়ে প্রবল তারা ছিল ক্ষুদে ধনিক। তাদের বলা হত—কুলাক। তারা অন্য চাষীদের ঘাড় ভেঙে, রাষ্ট্রকে ঠকিয়ে বেশ ফেঁপে উঠছিল। লেনিন নিজে বললেন, এ রকম অবস্থা যতদিন থাকবে, ততদিন পুঁজিতন্ত্রেরই আর্থিক ভিত্তি বজায় থাকবে, সমাজতন্ত্রের নয়।

তা সত্ত্বেও, লোকে লেনিনের কাছ থেকে এই স্বপ্নের ছোঁয়াচ পেয়েছিল যে, সমাজতন্ত্র প্রবর্তিত হলে রুশিয়া পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। সকলেই জানত, তার জন্যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। তবে তারা মনে করেছিল, রুশিয়াকে এককভাবে সমাজতন্ত্র গড়তে হবে না। তারা ভেবেছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের অবসন্নতা আর রুশিয়ার দৃষ্টান্ত ইউরোপের একাধিক দেশে, বিশেষ করে জার্মানিতে, বিপ্লব ঘটাবে; রুশ শ্রমিকদের চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষিত এবং যন্ত্রশিল্পে নিপুণ জার্মান শ্রমিকদের সাহায্যে ইউরোপে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। একাধিকবার, ১৯১৭ সালে, '১৮, '২০ ও '২৩ সালে জার্মানিতে এই বিপ্লব আসন্ন বলে বোধ হয়েছিল। লেনিন জীবিত থাকতে, কোনো উন্নত দেশের সাহায্য ব্যতিরেকেই রুশিয়া সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে

পারবে কিনা, এ প্রশ্ন বাস্তব রাজনীতিতে ওঠেনি। যখন উঠল, ১৯২৪ সালে যখন এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু হল, অধিকাংশ বলশেভিক পণ্ডিতরা মত দিলেন, রুশিয়া তা পারবে না।

বাইরের সাহায্য ছাড়াও রুশিয়াতে যে সমাজতন্ত্র গড়া যেতে পারে, এ ধারণা স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন যোশেফ স্তালিন, ১৯২৪ সালের অগস্ট মাসে। এর কয়েক মাস আগে, তিনি ঠিক এর উল্টো কথাই বলেছিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, "সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন গড়ে তোলার জন্যে কোনো একটিমাত্র দেশের, বিশেষতঃ রুশিয়ার মত একটি চাষীদেশের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়; তার জন্যে দরকার কয়েকটা উন্নত দেশের শ্রমিকশ্রেণীর চেষ্টা।"* অগস্ট মাসে কিন্তু ট্রট্স্কির মত খণ্ডন করতে গিয়ে স্তালিন বললেন যে, সোবিয়েৎ সরকার রুশিয়াকে উন্নত করে তুলতে পারবে, সমাজতন্ত্র গড়ে তুলতে পারবে; তার জন্যে কোনো বৈদেশিক শ্রমিকশ্রেণীর সাহায্য না পেলেও চলবে; কারণ, এ কাজে সরকার কৃষকসহ দেশের অধিকাংশের সমর্থন পাবে। নিজের মতের এই স্ববিরোধিতার ব্যাপারটি স্তালিন লক্ষ্য করেছিলেন বলে মনে হল না, এবং তাঁর এই প্রস্তাব যে উত্তরকালে মহা গুরুত্ব লাভ করবে, সে সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ তখনো তিনি সচেতন ছিলেন না। নিজের আগেকার কোনো মতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার দরকার তাঁর ছিল না। কারণ তখনো তাঁকে একটা বড় গোছের তত্ত্ব-বিশারদ বলে মনে করা হত না। তাঁর দক্ষতা ছিল সংগঠনে। তিনি ছিলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক, সুতরাং সমস্ত শ্রমিক আর চাষীদের সঙ্গে তাঁর যোগ না থাকলেও দেশের নাড়ী বোঝার, তার অন্তরের ব্যাকুল কামনা বোঝার সুযোগ তাঁর ছিল।

অতএব স্তালিন যে কোনো পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব প্রচার করলেন, তা নয়; তিনি প্রকাশ করলেন লোকের অন্তরে নিজেদের দেশকে গড়ে তোলার জন্যে যে ব্যাকুলতা জেগেছিল সেই ব্যাকুলতা, আর তারা যে অন্য

---

* প্রোব্লেম্স্ অব লেনিনিজ্‌ম্—জোশেফ স্তালিন, ইণ্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ৬১

দেশের সহায়তা ছাড়াই তা করতে পারে, তাদের সেই বিশ্বাস। বিপ্লবের পরের সাত বছরে বলশেভিকরা রাষ্ট্র-চালনা সম্পর্কে একটা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছিল। যাদের একটা বিপ্লবও শেষ পর্যন্ত সফল হল না সেই ইউরোপীয় শ্রমিকদের উপর তাদের সমাজতন্ত্রের আশা নির্ভর করবে, এ চিন্তা তাদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। স্তালিন যখন বললেন যে, রুশরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, যে-কোনো সমাজপ্রথা তাদের পছন্দমত গড়ে তুলতে পারে; তখন তাঁর কথা বিপ্লবকে একটা স্থায়ী লক্ষ্য দিল, লোককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে গঠনের কাজে আহ্বান জানাল। জিনোভিয়েভ আর কামেনেভকে তখন বলশেভিক পার্টির নীতিনির্ধারক পণ্ডিত বলে মেনে নেওয়া হত; তাঁরা বুঝলেন না যে, একটা নতুন জোরদার তত্ত্বের আমদানি হল। ১৯২৫ সালে, স্তালিন যখন চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসকে তাঁর এ প্রস্তাবটি রীতিমাফিক মঞ্জুর করতে অনুরোধ করলেন, কংগ্রেসের সমর্থন পেতে তাঁকে বেগ পেতে হল না। কয়েক মাস পরে, পার্টির দু'জন তত্ত্ববিশারদ এই নতুন তত্ত্বের অর্থ বুঝলেন। তাঁরা বললেন, গোঁড়া মার্ক্সীয় মতের জায়গায় 'জাতীয় সাম্যবাদ' ঢোকানো হয়েছে। অতঃপর ট্রট্স্কিও এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

রুশরা পঁচিশ বছর ধরে যে নীতি অনুযায়ী চলল, সে নীতি যিনি প্রায় ঘটনাচক্রেই স্পষ্ট করে ধরলেন, তিনি—সেই যোশেফ স্তালিন কিন্তু নিজে জাতিতে রুশ ছিলেন না। তিনি ছিলেন জর্জিয়ান, রুশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত একটা দক্ষিণী জাতির লোক। স্তালিনের বাবা ছিলেন মুচি; কোনো অভিজাতের ভূদাস হয়ে জন্ম হয়েছিল স্তালিনের বাবার। স্তালিনের উদ্ভব হয়েছিল একটা নিপীড়িত জাতির একটা নিপীড়িত শ্রেণীতে—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অধিকাংশ বলশেভিক নেতা থেকে বিশেষ। নয় বছর বয়সে তিনি একটা ধর্মীয় পাঠশালায় ভর্তি হন; কিছুদিন আগেও ছোট জাতের ছেলেদের সে পাঠশালায় নেওয়া হত না। শিক্ষকরা দেখলেন, ছেলেটা লেখাপড়ায় খুবই ভাল, তবে তার মধ্যে নিজেকে জাহির করার একটা ঝোঁক,

অন্থদের ছাড়িয়ে ওঠার জন্যে একটা ব্যগ্রতা বেশ প্রবল। পাঠশালার শিক্ষক আর স্থানীয় পাদ্রী সাহেবের আনুকূল্যে বালক যোশেফ একটা ছাত্রবৃত্তি পেয়ে তিফ্‌লিসের 'ধর্ম বিদ্যালয়ে' পড়ার সুযোগ পান; এ প্রতিষ্ঠানটা রাখা হয়েছিল জর্জিয়ানদের রুশীয় ভাবাপন্ন করে তোলার জন্যে। ১৮৯৪ সালে, প্রায় ১৫ বছর বয়সে, স্তালিন এখানে ভর্তি হন। এখানে এসে তিনি কঠোর শাসনের মধ্যে পড়লেন; ছাত্রদের একান্ত ব্যক্তিগত কাজের উপরও শিক্ষকরা শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন; অ-ধর্মীয় কোনো বই পড়া ছাত্রদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। তৃতীয় বৎসরে ভিক্টর হুগোর বই পড়তে গিয়ে ধরা পড়ায় তরুণ যোশেফকে একটা চোরা কুঠরিতে আটক রাখা হয়। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি কিন্তু আরও ভয়ানক রকমের নিষিদ্ধ বই পড়া শুরু করলেন। সেসব বইএর মধ্যে কার্ল মার্ক্‌সের লেখা একটা বইয়ে তিনি পড়লেন, "দার্শনিকরা জগতের শুধু ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, আমাদের কাজ হচ্ছে জগৎকে বদলে ফেলা।" তিনি একটা গুপ্ত সমাজতন্ত্রী দলে যোগ দিয়ে রেলওয়ে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করলেন। ফলে, ১৮৯৯ সালে 'ধর্ম বিদ্যালয়' থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

এর বহু বছর পরে স্তালিন বলেছিলেন, "আমি মার্ক্‌সবাদী হয়েছিলাম আমার বিশেষ সামাজিক অবস্থিতির দরুণ······আর ধর্ম বিদ্যালয়ে থাকতে যে কঠোর গোঁড়ামি আমাকে একেবারে পিষে মারছিল, তার দরুণও।"

তরুণ জর্জিয়ান শ্রমিক সংগঠক হলেন, নানা বিপদের মধ্যে নানা ছদ্ম নামে তাঁকে থাকতে হত। তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে একটা নাম দিয়েছিলেন 'স্তালিন' অর্থাৎ ইস্পাতে-গড়া মানুষ—এ নামটি রয়ে গেল। লেনিনের মতামত পাঠমাত্র তিনি সেগুলো গ্রহণ করলেন; তারপর থেকে তিনি লেনিনের পাকা সমর্থক হয়ে গেলেন। কয়েকবার তিনি গ্রেফ্‌তার হলেন। চার বার তাঁকে মেরু অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাসনে পাঠানো হল, প্রত্যেক বার তিনি পালিয়ে এলেন। পঞ্চম বারে, ১৯১৩ সালে তাঁকে পাঠানো হল এশিয়ার দূরতম উত্তর অঞ্চলে,

য়েনেসি নদী যেখানে উত্তর মহাসাগরে এসে পড়ছে। বিপ্লব এসে মুক্তি দেওয়ার আগে তিনি সেখান থেকে বেরুতে পারেননি। নির্বাসনে থাকতে তিনি অনেক পড়লেন, লিখলেন। বিশেষ করে নিজে রুশদের শাসনাধীন জর্জিয়ান হওয়ায়, সেখানে থাকতে তিনি ছোট ছোট জাতিগুলোর বিশেষ সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করলেন। তাঁর কৃত জাতি-সমস্যার এই সমাধান অন্য বলশেভিক সহকর্মীদের নজরে এল। ১৯১৭ সালে তাঁরা যখন রাষ্ট্রশক্তি দখল করল, স্তালিনকে তাঁরা নতুন রাষ্ট্রের অ-রুশীয় জাতিগুলির সমস্যা সংক্রান্ত দপ্তরের কমিশনার (ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী) করে নিলেন।

১৯২২ সালে, স্তালিন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হলেন। ঐ পদ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ, এই পদে থেকে যে কত-কী করা যায়, তা স্তালিন দেখানোর আগে পর্যন্ত কেউ ঠিক বুঝত না। এ কাজের জন্যে তাঁকেই স্বভাবতঃ বেছে নেওয়া হল। কারণ, জারের অত্যাচারের সময়, প্রায় সব নেতাই ইউরোপে ছিলেন; যেসব দেশে বাক্-স্বাধীনতা ছিল সেখানে থাকায় লেখক বা বক্তা হিসেবে তাঁরা গড়ে উঠেছিলেন। স্তালিন জারের রুশিয়ায় গুপ্তভাবে সংগঠন করতে শিখেছিলেন, সুতরাং তিনি যে অস্ত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন সেটা বক্তৃতা বা লেখা নয়,—ঘনিষ্ঠ সুসং ঠিত সংযোগ, যে ধরনের সংযোগে লোকের জীবনমরণ নির্ভর করত তাদের সহকর্মীদের উপর।

পার্টির সাধারণ সম্পাদক এবং পোলিট-ব্যুরোর সদস্য হিসেবে, স্তালিন হয়ে পড়লেন পার্টির প্রধান পাঁচজনের অন্যতম। লেনিন, কামেনেভ, ট্রট্স্কি, বুখারিন, স্তালিন—এই পাঁচজনে সমস্ত নীতিনির্ধারণ করতেন। লেনিন প্রধান বলে স্বীকৃতি পেতেন; কামেনেভ বহু কাজেই ছিলেন তাঁর সহকারী। ট্রট্স্কি উপর ভার ছিল গৃহযুদ্ধ-চালনার, আর বুখারিনের উপর ছিল সংবাদপত্র ও প্রচারের ভার। জিনোভিয়েভ পরে পোলিট-ব্যুরোতে স্থান পান—কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের সভাপতি হিসেবে ছিল তাঁর মর্যাদা। এই

নেতাদের কেউই স্তালিনের হাতে পার্টি-সংগঠনের মত দৈনন্দিন ঝক্‌মারির কাজ ছেড়ে দিতে গররাজী ছিলেন বলে বোধ হয় না-- প্রথম দিকে ও-কাজে বলতে গেলে, কোনো নাম ছিল না। স্তালিন কি ভাবে ক্রম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে জাতির উপর পার্টিকে প্রতিষ্ঠিত করছেন এবং পার্টি-যন্ত্রকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছেন—সেদিকেও কারো নজর ছিল বলে বোধ হয় না। স্তালিনও যে আগে থেকে মতলব এঁটে এসব করেছিলেন, তাও সম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু পার্টি-যন্ত্রটা নাড়াচাড়া করতে পেয়ে তিনি পার্টিকে আর পার্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলেন।

গত বিশ বছরের মধ্যে, আইজাক ডয়ট্‌সের আলোচনা-গ্রন্থের মত এমন অনেক বই বেরিয়েছে—যাতে, কোন্ কোন্ রাজনৈতিক চাল চেলে স্তালিন লেনিনের অধীনে তাঁর শক্তির ভিৎ পাকা করে নেন এবং লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিচ্ছিন্ন ও উৎখাত করেন, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। আমি কেবল কয়েকটা ঘটনার উপর নজর দিচ্ছি, যেগুলোতে স্তালিনের পরবর্তী কালের কাজের গুণ এবং দোষ দুই-ই প্রতিফলিত দেখা যায়। ১৯২২ সালে, স্তালিনের উপর রুশিয়ার জন্য একটা সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হয়। সে সংবিধানের বলে, রুশিয়া পরে সোবিয়েৎ সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রগুলোর ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। এই সংবিধানের যে মূল খসড়া লেনিন দেখে দেন এবং মঞ্জুর করেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্র ছিল দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার, বৈদেশিক বাণিজ্য, রেলপথ ও যানবাহনব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ। রাজনৈতিক পুলিস সমেত পুলিস-দপ্তরের ভার দেওয়া হয়েছিল সাধারণতন্ত্রগুলোর স্থানীয় সরকারের হাতে।

ঐ বছরের শেষদিকে, স্তালিনের নিযুক্ত লোকেরা জর্জিয়ায় একটা প্রবল্ প্রতিপক্ষের বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং রাজনৈতিক পুলিসকে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের জেলে ভরার ব্যবস্থা করেন। ডিসেম্বর মাসে সংবিধানটি শেষ পর্যন্ত যে আকারে গৃহীত হল, তাতে দেখা গেল,

কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক পুলিসের ভার দেওয়া হয়েছে মস্কোর হাতেঃ প্রতি সাধারণতন্ত্রে থাকবে এই কেন্দ্রীভূত দপ্তরের শাখা।

সুতরাং, রাজনৈতিক পুলিসের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্যে স্তালিনই দায়ী। জর্জিয়ায় বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যে নিষ্করুণ ব্যবহার তিনি করেছিলেন, তাই নিয়ে লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম ও একমাত্র খটাখটি বাধে। লেনিনের আয়ু তখন শেষ হয়ে আসছে।

রোগশয্যায় শুয়ে লেনিন জর্জিয়াতে স্তালিনের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে যেসব সংবাদ পেয়েছিলেন, লেনিনের বিখ্যাত 'উইলের' সঙ্গে সে-সংবাদের যোগটা বোঝা দরকার। লেনিনের অসুখ তিনবার সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। ১৯২২ সালের মে মাসে, প্রথম বার। সে বারের ধাক্কা মোটামুটি সামলে নিয়ে তিনি কাজে যোগ দেন এবং সংবিধানের প্রথম খসড়া দেখে দেন ও মঞ্জুর করেন। শরৎকালের শেষদিকে তাঁর অসুখ আরও বেড়ে ওঠে; যা হোক, তিনি মুন্সীকে দিয়ে নির্দেশ লেখানোর মত শক্তি ফিরে পান। মৃত্যু আসন্ন বুঝে, ঐ সময় তিনি একটা স্মারক-লিপি তৈরি করেন; তিনি মুখে বলে যান, মুন্সী লিখে নেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি পার্টির মধ্যে 'অদূর ভবিষ্যতে একটা ভাঙনে'র ইঙ্গিত দেন। সে প্রসঙ্গে তিনি 'সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাবান দুই নেতা' ট্রট্স্কি ও স্তালিনকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে উল্লেখ করেন। এই লিপিতে স্তালিনের চেয়ে ট্রট্স্কির সম্পর্কেই বিরূপ সমালোচনা বেশী ছিল; দু'জনের কারও উপর লেনিন কোনো মন্দ অভিসন্ধি আরোপ করেননি; কোনো পরামর্শও দেননি। তার কয়েক দিন পরে, ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর স্তালিন যখন বিজয়-উল্লাসের সঙ্গে 'সোবিয়েৎ সাধারণতন্ত্র ইউনিয়ন'-স্থাপনকারী কংগ্রেসে (সোবিয়েৎ মহাসভায়) তাঁর রচিত সংবিধান মঞ্জুর করাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় লেনিন মুখে মুখে কয়েকটা 'নোট' দেন—সেগুলোতে জর্জিয়ার অত্যাচারের জন্যে স্তালিনকে তিনি 'রাজনৈতিকভাবে দায়ী' করেন। ছ' দিন পরে, ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে তিনি তাঁর এই শেষ-ইচ্ছাজ্ঞাপক লিপিতে—

উইলে—এ পর্যন্ত যা বলেছেন, তার চেয়ে কড়া কয়েকটা কথা যোগ করে দেন ঃ

> "স্তালিন অতিবেশী রূঢ় ; এ দোষ…সাধারণ সম্পাদকের ক্ষেত্রে অসহ্য। আমি কংগ্রেসের কাছে প্রস্তাব করি যে স্তালিনকে ও-পদ থেকে সরিয়ে এমন কাউকে নিযুক্ত করা হোক যিনি (স্তালিনের চেয়ে) আরও ধৈর্যশীল, (আদর্শের প্রতি) আরও শ্রদ্ধাশীল, যিনি আরও বিনয়ী এবং সহকর্মীদের প্রতি আরও মনোযোগী।"

দেখা যাচ্ছে, দু' সপ্তাহের মধ্যে স্তালিনের প্রতি লেনিনের মনোভাব কঠোর হয়ে উঠেছিল, সম্ভবতঃ সংবিধান-রচনাকারী কংগ্রেসে যেসব প্রতিনিধি এসেছিলেন তাঁদের কাছে সংবাদ পাওয়ার ফলে। লেনিন এ স্মারকলিপি প্রকাশ করেননি ; শুধু তাঁর স্ত্রী আর মুন্সী এটার কথা জানতেন। কারণ, স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তিনি আবার সব দেখাশোনা করতে শুরু করেছিলেন। লেনিন ভাল করে খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে কামেনেভকে জর্জিয়া পাঠালেন ; জর্জিয়ার 'বিরোধীপক্ষকে' তিনি বলে দিলেন যে, তিনি নিজেই তাদের অভিযোগগুলো কংগ্রেসে পেশ করবেন। এ সবের মাঝখানে, ৮ই মার্চ তারিখে লেনিনের অসুখ তৃতীয়বার বেড়ে গেল। তার ফলে, কোনো রাজনৈতিক কাজ করার সামর্থ্য তাঁর থাকল না—যদিও মৃত্যু এল প্রায় এক বছর পরে। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে যখন পার্টি কংগ্রেস বসল, তখন স্তালিনের বিরুদ্ধে বলবার জন্যে তিনি হাজির থাকতে পারলেন না। স্তালিন অনেকগুলো ব্যাপারে মানিয়ে চলার আপোসমূলক মনোভাব দেখানোতে, ট্রট্স্কিও তাঁকে আক্রমণ করলেন না।

কংগ্রেসের দুটো ঘটনা থেকে স্তালিনের শক্তি ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ঘটনা ঃ তিনি তাঁর সম্পাদকীয় রিপোর্টে দেখালেন যে, পার্টি জনজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার লাভ করছে। আগে জেলা ট্রেড ইউনিয়নের কর্মচারীদের শতকরা

২৭ জন ছিল কমিউনিস্ট, এখন হয়েছে শতকরা ৫৭ জন ; আগে সমবায় সংস্থাগুলোর চালকদের শতকরা ৫ জন ছিল কমিউনিস্ট, এখন হয়েছে শতকরা ৫০ জন ; সৈন্যবাহিনীর নায়কমণ্ডলীতে আগে কমিউনিস্ট ছিল শতকরা ১৬ জন, এখন হয়েছে ২৪ জন। সব সংগঠনই পার্টির নিয়ন্ত্রণে আসছে। দ্বিতীয় ঘটনা ঃ—এক সমালোচক পার্টির মধ্যে আরও বেশী আলোচনার স্বাধীনতা দাবি করায়, স্তালিন জবাব দিলেন যে, "পার্টি বিতর্ক-সভা নয়", রুশিয়াকে "চারপাশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী নেকড়েরা ঘিরে রেখেছে, সমস্ত জরুরী বিষয় পার্টির বিশ হাজার সেল্-এ আলোচনা করার অর্থ হবে শত্রুদের কাছে নিজেদের সমস্ত চাল খুলে ধরা।" কংগ্রেসে স্তালিন প্রত্যেক বিষয়ে জয়ী হলেন। কংগ্রেস শেষ হওয়ার পর, যখন ধর্মঘট শুরু হল, ছোট ছোট গুপ্ত দল আবিষ্কৃত হল, রাজনৈতিক পুলিস তখন বিরোধী মতের লোকদের গ্রেফ্তার করতে দ্বিধা করল না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লেনিন মারা যাওয়ার আগেই স্তালিন পার্টি-যন্ত্রটাকে মনের মত করে তৈরি করে নিয়েছিলেন ; সে পার্টি শুধু শাসন-কার্যের উপরই নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে চলছিল তা নয়, সমস্ত সাধারণ সংগঠনের উপর তার এক্তিয়ার বাড়িয়ে যাচ্ছিল ; নিজের এই ক্ষমতালাভকে সে বিপ্লব ও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন বলে মনে করছিল। সংবিধানের মাধ্যমে স্তালিন কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত একটা রাজনৈতিক পুলিসও স্থাপন করেছিলেন ; এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, আলোচনার স্বাধীনতা আর স্তালিনের চোখে যা জাতীয় নিরাপত্তা—এই দুইয়ের মধ্যে কোনোরকম বিরোধ বাধলে, স্তালিন স্বাধীনতার চেয়ে নিরাপত্তাকেই আমল দেবেন।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখে লেনিন যখন মারা গেলেন, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভার নিলেন স্তালিন ; তাঁকে শববাহীদের মধ্যে সর্বাগ্রে দেখা গেল, আর লেনিনের বিধবা পত্নী ও আরও কয়েকজন বলশেভিক বুদ্ধিজীবীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে স্তালিন মস্কোর 'রেড স্কোয়ারে' লেনিনের সমাধিমন্দিরের ব্যবস্থা করলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি

লেনিনের নিরভিমানতা ও অনাড়ম্বরতা থেকে দূরে গেলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয়-ভাবাপন্ন অন্য বলশেভিকদের চেয়ে তিনি ভাল ভাবেই বুঝলেন যে, রুশিয়ার লোকে—তখনও তারা অনেকাংশে চাষী—একটা 'পীঠস্থান' এবং একজন নরদেবতাই চায় ; এগুলো তাদের চিত্ত স্পর্শ করবে। লক্ষ লক্ষ সরল লোক এই সমাধিমন্দির 'দর্শন' করতে যাওয়ায়, লেনিনকে দর্শন করে বুকে বল পাওয়ায়—স্তালিনের মতের সত্যতা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে।

লেনিনের 'উইল' সত্ত্বেও, নিজেকে লেনিনের প্রধানতম শিষ্য এবং স্বাভাবিক উত্তরাধিকারী মনে করার কারণ স্তালিনের ছিল। তিনি ছিলেন বিশ বছরের বলশেভিক, দশ বছর লেনিনের কেন্দ্রীয় সমিতির (সেন্ট্রাল কমিটির) সভ্য এবং লেনিনের প্রত্যক্ষ অধ্যক্ষতায় ছ'বছর ধরে বিপ্লবের ঝঞ্ঝার মধ্যে কাজ করেছিলেন। শেষ দিকের সংঘর্ষটা লেনিনের অসুখের দরুণ একটা ভুল বোঝাবুঝি মাত্র এবং লেনিন সেরে উঠলে সেটা দূর করা যেতে পারত মনে করা স্তালিনের পক্ষে সহজ ছিল। অন্য সব নেতার সঙ্গে লেনিনের যে সংঘর্ষ ঘটেছে, সেগুলো এর চেয়ে অনেক গুরুতর। ট্রট্স্কি বছরের পর বছর লেনিনের বিরোধিতা করেছেন, বিপ্লবের মুখে এসে তিনি লেনিনের সঙ্গে হাত মেলান। জিনোভিয়েভ আর কামেনেভ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে মত দিয়ে, প্রতিপক্ষের সংবাদপত্রে খুঁটিনাটি সব বৃত্তান্ত ফাঁস করে দিয়ে বিদ্রোহের সময়েই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। লেনিন তাঁদের সকলকেই মাফ করেছিলেন। লেনিনের বিরুদ্ধে তাঁরা যেসব পাপ করেছিলেন সেগুলোর তুলনায়, নিজের অপরাধকে সামান্য মনে করাতে স্তালিনকে দোষ দেওয়া যায় না।

১৯২৪ সালের ৪ঠা মে তারিখে কেন্দ্রীয় সমিতির পূর্ণ অধিবেশনে লেনিনের উইল যখন পড়া হল—আগামী পার্টি কংগ্রেসে সেটার কথা জানান হবে কি না বিবেচনা করার জন্যে, তখন জিনোভিয়েভ ও কামেনেভের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপন করে স্তালিন রেহাই পেলেন। এই দু'জন পুরানো বলশেভিকের ভয় ছিল, ট্রট্স্কি 'বোনাপার্ট' হয়ে উঠতে

পারে; ট্রট্স্কির তুলনায় স্তালিনকে সাধারণ স্তরের লোক ভেবে তাঁর সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ ভয় ছিল না। সে সময়, স্তালিনের বক্তব্য ছিলঃ এককভাবে কেউ লেনিনের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, কয়েকজনের কমিটিই শুধু তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারে। স্তালিনের এ প্রস্তাবে কোনো উচ্চাশার গন্ধ ছিল না। কাজেই, জিনোভিয়েভ গত কয়েক মাসের 'সুষ্ঠু সহযোগিতার' কথা বললেন; তিনি বললেন, 'লেনিনের ভয় অহেতুক প্রমাণিত হয়েছে বলতে পারায় আমি সুখী'। তিনি প্রস্তাব করলেন, লেনিনের উইলটা সাধারণভাবে প্রচার না করে বাছা বাছা কয়েকজন প্রতিনিধির কাছে জানানো হোক। এ প্রস্তাবের পক্ষে ৪০ জন মত দিলেন, বিপক্ষে ১০ জন। স্তালিনের ক্রমবর্ধমান শক্তির সব চেয়ে বড় ফাঁড়া এইভাবে কেটে গেল।

পরের কয়েক বছরে স্তালিন তাঁর শক্তি মজবুত করে নেন। কয়েকটা নীতিসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ সংকল্প গ্রহণের সময়, তিনি একজনের পর একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত এবং শেষ পর্যন্ত পোলিট ব্যুরো (রাজনৈতিক চক্র) থেকে বিতাড়িত করেন—প্রথমে ট্রট্স্কিকে, তারপর জিনোভিয়েভ ও কামেনেভকে, এবং তারও পরে বুখারিন ও রাইকভকে। প্রত্যেকটি বিরোধী নেতা স্তালিনের উপর স্বেচ্ছাচারিতার দোষ আরোপ করেছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকবার স্তালিন পোলিট ব্যুরোর অধিকাংশ সদস্যকে স্বপক্ষে আনেন আর ব্যাপক সমর্থনও পান। তবু, প্রত্যেকটি প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে, ভিন্ন মত পোষণ করার অধিকার সম্পর্কে ক্রমেই বেশী করে আপত্তি উঠতে থাকে। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাস নাগাদ, পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেস ঘোষণা করেঃ "বিরোধীপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা পার্টির সদস্যপদের সঙ্গে খাপ খায় না"। প্রত্যেকবার বিজয়ের পর স্তালিন পরাজিত প্রতিপক্ষের সঙ্গে মিটমাট করার চেষ্টা করেন; তাঁরা 'অনুশোচনা' করলে ভুল সংশোধন করে নিলে, তিনি তাঁদের পুনরায় পোলিট ব্যুরোয় স্থান দেন। (ট্রট্স্কি যখন নতিস্বীকার করতে রাজী হলেন না, স্তালিন প্রস্তাব করলেন, তাঁকে রুশিয়া থেকে নির্বাসিত

করা হোক। তাই করা হল।) এইভাবে, 'পার্টির মতবাদে'র বিরুদ্ধে যাওয়া একটা অপরাধ বলে গণ্য হতে লাগল। তবে, বিভিন্ন 'বিরোধী দলে'র অধিকাংশ সদস্যই স্বতন্ত্রভাবে 'ভুলের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে' তাঁদের পূর্বপদে বহাল থাকলেন এবং স্তালিন তাঁদের উপর যে কাজের ভার দিলেন সে কাজ করে চললেন।

এখানে স্তালিনের রাজনৈতিক চালের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হল, তা থেকে শুধু প্রক্রিয়াটি বোঝা যায়। রাজনীতিতে, রাষ্ট্র ও ট্রেড ইউনিয়ন—দু'য়েতেই এ রকমের চাল হামেশাই দেখা যায়। স্তালিন চালে পাকা ছিলেন, কিন্তু শুধু তা থেকেই তাঁর উত্থান বা তাঁর মহৎ কাজের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয়, তাঁর উত্থান সম্ভব হয়েছিল তাঁর চরিত্রের দু'টো বিশেষ গুণের জন্যে, যে দু'টো গুণ যেসব মানুষ নেতা হন তাঁদের সকলেরই থাকে। তা ছাড়া তাঁর আর একটা অসাধারণ গুণ ছিল, যা শুধু মহত্তম নেতাদের মধ্যেই দেখা যায়। লোকে কি চায়, যাকে বলা যায় 'জনগণের ইচ্ছা', সে সম্বন্ধে স্তালিনের একটা গভীর বোধ ছিল ; লোকের সেই ইচ্ছাকে কাজের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার অতুলনীয় কৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। তা ছাড়া, স্তালিনের নিজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি যা করছেন তাতে মানবজাতির উন্নতি হবে ; সে বিশ্বাস তিনি অন্যের মধ্যে সংক্রামিত করতে পারতেন।

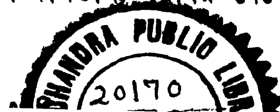
নভেম্বর মাসে আমরা (আমেরিকানরা) ভোট দিতে গিয়ে যে ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করি, 'লোকের ইচ্ছা' বলতে আমি তার চেয়ে অনেক, অনেক বলবতী একটা ইচ্ছার ইঙ্গিত করছি। আমি আমার ভোটের মূল্য বুঝি ; এই ভোটে যেসব অধিকারের প্রকাশ রয়েছে, তাদের দু' একটার জন্যে আমি প্রাণ দিতে রাজী হতে পারি। কিন্তু রিপাব্লিকান প্রার্থী আর ডেমোক্রাটিক প্রার্থীর মধ্যে যে পার্থক্য তার জন্যে আমি মরতে চাইব না। এই দু'জনের কোন একটাকে আমি বেছে নেব, কিন্তু সেটাকে 'আমার ইচ্ছা' বলব না। মানুষের এমন কোনো কোনো ইচ্ছা আছে যার জন্যে, বিশেষতঃ সঙ্কটের সময়ে,

মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করে। সমস্ত সমাজের কল্যাণ, জাতির স্বার্থ বা সন্তানদের সুন্দরতর ভবিষ্যৎ হচ্ছে এই ধরনের ইচ্ছা। এইসব ইচ্ছাকেই 'লোকের ইচ্ছা' বলা উচিত; কারণ, লোকে এগুলোর জন্যে লড়তে চায়, মরতে বা অন্যায় সইতেও ভয় পায় না।

জারের শাসন যখন ভেঙে পড়ল, রুশিয়ায় তখন 'শান্তি, জমি আর রুটি' ছিল এই রকম একটা ইচ্ছা। লেনিন এই ইচ্ছাকে রূপ দিয়ে শক্তিতে অধিষ্ঠিত হলেন। দ্বিতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়, রুশিয়ায় 'একদেশে সমাজতন্ত্র' ছিল এই ধরনের লোক-ইচ্ছা। লোকে দেখছিল, দেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও দেশ দেউলে হয়ে আছে; বাইরের কোনো জাতির কাছ থেকে কোনো সাহায্যের সম্ভাবনা নেই। সমাজের সামগ্রিক সম্পদ সম্বন্ধেও তারা সচেতন ছিল। স্তালিন লোক-সত্তার এই ইচ্ছাটাকে প্রকাশিত করে ধরলেন, কোনো পরোয়া না করে নিজের পূর্বতন মতের উল্টো কথা বললেন। কোনো তত্ত্ব থেকে এই লোক-ইচ্ছা তিনি আবিষ্কার করলেন না, লোকের ইচ্ছা অনুধাবন করেই সেটা বুঝে নিলেন। এই লোক-ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্যে তাঁর ডাকে লোকে যত সাড়া দিতে লাগল, ততই তাঁর তত্ত্ব ও বিশ্বাসের বনিয়াদ দৃঢ়তর হয়ে চলেছে—এটা তিনি অনুভব করলেন। এর বলেই তিনি বিরোধীদের ঘায়েল করতে পারলেন—শুধু চা[illegible] র চাতুর্যের দ্বারা নয়, অন্যদের চেয়ে গভীর ভাবে তিনি লোক-ইচ্ছা উপলব্ধি করতে এবং প্রকাশ করতে পেরেছিলেন বলে। তিনি ছিলেন একটা নিপীড়িত জাতির নিপীড়িত শ্রেণীর সন্তান; তাঁর এই সামাজিক উৎপত্তির দরুণই তিনি অপরের তুলনায় এত নিবিড় ভাবে লোক-ইচ্ছা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। অন্য নেতারা যখন বিদেশে বসে লেখালেখি করছিলেন, তখন তিনি দেশে থেকে গুপ্তভাবে লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন; তার ফলে, লোকে[illegible] সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেছিল। তা ছাড়া, পার্টির সম্পাদক হিসেবে দেশের বড় বড় দাবি ও অসন্তোষগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকায় তিনি লোক-মনের গতি বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁর ব্যক্তিগত উপক্রম ছিল অনাড়ম্বর, ঋজু এবং সরল; আর তাঁর সমস্যা-বিশ্লেষণ ছিল অদ্ভুত রকম পরিষ্কার। একেবারে প্রথম দিক থেকেই, বিভিন্ন দলের মতামত বুঝে নেওয়ার কৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। একজন পুরানো বলশেভিক একবার আমাকে বলেছিলেন, "তাঁর কথা আমার বেশ মনে আছে; শান্তশিষ্ট যুবক, কমিটির (সমিতির) একধারে বসে থাকতেন; কথা বলতেন কম, শুনতেন প্রচুর। শেষের দিকে, তিনি একটা মন্তব্য করতেন, কখনো বা কেবল একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। ক্রমে ক্রমে আমরা বুঝলাম যে, তিনিই আমাদের সমবেত চিন্তাটাকে সবচেয়ে ভাল ভাবে সংক্ষেপে ধরে দেন।" যে কেউ স্তালিনের সঙ্গে কখনো আলোচনায় বসেছেন, তিনিই এ কথার যাথার্থ্য স্বীকার করবেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি কি ভাবে অধিকসংখ্যক সদস্যকে নিজের পক্ষে পেতেন, কারণ, কোনো 'নীতি' নির্দেশ করার আগেই তাদের মতামত তাঁর জানা থাকত। দেখা যাচ্ছে, তাঁর মনটা স্বৈরাচারীর মন ছিল না; স্বৈরাচারীর মত তিনি মনে করতেন না যে, হুকুম চালালেই অধিক-সংখ্যক লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করা যায়; তবে, তাঁর মন অপ্রতিরোধী গণতন্ত্রীর মতও ছিল না। এ রকম গণতন্ত্রীর মত তিনি ভোটের ফলের জন্যে অপেক্ষা করতেন না, তাকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতেন না। স্তালিন জানতেন যে, সুষ্ঠু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অধিকসংখ্যক লোকের সমর্থন একান্তই দরকার; কিন্তু অধিক-সংখ্যককে কি ভাবে দলে পাওয়া যায়, তাও তাঁর জানা ছিল। প্রথমে তিনি এক একটা দলের মনোভাব আন্দাজ করে নিতেন, তারপর বেশীর ভাগ লোককে নিজের কথা শুনিয়ে যতদূর সম্ভব স্বমতে আনতেন।

পার্টির ক্ষেত্রে যেমন, জাতির ক্ষেত্রেও তেমনি তিনি এই একই কৌশলে কাজ নিতেন। স্তালিন বা রুশিয়ার লোক কেউ ভোটাভুটির পাশ্চাত্ত্য কৌশল জানতেন না। যখন স্তালিন জানলেন, তাঁর সেটা মনে ধরল না। আমি তাঁকে যতদিন জানতাম, বরাবর দেখেছি, যে



কামনা নিয়ে লোকে সক্রিয় হয়ে ওঠে, সেটা তিনি সর্বদাই খেয়াল রাখতেন ; সর্বদাই সযত্নে সেটাকে গ্রাহ্য করে চলতেন। উৎপাদনের ব্যাপারে যে কেউ বড় গোছের কিছু করতে পেরেছে, তাকেই ডাকা হত স্তালিনের সঙ্গে আলোচনা করতে। কত রকমের লোক! হয়তো কোনো গোয়ালিনী দুধ দোয়ানোর কাজে সকলের উপরে গিয়েছে, হয়তো কোনো বিজ্ঞানী পরমাণু চূর্ণ করেছে,—ডাকা হত তাদের। তারা এসে বলত, কি ভাবে এবং কেন তারা তাদের সে-সব কাজ করল। একজন মার্কিন রাজনীতিক তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "তিনি মাটিতে কান পেতে রাখেন।" রুশ কৃষকেরা ঐ কথাই কবির মত বলে, "ঘাস কি ভাবে গজায়, স্তালিন তা কান পেতে শোনেন।" স্তালিন নিজেই তাঁর নেতৃত্বের কৌশল সম্পর্কে বলেছেন, "আন্দোলনের পিছনে পড়ে থাকলে চলবে না, তা হলে একা পড়ে যেতে হবে ; ...বেশী এগিয়ে গেলেও চলবে না, তা হলে জন-সাধারণের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে যাবে।" এই মন্ত্র তিনি নিজে সাধন করতেন এবং তাতে প্রায়শঃ সাফল্যও লাভ হত।

শুধু দেশের লোকের ইচ্ছা বুঝলেই নেতা হওয়া চলে না, সে ইচ্ছাকে কাজের মধ্যে মুক্তিও দিতে পারা চাই। ব্যক্তিতেই হোক বা জাতিতেই হোক, ইচ্ছা জড় নয়। এটা মুষড়ে পড়ে হতাশায় পরিণত হতে পারে, আবার মহৎ চেষ্টায় প্রণোদিত করতেও পারে। লোক-ইচ্ছা জাগিয়ে তোলার এবং তাকে মুক্তি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল স্তালিনের—অসাধারণ ক্ষমতা, তাকে প্রতিভা বলা যেতে পারে। আমি একথা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

আমি 'মস্কো নিউজ' কাগজটা শুরু করেছিলাম। এই কাগজের রুশ সম্পাদককে নিয়ে এমন ঝামেলায় পড়েছিলাম যে, হতাশ হয়ে, সব ছেড়ে-ছুড়ে রুশিয়া থেকে চলে যাওয়ার কথা মনে উঠছিল। এক বন্ধুর কথায়, আমি স্তালিনের কাছে একটা অভিযোগ পাঠালাম? তাঁর অফিস থেকে ফোন এল, "এখানে এসে কয়েকজন ভারপ্রাপ্ত কমরেডের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করুন।" কথাটা এত সাধারণ

ভাবে বলা হয়েছিল যে, গিয়ে যখন দেখলাম, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলাম তারা ছাড়া স্তালিন, কাগানোভিচ আর ভরোশিলভের সঙ্গে এক টেবিলে বসে কথা চলছে, তখন অবাক হয়ে গেলাম। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পরিচালক সমিতি—ছোট পোলিট ব্যুরো—আমার অভিযোগ বিচার করতে বসেছেন দেখে আমার লজ্জা বোধ হল।

রুশ ভাষায় আলোচনা চললে আমি সব বুঝতে পারব কিনা, এ কথা জিজ্ঞাসা করে স্তালিন আমাকে আশ্বস্ত করলেন। তারপর তিনিই একটা প্রশ্ন করে কথা পাড়লেন সকলকে বলতে দিলেন। সব চেয়ে কম কথা বললেন তিনি নিজে। চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর স্থান ছিল টেবিলের প্রথমে ; কিন্তু তিনি সেখানে বসেননি, এমনি সাধারণ একটা জায়গায় বসেছিলেন যেখান থেকে সকলের মুখ দেখা যায়। তাঁকে এত মামুলি ধরনের মানুষ দেখে প্রথমটা আমি একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু আলোচনার বেগে সে কথা ভুলে গেলাম। পরে, আমি বুঝেছিলাম যে স্তালিন, মাঝে মাঝে এক-আধটা কথা বলে, দু' একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আর কারও কোনো কথা একটু জোর দিয়ে আওড়ে আলোচনাটাকে চালু রেখেছিলেন—কোনো অবান্তর কথা উঠতে দেননি। স্তালিন যখন সকলের মতামত একটার পর একটা তুলে ধরলেন, তখন যাদের নামে আমি অভিযোগ করেছিলাম, তাদেরও বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হল। আমার ধারণা ছিল, আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যেতেই বুঝি চাইছিলাম। আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে যাব ভেবেছিলাম—একথা ওঁদের বলাতে, স্তালিন জিজ্ঞাসা করলেন, "শুধু এই কথা ? অন্যথা আপনি বেশ তুষ্ট তো ?" তিনি এ প্রশ্ন করতেই আমার মনে যে ইচ্ছা গোপনে লুকিয়েছিল সেটা জেগে উঠল ; আমার জ্ঞান হল : সত্যিই আমি চাইছিলাম যে কাগজটা আরও বড়, আরও ভাল করে গড়া হোক। সেটা এই নতুন বোঝা-বুঝির পরে সম্ভব বলে মনে হল। এ কথা খুলে বললে, আমি যা চাচ্ছিলাম তাই পেলাম।

তারপর থেকে স্তালিনকে আমি সবার সেরা 'কমিটির লোক' বলে শ্রদ্ধা করতাম। এমনটা আর দেখিনি। নানা মতের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে তাঁর সময় লাগত না, এ একটা প্রতিভা বিশেষ। বহু মতের মধ্যে থেকে নির্ভুল পথটা নির্দেশ করে লোকের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলার, সে ইচ্ছাকে সক্রিয় করার শক্তি তাঁর ছিল। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম কয় বছর তাঁর এই মূর্তিই লোকের চোখে ভাসত। উত্তরকালে তিনি যখন এই রীতি থেকে সরে যান, তখন তিনি নিজেরই নীতি থেকে ভ্রষ্ট হন, যে কৌশলে তাঁর প্রথম অভ্যুত্থান সে কৌশল পরিহার করেন।

কারণ, পরে তিনি নিজে যাই করে থাকুন—সমবেত চিন্তার নিরিখে যার যাচাই হয়নি এমন ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিপদের সম্বন্ধে স্তালিনই একটা অতি উঁচুদরের কথা বলেছিলেন। এমিল্ লুড্‌ভিগ, এবং পরে রয় হাওয়ার্ড যখন স্তালিনের কাছে জানতে চান, তিনি কি-ভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির করেন, তখন স্তালিন অধীরভাবে উত্তর দেনঃ "আমাদের এখানে কোনো একজন ব্যক্তি কোনো সিদ্ধান্ত স্থির করে না।···অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখেছি যে, ব্যক্তিবিশেষের সিদ্ধান্ত যদি অন্যদের দ্বারা সংশোধিত না হয়, তা হলে তার মধ্যে বহু গলদ থেকে যায়।" তিনি আরও বলেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাফল্যের কারণ হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞান, শ্রমশিল্প, কৃষিশিল্প, বৈদেশিক ব্যাপার, সর্ব ক্ষেত্রেই বাছা বাছা মস্তিষ্ক এনে কেন্দ্রীয় সমিতিতে জড়ো করা হয়েছে; সব রকম সিদ্ধান্ত সেই সমিতির মাধ্যমেই স্থির করা হয়।

অন্যদের চেয়ে তিনিই এই আদর্শ সোবিয়েৎ জনসাধারণের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। কারণ, তিনি সব সময়েই 'প্রণালী মারফৎ' কাজ করতেন, অধিকসংখ্যক লোককে নিজের দলে টানার পর। বিরোধী-দমনের জন্যে তিনি কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক পুলিসের মাধ্যমেও কাজ করতেন বটে, কিন্তু পশ্চিমীদের চোখে এই দ্বিত্ব-ভাব যত বিসদৃশ ঠেকুক না কেন, দ্বিতীয় দশকের শেষ ভাগে, রুশদের কাছে সেটা

মোটেই অদ্ভুত ঠেকত না। এ ধরনের পুলিস তাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল—প্রথমতঃ জারের আমলে ; পরে, লেনিনের সময়ে। কারণ, লেনিন, গণতন্ত্রের উপর তাঁর যত আস্থাই থাকুক, প্রতিবিপ্লবীদের সামাল দেওয়ার জন্যে আইনের সাধারণ প্রয়োগের উপর নির্ভর না করে 'চেকা'—একটা বিশেষ পুলিস-দপ্তর—সৃষ্টি করেছিলেন। স্তালিন যখন সর্বপ্রকার বিরোধীপক্ষকেই 'প্রতিবিপ্লবী' শ্রেণীভুক্ত করে এই পুলিসের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করলেন, দু' একজন ইউরোপীয়ানা-ভক্ত বলশেভিক ছাড়া অন্যেরা আপত্তি তোলেনি। কারণ সকলেই জানত, সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে তারা বিশ্বশুদ্ধ শত্রুর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে।

আমি যতকাল সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ছিলাম, কাউকে কখনো 'স্তালিনের সিদ্ধান্ত' বা 'স্তালিনের হুকুম' গোছের কোনো কথা বলতে শুনিনি ; তারা বলত—'সরকারের হুকুম', 'পার্টির নীতি'। সে হুকুম, সে নীতি দশজনে মিলে স্থির করত। তারা বলত, "তিনি ব্যক্তিগত ভাবে তো চিন্তা করেন না।" তার অর্থ, স্তালিন অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো চিন্তা করেন না ; বিজ্ঞান পরিষদের, শ্রমশিল্পগুলোর এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর প্রধানদের সঙ্গে পরামর্শ করেই যা করার, তা করেন। শেষ দিকে পর্যন্ত, লোকে বাড়াবাড়ি করে যখন তাঁকে দেবতা-গোছের বানিয়ে ফেলেছিল, তখনো তারা স্তালিনকে 'মহান শাসক' না বলে বলত 'মহান শিক্ষক', অর্থাৎ, সবদিক বিচার করে যিনি পথ বাৎলে দেন। স্তালিন যতই স্বৈরাচার করে থাকুন না কেন, ইতিহাসের অন্য স্বৈরাচারীদের থেকে এইখানে তাঁর পার্থক্য।

এই ধরনের পরামর্শের ফলে, স্তালিন কর্তৃক উদ্বুদ্ধ এবং সংগঠিত লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা ও চিন্তাশক্তির সংযোগের ফলে, একটার পর একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' সম্ভব হয়েছিল।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বাইরে, দুনিয়ার লোক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা শুনেছিল মস্কোর একটি উৎকট খেয়াল বলে। আমরা যারা সোবিয়েৎ দেশের নানা জায়গায় ঘুরছিলাম, তারা সবাই এটাকে বাস্তব রূপ নিতে দেখেছি—গ্রামে গ্রামে, কারখানায় কারখানায়, শহরে শহরে, প্রদেশে প্রদেশে। চাষীমজুরদের ছিল জীবিকার প্রয়োজন; দেশের বেকার যুবশক্তি চাচ্ছিল সৃষ্টি করতে; দেশময় প্রান্তর-পর্বতে বিরাট সম্পদ পড়ে ছিল অনাবিষ্কৃত অব্যবহৃত হয়ে; আর সাধারণ সম্পত্তির মালিক জনসাধারণ চাচ্ছিল সে সম্পদ ভোগ করতে;—এসব তাগিদ থেকে পরিকল্পনাটিকে মূর্তি গ্রহণ করতে দেখেছি আমরা। আমরা দেখেছি, কী ভাবে স্থানীয় কমিউনিস্টদের চিন্তা ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বোর্ডের নির্দেশ দ্বারা গঠিত হয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের অন্তরের কামনা দেশটাকে শিল্পায়িত করার জন্যে, দেশকে বিদেশী শক্তিবর্গের মুখাপেক্ষী না রাখার জন্যে একটা পরিকল্পনায় পরিণত হয়েছিল।

সোবিয়েৎ মধ্য এশিয়ায় আমি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথা প্রথম শুনি; সেটা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। তাসখন্দের কাগজে সাতস্তম্ভব্যাপী শিরোনামা বেরিয়েছিল: **পাঁচবছরের পরে মধ্য এশিয়াকে আর চিনবেন না।** তার নীচে ছিল আধপাতা জুড়ে ঐ অঞ্চলের একটা মানচিত্র; মানচিত্রের সর্বাঙ্গে চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছিল, কোথায় কি গড়া হবে; কোথায় রেলপথ পড়বে, কোথায় কারখানা উঠবে—কবে কোন কাজ শুরু করা হবে এবং কবে শেষ করা হবে, সেসব তারিখও দেওয়া ছিল এই মানচিত্রে। এটা ছিল মধ্য এশিয়ার সঙ্ঘগুলোর তৈরী পরিকল্পনা—সেগুলোই মিলেমিশে এটা তৈরি করেছিল; মস্কোর কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সঙ্গে তখনও তার সামঞ্জস্য বিধান করা হয়নি।

পরের বছর, আমি আবার মধ্য এশিয়ায় গিয়েছিলাম ; ঘোড়ার পিঠে চড়ে পামির পর্যন্ত গিয়েছিলাম। রুশিয়া, ভারত আর চীনের সংযোগস্থল এই উঁচু জঙলী অঞ্চল ; 'পৃথিবীর ছাদ' বলে এর পরিচয়। রেলরাস্তা পিছনে ফেলে কয়েকদিন ঘোড়ার পিঠে চলার পর, এক উজবেকের সঙ্গে আমার আলাপ হল। সে তখন রাস্তা মেরামতের কাজ করছিল। তিনটি মাত্র রুশ শব্দ তার জানা ছিল: 'রাস্তা', 'মোটর' আর 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'। এই তিনটি শব্দ আর বহু সগর্ব অঙ্গভঙ্গি প্রয়োগ করে সে আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, দেশের সীমান্ত পর্যন্ত উট-চলার পথটা হয়ে যাবে মোটর-চলার পথ, তার পরের পথটুকু ঘোড়ায় চড়ে দশদিনে যাওয়া যাবে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এটা করবে।

তারও একবছর পরে। আমি তখন নব-সংগঠিত 'মস্কো নিউজ' কাগজে লিখি। ১৯৩০ সালের মে-দিবসে, তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়া রেলপথ উদ্বোধন উৎসবে গেলাম। সংবাদপত্রের শিরোনামায় ও দীর্ঘ দীর্ঘ পতাকায় ঘোষিত দেখা গেল **'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম বৃহৎ কীর্তি !'** অনধ্যুষিত প্রান্তর ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে হাজার মাইল রেলপথ তৈরি করা হয়েছিল। এই রেলপথ তৈরীর ব্যাপারে বড় কর্তা ছিলেন বন্ধু বিল্ স্যাটফ্—আমেরিকায় থাকতে তিনি বাক্-স্বাধীনতার জন্যে বহুবার লড়েছিলেন ; রুশ গৃহযুদ্ধের পুরাতন যোদ্ধা তিনি। এত কম সময়ের মধ্যে এর আগে আর কোনো রেলপথ তৈরী হয়নি ; যত সময় লাগবে বলে পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল তার চেয়ে দেড় বছর আগেই কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে, আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। সমস্ত কাজের জন্যে মজুরদের মজুরী চুকিয়ে দিতে হবে, অথচ গভর্নমেণ্টের বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এক বছরের কাজের জন্যে। স্যাটফ্ মস্কোয় গিয়ে হামলা করলেন ; যেখানে পেলেন টাকা টেনে বার করলেন ; মহা চেঁচামেচি বাধালেন : "বাজেটে কুলায় না বলে বিজয়ী মজুরদের পাওনা মেটাতে দেরি হবে, এ কেমন কথা ?"

এসব সব অতীত কাহিনী। রেলপথ খোলা উপলক্ষে চারটে স্পেশাল ট্রেন চলছিল। আমাদের ট্রেনে যাচ্ছিল শ'খানেক কারখানার প্রতিনিধি; ভাল কাজ দেখানোর জন্যে এই ভ্রমণের অধিকার দিয়ে কৃতী কারখানাগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সোবিয়েৎ সাংবাদিকরা এসেছিলেন গোটা বিশেক শহর থেকে; পৃথিবীর নানা দেশ থেকে আসা বিদেশী সংবাদদাতাদের জন্যে ছিল দু'খানা গাড়ি। আমরা সবাই জানতাম যে, এই রেলপথ এশিয়ার ইতিহাসের ধারা বদলে দিচ্ছে, সাইবেরিয়ার গম আর কাঠের সঙ্গে মধ্য এশিয়ায় তুলোর সংযোগ ঘটাচ্ছে, সোবিয়েৎ বাণিজ্যকে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম চীনের কিনারায়, আর সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দূরতম দক্ষিণপূর্ব প্রান্তকে ইস্পাতের বেষ্টনী দিয়ে রক্ষার ব্যবস্থা করছে।

এই প্রথম ট্রেন চলে, ট্রেনের চলার কোনো সময় ঠিক ছিল না। নতুন-পাতা লাইনের উপর দিয়ে গাড়িগুলো মাতালের মত টলতে টলতে ছুটছিল—সবুজ রঙ-করা উৎসব সাজে সজ্জিত একটা ইঞ্জিনের পিছনে। ইঞ্জিনটা ছিল অলি-আতার ইঞ্জিন-সারানোর কারখানার দান, সেখানকার স্বেচ্ছাসেবকরা এটা বিনা মজুরীতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সারিয়ে দিয়েছিল। ইঞ্জিনটা পতাকায় পতাকায় লালে লাল হয়ে গিয়েছিল। যে স্বেচ্ছাসেবকরা ইঞ্জিনটা সেরেছিল তাদের মধ্যে থেকেই বাছাই-করা কয়েকজন দিনরাত তাদের ইঞ্জিনটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়ার রেলপথ খোলার উৎসব তাদেরও বিজয়-উৎসব।

লাইনের ধারে ধারে এরই মধ্যে নতুন নতুন নগর গড়ে উঠছিল;—অগ্রগামীদের বস্তি। প্রতি স্টেশনে স্যাটফ্ তাদের সভায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতায় তিনি স্মরণ করছিলেন তাদের লড়াইয়ের খুঁটিনাটি, মরভূমিতে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা, শীতকালের তুষার ঝড়ের কথা—"টেবিলে বসে কাগজপত্র-ঘাঁটা কর্তারা" গরম কাপড়চোপড় পাঠাতে পারেননি তখনো। মায়ের কোলের বাচ্চাদের দেখিয়ে তিনি বলছিলেন, "এই বস্তির চেয়ে ওই বাচ্চাদেরও

বয়স বেশী!" তিনি বলছিলেন, তাদের কাজ দিয়ে তারা কি ভাবে একটা নতুন দুনিয়া সৃষ্টি করেছে—সর্বজাতীয় শ্রমিকদের পক্ষে কল্যাণকর সে দুনিয়া। আমি লক্ষ্য করলাম, একটা রোগা মেয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে; বিড়বিড় করে সে বললেঃ "আমাদের এই কর্তাটি খাসা লোক!"

কড়া রোদ মাথায় করে জংশনে একটা রুশ-কাজাক উৎসব চলছিল। যাযা॰র কাজাকরা শত শত মাইল দূর থেকে ঘোড়ায় চেপে এই 'লোহার ঘোড়া' দেখতে এসেছিল। 'মরিয়ন' বলে একটা বিরাট্ ক্রেন্ (ভারী ভারী মাল তোলার যন্ত্র) এক জোড় করে মানুষকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শূন্যবিহারের আনন্দ দিচ্ছিল; প্রতি জোড়ে একজন করে রুশ আর একজন করে কাজাক। ছোকরারা রেলের উপর নেচে নেচে গান করছিল—একশ' ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগামী কালোরঙের পক্ষীরাজ ঘোড়ার গান। সে ঘোড়া তাদের জন্যে কাজ এনেছে, পাঠশালা এনেছে, তাদের মুক্ত করেছে উপজাতীয় ভাইবেরাদরদের উৎপীড়ন থেকে।

উপজাতীয় সর্দারদের শক্তি কিন্তু তখনো যায়নি; ভাল কাজ করার জন্যে ছোকরারা যে পুরস্কার পেল, সেগুলো তারা নিজেদের জন্যে রাখতে চাইলেও তাদের উপজাতীয় ভাইবেরাদররা তাদের ঠেলে ফেলে সর্দারদের হয়ে সেগুলো তাদের হাত থেকে কেড়ে নিল। এইটাই উপজাতীর রীতি। এতদিন এর বড় ব্যতিক্রম ঘটেনি; নতুন রেলপথ এসে এ রীতির ন্যায্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠাচ্ছে।

দশ হাজার লোক এসে জমেছে এই ন্যাংটা, জঙলা জায়গায়। তাদের চোখের সামনে উত্তর, আর দক্ষিণ থেকে-আসা রেল-পাতার লোকগুলো লাইনের শেষ ইস্পাতটা যথাস্থানে বসিয়ে দিল। শেষ গোঁজটায় হাতুড়ি বসালেন রুশিয়া আর কাজাকস্তানের বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা, নির্মাতাদের পক্ষ থেকে স্যাটফ্, আর কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি হিসেবে জাপানী-কমিউনিস্টদের নেতা, ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ কাতিয়ামা। দু'দিক থেকে আসা লাইনের

যোগ-সাধক ঐ গোঁজটা উপর কাতিয়ামার হাতুড়ি মারার অর্থ সুস্পষ্ট। এ রেলপথ শুধু গমের সঙ্গে তুলোর যোগ ঘটাচ্ছে না, অভিযাত্রীদের জন্যে নতুন দেশ খুলে ধরছে না, ছোকরা মেষচারকদের জন্যে অত্যাচারী উপজাতীয় সর্দারদের উৎপীড়ন থেকে মুক্তি আনছে না,—এ রেলপথ সূচনা করছে এশিয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ব-বিপ্লবের জয়যাত্রাও।

এ রেলপথের গুরুত্ব জেনেই সারাটা পথ শ্রমিকরা আমাদের ট্রেনের লোকদের জিজ্ঞাসা করছিল, রেলপথ খোলার উপলক্ষে কে কে এসেছেন ? স্তালিন আসেননি ? কালিনিনও না ? তাঁদের চেয়ে নিচু স্তরের কর্তাদের পেয়েই তারা সন্তুষ্ট হল। তারা জানত, মস্কো থেকে আসতে যেতে দু'সপ্তাহ লাগে ; তারা জানত, দেশের সর্বত্র এই রেলপথের মতই বড় বড় কাজ চলেছে—এখনও সেগুলো অসমাপ্ত। সুদূর পশ্চিমে, নীপার নদীর জল বেঁধে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানা হচ্ছে—কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ; পৃথিবীর মধ্যে এ ধরনের যত বাঁধ আছে, তাদের সবার চেয়ে বড় বাঁধ হবে সেটা। সুদূর উত্তরে, কুজ্‌বাসে একটা ইস্পাত নগরী গড়ে উঠছে। স্তালিনগ্রাদে পৃথিবীর বৃহত্তম ট্র্যাক্টর কারখানায় কাজ শুরু হতে আর দেরি নেই : স্বার্দলোভ্‌স্কে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ভারী যন্ত্র তৈ র কারখানা গড়ে উঠছে।

বড় কাজগুলোর মধ্যে প্রথম সমাপ্ত হওয়ার সম্মান পেল তুর্কিস্তান-সাইবেরিয়ার রেলপথ। এটা সর্বপ্রথম সমাপ্ত হলেও প্রচণ্ডগতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এমন আরও অনেক কীর্তি একটার পর একটা মাথা তুলছিল।

* * *

চুক্তি করে যে সব মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার এ পরিকল্পনায় সাহায্য করতে এসেছিলেন, তাঁরা বলতে ভালবাসতেন যে, এটা একটা 'পরিকল্পনাই' নয়। এক হিসেবে, কথাটা মিথ্যে নয়। মাপ-জোখ

করে ছক কেটে এ পরিকল্পনা তৈরী হয়নি—সে ছকের ব্যতিক্রম করা হবে না, এমন কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। করা দরকার সুতরাং যেভাবেই হোক করতে হবে—এ পরিকল্পনা ছিল 'অসাধ্য'-সাধনের প্রচেষ্টা। এটা শুধু মস্কোতে তৈরী হয়নি—দেশের দূরতম অংশের লোকেরও এতে হাত ছিল। কারখানায় কারখানায়, গ্রামে গ্রামে, লোকে আলোচনা করল, তাদের কিসের অভাব। তাদের স্থানীয় পরিকল্পনাপ্রণালী ক্রমে কেন্দ্রে গেল। সেখানে সমগ্র দেশের পরিকল্পনার মধ্যে সেটাকে ফেলে বিচার করা হল, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া হল। তারপর সেটা ফেরৎ পাঠানো হল স্থানীয় লোকদের কাছে, কাজ শুরু করার জন্যে।

লেলিনগ্রাদ থেকে ভ্লাদিভোস্তক পর্যন্ত সারা দেশটায় কাজের সাড়া পড়ে গেল। ১৯৩১ সালে আমি 'মস্কো নিউজ' কাগজের তরফ থেকে এই গড়ার কাজের খবর নিতে বেরুলাম। বিশ বছর পরে মস্কোতে আমি যখন গ্রেপ্তার হই, পুলিস আমার ঐ-সময়কার ভ্রমণের কথা লেখা খাতাগুলোকে আমার গুপ্তচরগিরির প্রমাণ হিসেবে নিয়ে যায়।—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বড় কীর্তিগুলো সে সময় হঠাৎ যুদ্ধকালীন গোপনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে এইগুলোকেই তারা, যে কেউ দেখতে চাইত তাকেই, গর্বভরে দেখাত।

১৯৩১ সালে কেউ কেউ বললেন, স্তালিনগ্রাদের ট্র্যাক্টর কারখানা ব্যর্থ হয়েছে। অন্যেরা বললেন, খুব সার্থক হয়েছে। দু' দলই মিথ্যে বলেছিলেন। স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা ব্যর্থও হয়নি—সার্থকও হয়নি তখনো পর্যন্ত। সে এক কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। প্রথম সোবিয়েৎ 'কন্‌ভেয়ার'-এর জন্যে লড়াই। কনভেয়ার তৈরি করতে আমেরিকার লেগেছিল এক পুরুষ। এখানে লড়াই করে দ্রুতভাবে তা জয় করা হল। স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানা গড়তে অনেকের জীবন গিয়েছে, যৌবন নষ্ট হয়েছে। গ্রীষ্মকালের গরমে ইস্পাত গলানো উনুনের কাছে বড় বড় জোয়ানরা মূর্চ্ছা গিয়েছে। ৭নং যন্ত্র বিগড়ে যাওয়ায়

কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে গেলে জিভ্‌কোভিচ, কোভার্ট আর নিন্‌চাক বলে তিনজন আমেরিকান না ঘুমিয়ে একটানা ষাট ঘণ্টা পরিশ্রম করেছে সেটা সারানোর জন্যে। সারানো যখন শেষ হল, তাদের জয়লাভ হল যখন, তখন তারা আধমরা অবস্থায় টলছে। তাদের কাজের জন্য তারা হাততালি পেল, পদক পুরস্কার পেল। এসবকে কাজ বলা চলে না,—এ রীতিমত লড়াই।

কারখানার কোনো ঘর কাজে পিছিয়ে পড়লে তার বাইরে সেঁটে দেওয়া হত একটা জ্যান্ত উটের ছবি। সে চিহ্ন দেখে শক্ত লোকরা কষ্টে চোখের জল সামলাত। যারা যথাসাধ্য কাজ করেছে তারা ফুঁপিয়ে কাঁদত, কারণ তাদের ঘর যথাসাধ্য কাজ করতে পারেনি—তার দ্বিগুণ জিদ নিয়ে ঘর যাতে আরও বেশী কাজ করে, তার চেষ্টা করত। ঠিকমত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার দরকার ছিল। এক জায়গায় ত্রুটি সংশোধন করতে না করতে, আর এক জায়গায় কোনো গলদ দেখা দেওয়ায় কাজ বন্ধ হত। একসঙ্গে হাজার দিকে নজর রাখতে হত। এর আগে রুশিয়ায় এরকম ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন দেখা দেয়নি কখনো।

শহর থেকে বিশ মিনিট একটা জঘন্য রাস্তা দিয়ে উত্তর দিকে যাওয়ার পর কারখানা। রাস্তাটা কারখানার অঙ্গ; সে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় অনেক যন্ত্র ভেঙে যেত। জলের জন্যে নতুন মেন পাইপ বসানো হয়েছিল, কারণ, শহরের জল সরবরাহ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে জুলাই মাসের গরমে এদিকটায় জল পাওয়া যায়নি। ওরা আরও কয়েকটা গুদামঘর তৈরি করেছিল; সেগুলো এক বছর আগেই তৈরী হওয়া উচিত ছিল। ঠিকমত গুদামের ব্যবস্থা না থাকায়, কোথায় যন্ত্রের কোন্ অংশ রাখা হয়েছে কেউ জানত না। কোনো যন্ত্রাংশের অভাবে সারা 'লাইনে' কাজ বন্ধ হয়ে যেত, অথচ মাসখানেক আগে হয়তো ঐ যন্ত্রাংশের শত শত খণ্ড কোথায় যেন মজুদ রাখা হয়েছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, স্তালিন কেন 'ব্যবস্থাপনা, হিসাব আর দায়িত্বের' উপর জোর দিচ্ছিলেন।

কারখানার প্রত্যেক ঘরের নিজস্ব 'উৎপাদন-সভা' ছিল। মেশিন-ঘরের লোকে আলোচনা করছিল 'গুণের' কথা, 'ছোট যন্ত্রপাতির অভাবে'র কথা। একজন মজুর বলল, "যন্ত্রের অংশগুলো বালুওড়ানো হাওয়ায় পড়ে থাকে ; ধুলোবালি নিয়েই সেগুলো মোটরে লাগানো হয় ; ওগুলোকে কেরোসিনে প্রথম ধুয়ে নেওয়া উচিত।" আর একজন বলল, "পরীক্ষণের সময়টা বদলানো দরকার ; ট্র্যাক্টরে জোড়া দেবার আগেই রেডিয়েটরগুলো পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত, নইলে সেগুলো আবার খোলার জন্যে মিছামিছি পরিশ্রম করতে হয়।"

যে ভুলের জন্যে ষাটটা মোটর বরবাদ হয়ে গিয়েছিল, সে ভুল ধরিয়ে দেন 'প্রাভ্দা' কাগজের একজন রিপোর্টার—সকলেই তাঁকে বাহবা দিচ্ছিল। যন্ত্রবিদ্যা তাঁর আয়ত্ত ছিল না, কিন্তু তাঁর নজরে পড়ল মোটরের অভাবে লাইন বন্ধ। তিনি ষাটটা মোটর পেলেন—সেগুলো অচল ; আবিষ্কার করলেন, ষাটটাতেই একই অংশ খারাপ। যে-ঘরে ঐ অংশটা তৈরী হয়েছিল, সে-ঘরে গেলেন তিনি। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারলেন, অংশটা খারাপ হওয়ার কারণ ঃ কাটবার অস্ত্রে বেশ একটা খুঁৎ রয়ে গিয়েছে ; যে আনাড়ি লোক এ অস্ত্র চালাত, সে ভেবেছিল ও-খুঁতে কোনো ক্ষতি হবে না, ইঞ্জিনিয়ারও অসাবধানী হওয়ার দরুণ এ ব্যাপারে নজর দেননি। রিপোর্টার গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে বললেন, "তোমারই দোষে ষাটটা ট্র্যাক্টর অচল হয়েছে!" কাটবার অস্ত্রটা বদলে ফেলা হল, মোটরের অংশটা ঠিক মত তৈরী হতে লাগল। —এমনি ধারা হাজার হাজার জিনিসের উপর নজর দিতে হত। শত্রুপক্ষের ধ্বংস-চেষ্টার মত যেসব আরও সাংঘাতিক কারণে উৎপাদন ক্ষুণ্ন হত, সেসবের কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

এসব হাজার হাজার কাজ কি কোনোদিন একই সময়ে ঠিক মত চলবে? চলবে! উৎপাদন-সূচক সাঙ্কেতিক রেখা কখনো উপরে উঠেছে, কখনো বা নেমে এসেছে, কিন্তু মোটামুটি সেটার গতি উর্ধ্বমুখী। দু'বার কারখানার বীররা হুঙ্কার দিয়ে যুদ্ধে এগিয়েছে,

ক্ষয়ক্ষতির দিকে নজর না দিয়ে প্রাণপণ লড়েছে; লড়ে জয়লাভ করেছে। প্রথম প্রথম যখন ১৯৩০ সালের জুন মাসে, পার্টি কংগ্রেস উপলক্ষে কারখানায় প্রথম কাজ শুরু করা হয়—নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সব প্রস্তুত করে নেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়বার,—যখন কারখানার প্রথম বর্ষ শেষ হওয়ার আগে, ট্র্যাক্টরের সংখ্যা পাঁচ হাজার পুরো করা হয়। দু'বারই উর্ধ্বতন কর্মচারীদের বেশীর ভাগ, এবং প্রায় সমস্ত মার্কিন বিশেষজ্ঞই বলেছিলেন—'অসম্ভব!' দু'বারই, মজুরদের বিশেষ করে কম্‌সোমলদের—অল্পবয়সী কমিউনিস্টদের—ইচ্ছাশক্তি অসাধ্যসাধন করেছিল।

কারখানার পার্টি সম্পাদক ত্রেগুবিস্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বললেন, "ওরা নিজেদের যেসব শক্তির কথা নিজেরাই জানে না, সে সব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে আমাদের।" তিনি তখন রোগ শয্যায় শুয়ে; আমার সঙ্গে আলাপের ফাঁকে ফাঁকে টেলিফোনের সাহায্যে নিজের কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন, "আমাদের দরকার ফুরনের কাজ, কাজের শৃঙ্খলা, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কড়াকড়ি হিসাব। লেনিন এবং তাঁর পরে স্তালিনও কাজের শৃঙ্খলা, হিসাবনিকাশ আর দায়িত্বই চেয়েছেন। যে দেশ যান্ত্রিক-উৎপাদনে এখনও অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি সে দেশের পক্ষে এ শিক্ষা যেমন শক্ত, তেমনি দরকারী।"

রুশরা যে শিখছে, তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল সর্বত্র। শহর থেকে কারখানা পর্যন্ত রাস্তাটা সারানো হচ্ছিল, সেখানে; কারখানা-শিল্পবিদ্যালয়ের প্রথমখোলা ক্লাসগুলোতে কারখানার দৈনিক এগারো হাজার লোকের খাদ্য-প্রস্তুতকারী 'কারখানার নতুন-খোলা, রন্ধনশালায়; মার্কিন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রুশদের সম্পর্কে; এমন কি উত্তপ্ত তৃষ্ণার্ত শ্রমিকরা যাতে ভল্‌গা নদীর জল খেয়ে টাইফয়েড না ধরায়, তার জন্যে যেসব সোডা-জল আর ঠাণ্ডা বীয়ারের দোকান বসেছিল, সেগুলোতে (আগের বছর ভল্‌গার জল খেয়ে অনেকে টাইফয়েডে ভুগেছিল)।

সেবার স্তালিনগ্রাদ গিয়েছিলাম আগস্ট মাসে। তার চার মাস পরে আবার গিয়ে দেখলাম, কারখানায় দৈনিক ১১০টা করে ট্র্যাক্টর তৈরী হচ্ছে।—পরিকল্পনামত উৎপাদন হচ্ছে। প্রথম সোবিয়েৎ কন্‌ভেয়ারের জন্যে যুদ্ধে জয় হয়েছে। এর বারো বছর পরে, স্তালিন-গ্রাদের ট্র্যাক্টর কারখানার শ্রমিকরা নিজেদের তৈরী ট্যাঙ্ক চালিয়ে কারখানার বিধ্বস্ত প্রাঙ্গন থেকে হিটলারের বাহিনীকে তাড়িয়ে দেয়।

* * * *

খারখভ ট্র্যাক্টর কারখানার সবাই—সে রুশ, উক্রাইনীয় বা মার্কিন হোক, সকলেই বলত যে স্তালিনগ্রাদের তুলনায় তাদেরটা অনেক ভাল। কথাটা সত্যি বটে, তবে অশোভন। স্তালিনগ্রাদের কারখানা প্রথম পথ দেখায়; তার ভুল ত্রুটি দেখে পরের সব কারখানাগুলো শিখেছে।

মার্কিন বিশেষজ্ঞ র‍্যাস্কিন্‌ ঘুরে ঘুরে আমাকে কারখানা দেখালেন। স্তালিনগ্রাদে ঢালাই-ঘরের কাজ ঢিমে তালে চলত; সে ঘরের-বাইরে উটের ছবি উঠেছিল। খারখভের ঢালাই-ঘরে বিশটা উন্নত প্রথা অবলম্বিত হয়েছিল। স্তালিনগ্রাদে সোজা আমেরিকা-থেকে-আসা চমৎকার চমৎকার যন্ত্র বসানো হয়েছিল। কিন্তু আনাড়ি চাষীদের হাতে পড়ে সেগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে যায়। খারখভের শ্রমিকরা সে ভুল করেনি; স্তালিনগ্রাদের দেখে তারা শিখেছিল। খারকভে পরিবহন-ব্যবস্থা, গুদাম-ব্যবস্থা, কাজ-বিলি—এ সমস্ত বিভাগই স্তালিনগ্রাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছিল; এখানে কাজ অনেক ভালভাবে হচ্ছিল। পুঁজিতন্ত্রে উন্নত প্রণালী অবলম্বন করা হয় প্রতিযোগিতার চাপে,—এখানে অভিজ্ঞতা বিনিময় হচ্ছিল বিনা মাশুলে। স্তালিনগ্রাদের পুরো এক বৎসরের অভিজ্ঞতা খারখভ বিনামূল্যে লাভ করেছিল।

খারখভ কারখানার একটা বিশেষ সমস্যা ছিল। কারখানাটি দেশের সাধারণ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল না। ও অঞ্চলের চাষীরা দ্রুতবেগে যৌথ খামারে যোগ দিচ্ছিল—তা যে হবে, এটা কেউ আশা

করেনি। ফলে, তাদের ট্র্যাক্টরের চাহিদা মেটানো যাচ্ছিল না। সুতরাং, উক্রাইনীয় অভিমানবশে, খারখভ পরিকল্পনার বাইরেই তার কারখানা তৈরি করল। তা করার যে কী কষ্ট, মার্কিনরা তা কল্পনাই করতে পারবে না। পাঁচ বছরের জন্যে দেশের সমস্ত ইস্পাত, ইট, সিমেন্ট, মজুরের বিলি-ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। কোনো ইস্পাতের কারখানাকে পরিকল্পনার অতিরিক্ত উৎপাদন না করিয়ে খারখভের ইস্পাত পাওয়ার উপায় ছিল না। অ-দক্ষ মজুরের ঘাটতি পূরণের জন্যে অফিসের কেরানী, ছাত্র, অধ্যাপক ইত্যাদি সহ হাজার হাজার লোক তাদের ছুটির দিনে বিনা পারিশ্রমিকে খাটতে এগিয়ে এল। সে সময় চারদিন অন্তর একদিন ছুটি থাকত; সুতরাং দেশের সমগ্র অধিবাসীর এক-পঞ্চমাংশ প্রতিদিন ছুটি পেত।

মিঃ র‍্যাস্কিন্ বললেন, "প্রতিদিন সকালে সাড়ে ছ'টার সময় স্পেশাল ট্রেন আসে—ব্যাণ্ড বাজিয়ে, পতাকা উড়িয়ে। রোজই নতুন নতুন লোক— সকলেই খুব খুশী।" ঐ কারখানা গড়তে যত অদক্ষ শ্রমের দরকার হয়েছিল তার অর্ধেকই নাকি দিয়েছিল এই স্বেচ্ছাসেবকরা।

* * *

কুজ্‌নেৎস্কের নির্মাণ-কাজ দেখা যেতে পারত দু'টো জায়গা থেকে। বড় রাস্তা থেকে দেখলে চোখে পড়ত একটা বিশৃঙ্খলার ছবি। পাহাড়ের উপর থেকে দেখলে, দেখা যেত কি কি তৈরী হয়ে গিয়েছে। আমার নোটবই থেকে দু' একটা ছবি তুলে দিচ্ছি।

বড় রাস্তা বলতে আমি বলছি সেই রাস্তার কথা, যার তখনো কোনো নাম হয়নি; যে রাস্তাটা যেসব কলকারখানা সবে তৈরী হচ্ছে সেগুলোর ঠিক মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। সঙ্কীর্ণ সে রাস্তা, দু'পাশে ধুলোর স্তূপ, লোহার পাইপ, লম্বা লম্বা বর্গা; সে রাস্তায় দু'টো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে কিনা সন্দেহ। গাড়িগুলো চলে গভীর খাদের মধ্যে হোঁচট খেতে খেতে। মনে করুন, দুপুরে এ রাস্তায় বেরিয়েছেন। হঠাৎ কানে এল, "চাপা দিও না, হে।" ঘোড়ার

মাথাটা একটু ঘুরিয়ে কাঠের স্তূপের মধ্যে এক কোণে সরে গেলেন আপনি। জন বিশেক লোক একটা ভারি বোঝা নিয়ে যাচ্ছে, কিছুক্ষণের জন্যে সারিবদ্ধ গাড়ির রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। যারা পায়ে হেঁটে চলে তারা পথ চলার একটা ভাল উপায় ঠাওরে নিয়েছে— রাস্তার সমান্তরালে :কোমর পর্যন্ত উঁচু এক সার পাইপ রয়েছে, তারা তার মধ্যে দিয়ে চট্‌পট্‌ এগিয়ে যেত।

বড় রাস্তা‹ উপর আড়াআড়িভাবে এক ডজন রেলরাইন চলে গিয়েছে। ব্লাস্ট ফার্নেস্-এর জন্যে স্টীল প্লেট বোঝাই করে যখন লম্বা সারি দিয়ে মালগাড়ি চলে, রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ বিশৃঙ্খলার মধ্যে, স্টীল প্লেটগুলো রাখার মত জায়গা খুঁজতে বেশ সময় যায়। সে রকম জায়গা কম থাকায় মালগাড়িগুলোকে মিনিট বিশেক পাশে সরিয়ে রাখতে হয়। অতটা সময় রাস্তায় গাড়ি-গুলোকে অপেক্ষা করতে হয়। মালগাড়ি যদিবা চলে যায়, একটা প্রকাণ্ড ঘাস-বোঝাই গাড়ি হয়তো রাস্তা আটকে ফেলে; রাস্তার অন্য গাড়িগুলো এদিক সেদিক দিয়ে বেরুবার পথ করে নেয়। ছ' পা এগুতেই হয়তো দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড ট্রাক রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে—এক ডজন চাষীঘরের মেয়ে বেলচা দিয়ে পাওয়ায় প্ল্যাণ্টের সামনে থেকে ট্রাকে ধুলোমাটি ওঠাচ্ছে—চেঁচামেচি করে তাদের গলা বসে গিয়েছে। ধুলোমাটিগুলো বছর খানেক আগেই সরিয়ে ফেলা উচিত ছিল। তখনও রাশি রাশি আবর্জনা, যেখানে থাকা উচিত নয় সেখানে পড়ে আছে।

বড় রাস্তা থেকে ছ'পাশে ছোট ছোট পথ গিয়েছে: এক পাশে কোক্ ওভেন্, ব্লাস্ট ফার্নেস্ আর পাওয়ার প্ল্যাণ্টের দিকে; আর একপাশে, বয়লার ঘর, ঢালাই ঘর, ওপেন-হার্থ আর হবু রোলিং মিলের কাঠামের দিকে। এ পথগুলো হচ্ছে সঙ্কটসঙ্কুল; পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে ওগুলো। সেগুলোর মাঝে মাঝেই পাথরের স্তূপ। নির্মাণ কাজ এগুনোর সঙ্গে সঙ্গে পথগুলো প্রতিদিন বদলাচ্ছে; যারা ওদিকে কাজ করছে তারাই শুধু তার হদিস জানে।

দু'দিন বৃষ্টি হওয়ায় বড় রাস্তার সমস্ত জঞ্জাল কাদার নীচে ঢাকা পড়েছে। সে কাদা জুতোর উপর উঠছে। পাহাড়ের গায়ের রাস্তায় গাড়ি চলা অসম্ভব হল। সমস্ত কাজ শতকরা পঁচিশ ভাগ ঢিমে হয়ে পড়েছে।

মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার, রুশ ইঞ্জিনিয়ার, ইনস্পেক্টর, কাগজের সম্পাদক—সকলের মুখে হাজারো সমালোচনা শোনা যাচ্ছে। পদে পদে বাধা পড়ে কেন? ব্লাস্ট ফার্নেস্, কোক্ ওভেন্, পাওয়ার প্ল্যাণ্ট—সবগুলো রাস্তা পাওয়ার জন্যে লড়ালড়ি করে কেন? লোক পাওয়ার জন্যে মারামারি করে কেন? মাল রাখার একটু জায়গা করে নেওয়ার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে কেন? একটা ভদ্র মত রাস্তা নেই কেন? যারাই একাজে আছে, তারাই বলতে পারে এ ইস্পাত মিলটা কিভাবে তৈরি করা উচিত ছিল। আগে রাস্তা, রেল-রাস্তা, কাঠ-মিস্ত্রীদের কাজের ঘর, মজুরদের বাড়ি, মাল রাখার জায়গা, মাটি-খোঁড়া, জলের ব্যবস্থা, নর্দমা তৈরী হওয়া উচিত ছিল; তারপর ধুলোমাটিগুলো সরিয়ে ফেলে বাড়ি তৈরী হওয়া উচিত ছিল। বাড়ি তৈরী শেষ হলে মিলের সাজসরঞ্জাম বসিয়ে, সেগুলো সব পরীক্ষা করে নিয়ে, তারপর মিলে কাজ শুরু করা উচিত ছিল। এ কথা সবাই বোঝে।

নির্মাণকাজের বড়-কর্তা ফ্রাঙ্কফোর্টও বললেন, "তারা নির্মাণ শুরু করার পর, পরিকল্পনা বদল করা হল। জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে বসল; আমাদের আরও ইস্পাতের দরকার পড়ল। আমাদের সম্মুখে দু'টো পথ খোলা ছিল: হয়, সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজে হাত দেওয়া—কিন্তু তাতে এক বছর দেরি হত—নয়তো, একসঙ্গে সব কিছু ধরা। আমরা দ্বিতীয় পথ বেছে নিলাম। তার উপর এরকম আধুনিক ধরনের ইস্পাতকারখানা তৈরীর অভিজ্ঞতা আমাদের—রুশ ইঞ্জিনিয়ারদের—ছিল না। তা ছাড়া পরিকল্পনামত কাঁচামাল পাওয়ার আশা আমরা করতে পারি না।

"আমেরিকায় আপনারা দশগাড়ি ইটের জন্যে ফোন করে দিয়ে খালাস; কয়েক দিনের মধ্যে মাল পেয়ে যান। দেড় বছর আগে

আমরা ইটের অর্ডার দিলাম। ব্লাস্ট ফার্নেসের জন্যে ইটের অপেক্ষা করে পুরো চার মাস কাটল। তারপর একসঙ্গে সব ইট এসে হাজির; রাখার জায়গা নেই। যেখানে পারা গেল সেগুলো ফেলা হল—অন্য কাজে বাধা সৃষ্টি করে। আমাদের ইস্পাত আসার কথা মে মাসে; এল সেপ্টেম্বরে। ট্রেনের পর ট্রেন ইস্পাত এল রুশিয়ার নানা জায়গা থেকে, বহু গাড়ি রাস্তার পাশে ফেলে রাখতে হল, সেগুলে. পৌঁছল দেরিতে।"

ফ্রাঙ্কফোর্টের সঙ্গে এই আলোচনা হওয়ার পরদিন, কাদা একটু শুকোলে, আমরা পাহাড়ে উঠলাম। ছক মত তৈরি করা বাড়িগুলো ছাড়িয়ে আমরা যেখানে পৌঁছলাম চাষীরা হাজারে হাজারে কাজের খোঁজে এসে সেখানে কুঁড়েঘরের বস্তি তৈরি করেছে। এখানে এসে তারা থাকার জায়গা না পেয়ে, মাটি খুঁড়ে, নির্মাণ-কাজের জন্যে যে কাঠ, ইট আর কাচের সার্শি এসেছে, সকলেই তা থেকে কিছু কিছু চুরি করে ঘর বানিয়ে নিয়েছে। চুরির মাত্রা বেড়ে গেলে ঘাটতি নজরে পড়ে, পুলিসে খবর যায়।

পাহাড়ের গা থেকে আমরা কুজনেৎস্কের দিকে চাইলাম। নীচের উপত্যকার তিন মাইল জুড়ে ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠছে। আমাদের ঠিক সামনে মাথা তুলেছে ব্লাস্ট ফার্নেসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা কালো সিলিণ্ডার। এক বছর আগে প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলাম তখন সদ্য খোঁড়া শুরু হয়েছিল, লোকেরা ছোট ছোট কোদালে করে মাটি কেটে প্রাচীন এশীয় রীতিতে কাঠের তক্তা বা বাক্সের উপর রেখে সেগুলো সরিয়ে ফেলছিল। আজ প্রথম ফার্নেসে কাজ আরম্ভ হতে চলেছে। তার চিমনি থেকে একফালি বাষ্প পাক দিতে দিতে আকাশে উঠছে; কয়েক সপ্তাহ ধরে চিমনিটা একেবারে শুকিয়ে যাওয়া চাই। তারপর, এর মধ্যে কাঁচা লোহার পিণ্ড, কোক কয়লা আর চুনো পাথর ঢালা হবে উপর থেকে—সেগুলো ধীরে ধীরে পুড়তে পুড়তে নীচে নেমে যাবে। কয়লটা এখানেই পাওয়া যায়। ১৫০০ মাইল দূরে উরল

অঞ্চলের 'চুম্বক পাহাড়' থেকে তার এসেছে, "লোহা যাচ্ছে।" আর গোনাগুনতি কয়েকটা দিনের পরই সাইবেরিয়ার একটা আধুনিক কারখানা থেকে ইস্পাত তৈরী হয়ে আসবে।

বৃহদাকার সিলিণ্ডার আটটার ওপারে এক ডজন বড় বড় ইমারৎ: কোক চুল্লীর দীর্ঘ কালো কালো চিমনি আর প্রকাণ্ড দেওয়াল; কারখানা বিদ্যালয়, সেখানে ছয় হাজার চাষী ইস্পাতের কাজ শিখছে; পাওয়ার প্ল্যাণ্টটা উঠেছে সাততলা উঁচু হয়ে; তার একটা টারবাইন কয়েক দিনের মধ্যেই চালু হবে। তারও ওদিকে, ঢালাই কারখানার বহু চূড়া-বিশিষ্ট ছাদ দেখা যাচ্ছে। এ কারখানাঘরের এখনও খোঁড়ার কাজই অর্ধেক বাকি রয়েছে অথচ এরই মধ্যে—এই অর্ধসমাপ্ত অবস্থাতেই এটাতে দু'শ টন লোহা ঢালাই হয়ে গিয়েছে। তারও ওদিকে, বাঁ হাতে, 'ওপেন্ হার্থ'। এখনও এটাতে কাজ শুরু হয়নি, পৃথিবীর সব 'ওপেন্ হার্থের' চেয়ে এটা বড় হবে। আরও দূরে দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের ভিতের উপর উঁচু উঁচু ইস্পাতের থাম; গ্যারীর সমকক্ষ একটা ব্লুমিং মিল হবে ওখানে—তারই কাজ হচ্ছে। গ্যারীর মিলই এখনও পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম।

এখানেই শেষ নয়। দূরে বাঁদিকে. পাহাড়টার কিনারার নীচে, দেখা যাচ্ছে: পঁচিশ লক্ষ ডলারের ইট তৈরীর কারখানা—এখন ওখানে ফার্নেসের জন্যে বিশেষ ধরনের ইট তৈরী হচ্ছে; স্তালমোস্তের ছাড়া ছাড়া কারখানাঘরগুলো—এগুলোতে ফার্নেসের জন্যে বয়লার প্লেটে বল্টু আঁটা হয়; বয়লার কারখানা; মেসিন কারখানা—ওগুলোতে কাজ হচ্ছে এখন। বহুদূরে আবছা দেখা যাচ্ছে, নতুন শহরের জন্যে 'সাধারণ ইটে'র পাঁজা; কাঠের কারখানা—ওখান থেকে লোকবাসের উপযুক্ত আদর্শ বাড়ি একেবারে তৈরী হয়ে বেরোচ্ছে।

দু'বছর আগে এখানে ছিল একটা নিরিবিলি উপত্যকা, সে উপত্যকায় একটা মাত্র তন্দ্রাজড়িত গ্রাম—হাজার দেড়েক লোকের বাস ছিল সেখানে। গত বছর, এখানে ছিল কয়েকটা ব্যারাক আর মাটি-খোঁড়া ঘর; অল্প স্বল্প খোঁড়ার কাজ চলছিল। আজ একটা

নতুন শহর দৃষ্টির বাইরে পর্যন্ত বিস্তারিত হয়েছে। কিছু লোক এখনও মাটি-খোঁড়া ঘরেই রয়েছে, কিছু লোক ব্যারাকগুলোতে, আরো কিছু লোক এই 'সমাজতন্ত্রী শহরে'র চারতলা পাকা বাড়িগুলোতে। সাইবেরিয়ার এই বুনো জায়গায় গজিয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ইস্পাত কারখানা।

এটা ফ্রাঙ্কফোর্ট গড়েননি। মার্কিন বিশেষজ্ঞরা বা ওখানকার ৪৫ হাজার শ্রমিকরাও গড়েনি এটা। সমস্ত রুশিয়ার লোকে গড়েছে এটাকে ;—লেনিনগ্রাদের ইস্পাত কারখানাগুলোয়, উক্রাইনের ছোট কারখানাগুলোয় এর জন্যে কাজ হয়েছে। সর্বত্র ডাক পড়েছিল : 'কুজ্‌নেৎস্কের জন্যে তাড়াতাড়ি কর।' সর্বত্রই শ্রমিকরা তাড়াহুড়ো করেছিল, তাদের কাজ নামিয়ে দিয়েছিল। আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম, লেনিনগ্রাদ থেকে একটা ট্রেণ এসে পৌঁছল। ট্রেণটা একটা মালগাড়ি হয়েই যাত্রা শুরু করে, পৌঁছয় দু'টো মালগাড়ি হয়ে। লেনিনগ্রাদ থেকে একটা 'শক্-বিগ্রেড্' বেরোয় তাদের মাল পৌঁছাতে—সাইবেরিয়ার অলস স্টেশনগুলোতে যাতে গাড়ি আটকা না পড়ে তার তদারক করার জন্যে। প্রত্যেক স্টেশনে তারা খুঁজে দেখে, কুজনেৎস্ক যাওয়ার কোনো গাড়ি পাশে ফেলা আছে কিনা। ৩৯টা গাড়ি নিয়ে তারা লেনিনগ্রাদ থেকে বের হয়, পৌঁছয় ৯০টা গাড়ি নিয়ে। সারাটা রাস্তা তারা স্টেশন-মাস্টারদের হুড়ো লাগিয়ে যায়।

এই হল কুজনেৎস্ক ইস্পাত কারখানার ইতিকথা। একদিকে ছিল সাইবেরিয়ার তন্দ্রালস পাহাড়, অপটু চাষী ; দু' হাজার মাইল রেলপথের যত্রতত্র সেখানকার জন্যে পাঠানো মালপত্র। এ সবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সারা সোবিয়েৎ দেশের দুঃসাহসিক শ্রমিকদল, যারা প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, কুজনেৎস্ককে তারা দাঁড় করাবেই। কারণ, কুজনেৎস্ক থেকেই হল সাইবেরিয়ার শিল্পপ্রসারের আরম্ভ। এর মধ্যেই এ কারখানা হাজার হাজার চাষীকে ইস্পাতের কাজে পাকা করে তুলেছে ; শত শত ইঞ্জিনিয়ারকে অভিজ্ঞতা দিয়েছে।

এটার পর, ঐ উপত্যকারই মধ্যে কুজনেৎস্ক থেকে কিছু দূরে, আর একটি ইস্পাত কারখানা তৈরী হবে—সেটা হবে এটার দ্বিগুণ। 'এটার চেয়ে দ্বিগুণ বড়'—কথাটা সকলেই বেশ সহজ ভাবেই বলছিল। কারণ, কুজনেৎস্ক-এর পর সাইবেরিয়ায় আর কোনো কারখানা তৈরি করাই শক্ত হবে না।

* * *

ম্যাগ্‌নিটোগর্‌স্ক্‌—নামটার অর্থ চুম্বক গিরি—কুজনেৎস্কের চেয়েও বড়। এখানে তার কাহিনী বলার স্থান হবে না। এটুকু শুধু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিকটতম শহর থেকে রেলপথে ৫০০ মাইল দূরে, উরল পর্বতের সানুদেশে, ১ লক্ষ ৮০ হাজার অধিবাসীর এই শহরটা মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে পুরোপুরি গড়ে উঠেছিল। এটা ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নির্মাণ-শিবির। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জমাট লৌহপিণ্ড পাওয়া যায় এখানে। এটা যুবকদের শহর—যুবকের কর্মশক্তি এখানে সুস্পষ্ট; এখানকার শতকরা ষাটজন শ্রমিকেরই বয়স ২৪-এর কম। এখানে ৩৫টা বিভিন্ন জাতের লোক এসে মিলেছে—এরই মধ্যে তারা ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে, একটি শিল্প-শিক্ষালয় আর দু'টো শিল্প-শিক্ষা-বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে,—তার একটাতে ধাতুবিদ্যা শেখানো হয় আর একটাতে গৃহনির্মাণ-বিদ্যা। এর মধ্যেই এ শহরে একটা থিয়েটার চলেছে, গোটা ছয়েক সিনেমা, আর একটা 'স্বার্দলভস্কের চেয়েও ভাল' সার্কাস।

এই শহরও হয়েছে একটা ইস্পাত কারখানাকে জন্ম দেওয়ার জন্যে;—সাইবেরিয়ায় যেমন কুজনেৎস্ক কারখানা উরল অঞ্চলে এটাও হল তেমনি। এ শহরটাও সারা সোবিয়েতের মজুরদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছে। এখানেও ছোকরা শ্রমিকরা কাজ করার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছে, কাজ-সংক্ষেপের নতুন নতুন পন্থা বার করেছে—কুজনেৎস্কের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গণ্ডায় গণ্ডায় যেসব বৃহৎ কীর্তি সম্পাদিত হয়েছে, এ দু'টো সেগুলোর মধ্যে পড়ে।

১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে স্তালিন পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতিকে জানালেন, আগেকার দিনের শিল্পে-অনুন্নত চাষী-প্রধান রুশিয়া পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় শিল্প-সমৃদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়েছে। ১৯২৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর-এর মধ্যে—চার বছর তিন মাসের মধ্যেই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ সমাধা হয়ে গিয়েছে। শিল্প-শ্রমিকদের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে; আগে ছিল ১ কোটি দশলক্ষ, হয়েছে ২ কোটি ‧০ লক্ষ; শিল্পের উৎপাদনও দ্বিগুণ হয়েছে।

তিনি জানালেন, "আগে আমাদের কোনো লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ছিল না; এখন হয়েছে।

"আগে আমাদের কোনো ট্র্যাক্টর-শিল্প ছিল না; এখন একটা হয়েছে।

"আগে আমাদের কোনো অটো-মোবাইল (মোটর গাড়ি প্রভৃতি তৈরীর) শিল্প ছিল না; এখন একটা হয়েছে।

"আগে আমাদের কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ছিল না, এখন হয়েছে"—এই ভাবে তিনি বিমানপোত-শিল্প, কৃষিযন্ত্র-শিল্প, রসায়ন-শিল্প এবং আরো অনেক শিল্প নতুন গড়ে ওঠার সংবাদ দিয়ে বললেন, "আমরা এমন একটা বহরে এসব গড়েছি, ইউরোপীয় শ্রমশিল্প যার কাছে আসতে পারে না।"

পরিকল্পনা সফল করতে গিয়ে লোক-বসতির পরিবর্তন করতে হয়েছে, শস্যোৎপাদনে অব্যবস্থা ঘটেছে। কিন্তু ইতিহাসের কোনো কালে এত মহৎ অগ্রগতি এত দ্রুত নিষ্পন্ন হয়নি। সোবিয়েৎ দেশের লোকের বিশ্বাস, দ্রুতগতি কাজ না হলে, তাদের সমাজতন্ত্রই শুধু স্থগিত থাকত না, জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে পড়ত। কারণ, ১৯৩৩ সালে, জাপান তো আগে থেকেই মাঞ্চুরিয়ায় বসে সোবিয়েৎ সীমান্তের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে ছিল; জার্মানীর নাৎসীরা উক্রাইনের উপর তাদের দাবি ঘোষণা করছিল। সোবিয়েতের লোকের বিশ্বাস, তারা যদি দ্রুতগতিতে নিজেদের অর্থনৈতিক শক্তি বাড়াতে না পারত, তা হলে উভয় দিক থেকেই তাদের উপর আক্রমণ আসত।

স্তালিন তার জানুয়ারী রিপোর্টে বললেন, "যে দেশ একশ' বছর পিছনে পড়েছিল এবং তার এই পিছু পড়ে থাকার দরুণ মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল, তাকে চাব্‌কে সচেতন না করে আমরা পারিনি। যদি তা না করতাম, তা হলে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত পুঁজিবাদীদের বেষ্টনীর মধ্যে আমাদের নিরস্ত্র-অবস্থায় পড়ে থাকতে হত।"

* * * *

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে, সোবিয়েৎ দেশ দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রস্তাব হল, গতবারের তুলনায় পাঁচগুণ নতুন শিল্প গড়া হবে, দেশের সমগ্র অর্থনীতি নতুন ধাঁচে তৈরি করতে হবে। স্তালিন বললেন, "এখন তা করা 'নিঃসন্দেহে অনেক সহজ'; ভবিষ্যতের কোনো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাই প্রথমটার মত অত শক্ত হবে না।" পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ছন্দ ধরে দেশ এগিয়ে চলল।

১৯৩৫ সাল নাগাদ, সোবিয়েৎ নেতারা বলতে লাগলেন, সমাজতন্ত্র বিজয়ী হয়েছে। তার অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়ে গিয়েছিল তখন।

তার এক বছর আগে, যখন সোবিয়েৎ দেশের সর্বত্র রব উঠেছিল, "আমাদের পরের লড়াই হচ্ছে মালের গুণ বাড়ানো জন্যে, বাড়তি মাল তৈরি করার জন্যে", 'মস্কো নিউজ' কাগজের একজন রিপোর্টার সাইবেরিয়া ঘুরে এসে বললেন, "কুজনেৎস্ক-এর খবর কিছু আন্দাজ করতে পারেন? ওখানে ওরা চুম্বক-গিরির লোকদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে ফুল-বাগিচা তৈরীর ব্যাপারে।"

অফিসসুদ্ধ লোক হেসে উঠল। কুজনেৎস্ক! ও বদ্‌খৎ জায়গা, ধুলো আর উকুনের মধ্যে থেকে লোকে যাকে ইস্পাত নগরী করে তুলেছে! ব্লাস্ট ফার্নেস্‌ তৈরীর ব্যাপারে তারা পাল্লা দিলেও দিতে পারে। ফুল-বাগিচা বানাবে তারা? ছোঃ!

রিপোর্টার জানালেন, "খবরটা খাঁটি। আমি প্রতিযোগিতার শর্তগুলো জেনে এসেছি—তার মধ্যে পড়ে বাগিচা, দু'পাশে গাছ

দেওয়া রাস্তা, শ্রমিকদের ক্লাবঘর। চুম্বক-গিরির আছে ঘাস-লাগানো সমতল মাঠ, গাছ, আর চমৎকার সব মোটর বাস। আর কুজনেৎস্কের আছে ট্রাম গাড়ি আর মস্কো থেকে আসা একটা থিয়েটারের দল। মেয়ারহোল্ড কোম্পানী এসে এখন ওখানে অভিনয় দেখাচ্ছে।”

কৃষিকার্যে বিপ্লব

সমাজতান্ত্রিক শিল্পের দ্রুত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খেতখামারের কাজেও সমান দ্রুত বিপ্লব হয়ে গেল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্ষুদ্রাকার অনুন্নত খামার একত্রিত হয়ে দু'লক্ষ বৃহদাকার খামারে পরিণত হল, সেগুলোতে যৌথ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হল ; ট্র্যাক্টর ও আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার চালু হল। চাষীদের শ্রীবৃদ্ধি এবং জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে এ পরিবর্তনের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ১৯২৮ সালে, রুশিয়ায় যে প্রাচীন প্রথায় চাষ হচ্ছিল তার দ্বারা শহরগুলোকেও খাওয়ানো চলছিল না ; দ্রুত শিল্পপ্রসার এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রমবিস্তারের উপযুক্ত খাদ্য জোগানো সে প্রথায় একেবারে অসম্ভব ছিল। শিল্পপ্রসারের সঙ্গে তাল রেখে কৃষিকার্যেও আধুনিক প্রথা প্রবর্তন করার দরকার পড়ে গিয়েছিল।

১৯২৮ সালে, রুশ চাষীরা চাষ করত মধ্যযুগীয় প্রথায়, তার চেয়েও আদিম প্রথায়। তারা গ্রামে বাস করত, অনেক খানা পথ ভেঙে তাদের মাঠে যেতে হত। এক একটা পরিবারের জমি ছিল ১০ কি ২০ একর, তাও নানা খণ্ডে বিভক্ত। প্রায়ই এ খণ্ডগুলো থাকত এখানে-ওখানে ছড়ানো। জমিগুলো প্রায়ই এত সঙ্কীর্ণ হত যে, ঠিকমত মই ঘোরানোও চলত না। চাষীদের এক চতুর্থাংশের ঘোড়া ছিল না ; অর্ধেকের কম চাষীর এক জোড়া ঘোড়া বা বলদ ছিল। জমিতে অনেক সময় লাঙল পড়ত না ; লাঙল পড়লেও মাটি ঠিকমত খোঁড়া

হত না। লাঙলগুলো ছিল ঘরে তৈরী, কাঠের; লোহার ফাল পর্যন্ত থাকত না সেগুলোর। বীজ বোনা হত হাত দিয়ে, আঁচল থেকে তুলে মাঠে ছিটানো হত—তার কিছুটা হাওয়ায় উড়ে যেত, পাখিরা খেয়ে দিত। যন্ত্রপাতির বালাই ছিল না। একটা শিশু-উপনিবেশের জন্যে আমি একটি ফোর্ডসন ট্র্যাক্টর জোগাড় করেছিলাম—দু'শ মাইলের মধ্যে ঐটাই ছিল একমাত্র ট্র্যাক্টর।

সামাজিক জীবনও ছিল ঐ রকম মধ্যযুগীয়। বুড়ো কর্তার কথামত বাড়ির সবাই চলত। ছেলেরা বিয়ে করে বউ আনত কর্তার বাড়িতে, খামারে খাটত—বাবা কর্তৃত্ব করতেন সেখানে। ফলে খেতখামারের কাজ চলত পুরানো ঢঙে, নতুন চিন্তার কোনো ছাপ পড়ত না। কৃষিকর্মের অনেকখানা ছিল ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শুভ দিন দেখে বীজ বোনা হত; জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্যে শোভাযাত্রা করে মাঠে গিয়ে পবিত্র জল ছিটানো হত; শোভাযাত্রা বার করে, ভগবানের স্তুতি করে বৃষ্টি কামনা করা হত। অতি-ধার্মিকরা ট্র্যাক্টরকে বলত 'শয়তান কল'—পুরোহিতদের প্ররোচনায় চাষীরা ট্র্যাক্টর দেখলে ঢিল ছুঁড়ত। এই কারণে, আধুনিক ধরনের কৃষিকাজের জন্যে লড়াই হয়ে দাঁড়াল 'ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই'। আমার মনে পড়ছে, চাষীরা যাতে সকাল সকাল বীজ বোনে তার জন্যে ইভানোভো প্রদেশে, বালক কমিউনিস্টদের 'পবিত্র হেলেনা'র বিরুদ্ধে কি প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছিল!—শতাব্দীর পর শতাব্দী এই দেবতাটির উৎসবের দিন বীজ বোনার রীতি চলে আসছিল সেখানে।

১৯২৮ সাল নাগাদ, খামারগুলো মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সেরে উঠেছিল। মোট ফসল যুদ্ধের আগেকার মত হচ্ছিল বটে, কিন্তু যে পরিমাণ শস্য যুদ্ধের আগে শহরে যেত তা যাচ্ছিল না। চাষীরা উপবাসী থাকলেও জারতন্ত্রী রুশিয়া বিদেশে শস্য পাঠাত। সোভিয়েৎ চাষীরা আগের চেয়ে খাচ্ছিল ভাল, কিন্তু বাজারে আনছিল কম। উদ্বৃত্তটা প্রায়ই কুলাকদের হাতে। কুলাকরা—এই খুদে গ্রাম্য

ধনিকরা শুধু নিজেদের শস্যই পেত না, আটা-কলের মালিক হিসেবে এবং ভবিষ্যৎ ফসল বন্ধক রেখে টাকা দাদন দিয়েও তারা অনেক শস্য পেত। এই ভাবে শস্য-নিয়ন্ত্রণ এবং চাষীদের সমর্থন পাওয়ার জন্যে তারা রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়াই করছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণ পন্থীদের মত ছিলঃ কুলাকদের ধনী হতে দেওয়া উচিত; রাষ্ট্র শ্রমশিল্পগুলোর মালিক থাকলেই সমাজতন্ত্র আসবে। বামপন্থীরা চাইত, চাষীদের জোর করে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীনে যৌথ খামারগুলোতে টানতে। কয়েক বছর, পার্টির বিভিন্ন উপদলের চাপে কখনও এ নীতি, কখনও সে নীতি অনুযায়ী কাজ হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত, সরকার থেকে ঋণ এবং ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষীদের যৌথ খামারে টানার, মোটা ট্যাক্স চাপিয়ে কুলাকদের ঠাণ্ডা করার এবং 'শ্রেণী হিসেবে' তাদের উচ্ছেদ করার নীতিটাই গৃহীত হল। যৌথ খামারের সদস্য হওয়া না-হওয়া কাগজে কলমে চাষীদের ইচ্ছাধীন থাকল বটে, কার্যতঃ কখনো কখনো যৌথ খামারের সদস্য হওয়ার জন্যে চাষীদের উপর অতিরিক্ত চাপও দেওয়া হত না।

মার্কিন টীকাকাররা সাধারণতঃ বলেন যে, স্তালিন জোর করে যৌথ খামার-প্রথা চালিয়েছিলেন। তাঁরা এমন কথাও বলেন যে, তিনি ইচ্ছা করেই গ্রামাঞ্চলে লক্ষ লক্ষ চাষীকে উপবাসী রেখে তাদের যৌথ খামারে যোগ দিতে বাধ্য করেছিলেন। এ কথা সত্য নয়। আমি ঐ সময় ঘুরে ঘুরে দেখেছি; আমি জানি, কি ঘটেছিল। স্তালিন অবশ্যই এ পরিবর্তন চালু করেছিলেন, এটা পরিচালন করেছিলেন। কিন্তু স্তালিন যে গতিতে যৌথ প্রথা প্রবর্তন করবার পরিকল্পনা করেছিলেন, প্রবর্তন তার চেয়ে এত বেশী দ্রুত হল যে, খামারগুলোর জন্যে যথেষ্ট যন্ত্রপাতি প্রস্তুত পাওয়া গেল না; যথেষ্ট সংখ্যক হিসাবনবিস বা ম্যানেজারও পাওয়া গেল না। দেশের লোকের সাধ ছিল, কিন্তু পটুতা ছিল না, তার সঙ্গে যুক্ত হল কুলাকদের প্ররোচনায় আতঙ্কগ্রস্ত চাষীদের গরু-ঘোড়া-বধ; তারও উপর দেখা দিল দু'বছর অনাবৃষ্টি। ফলে ১৯৩২ সালে খাদ্যসঙ্কট ঘটল—সেটা ঘটল স্তালিনের

'চাপ'-এর দু' বছর পরে। সারা দেশব্যাপী কড়া রেশনিং-ব্যবস্থা চালিয়ে মস্কো সে সঙ্কটের মধ্যে দেশকে পার করে দিল।

১৯২৯ সালের শরৎকালে ভল্গা অঞ্চলের দক্ষিণ ভাগে যৌথ খামার করার জন্যে যে প্রচণ্ড ঝোঁক উঠেছিল, সেটা আমি দেখেছি। সে একটা বিপ্লব ; ১৯১৭ সালের বিপ্লবের চেয়েও অনেক গভীর একটা পরিবর্তন ঘটাল এ বিপ্লব। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পরিণত ফল দেখা গেল এটাতে। খেত-মজুরবা আর দরিদ্র চাষীরা এ ব্যাপারে অগ্রণী হল ; তাদের আশা, সরকারী সাহায্যে তারা তাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবে। কুলাকরা আগুন লাগিয়ে, খুন করে—যে ভাবে পারে, এ আন্দোলনে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল। কৃষিকাজের যারা সত্যিকার মেরুদণ্ড স্বরূপ, সেই মাঝারি অবস্থায় চাষীরা পড়ল দ্বিধার মধ্যে—একদিকে, কুলাক হওয়ার আশা ; আর একদিকে, রাষ্ট্রের কাছ থেকে যন্ত্রপাতি পাওযার ইচ্ছা। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দৌলতে ট্রাক্টর পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় এই সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষীরা গ্রামকে গ্রাম, চাকলাকে চাকলা, যৌথ খামারে জমায়েত করতে লাগল।

আৎকারস্ক যৌথ খামার সঙ্ঘের সভাপতি আমার দিকে এক গোছা টেলিগ্রাম নেড়ে পরম হর্ষভরে বললেন—(ক' মাস আগে এ রকম কোনো সঙ্ঘের অস্তিত্ব ছিল না)—"২০শে নভেম্বর তারিখে আমাদের এলাকার অর্ধেক খামারে যৌথ ব্যবস্থা চালু ছিল। ১লা ডিসেম্বর, শতকরা ৬৫টি খামারে এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। দশদিন অন্তর আমরা হিসেব পাই। ১০ই ডিসেম্বর নাগাদ, শতকরা ৮০টি খামার যৌথ ব্যবস্থার মধ্যে এসে যাবে বলে আশা করা যায়।"

কয়েক মাস আগে, লোকে ধীরভাবে যৌথ খামার সম্বন্ধে আলোচনা করছিল : যৌথ ব্যবস্থায় কত নতুন জমিতে চাষ করা সম্ভব হবে? ট্রাক্টর পাওয়ার সম্ভাবনা কি রকম? এসুব। কিন্তু এখন গ্রামাঞ্চলে যেন একটা নবজীবনের সাড়া পড়েছে। কোনো গ্রাম একক হিসেবে সংগঠিত হল, তারপর আরও বিশটি

গ্রামের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমবায় প্রথায় শস্য বিক্রয়-কেন্দ্র ও শস্য-কল খুলবার প্রস্তাব করল। একদিন সাময়লোভ্‌কা ৩,৫০,০০০ একরের একটা যৌথ খামার স্থাপন করে সবার উপর টেক্কা দিল। তারপর, বালাকভ্‌ ৬,৭৫,০০০ একরের খামার তৈরি করার কথা জানাল; তারপর, ইয়েলান্‌ ৪টা বড় বড় কমিউন্‌ যোগ করে ৭,৫০,০০০ একরের খামার খাড়া করে বসল। বালান্দার চাষীরা এ খবর শুনে জনসভা করে সকলকে উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল: "কুছ পরোয়া নেই! আমাদের দু'টো চাকলাকে জুড়ে ১০ লক্ষ একরের খামার করে নেব আমরা।" 'বীজ বোনার মহড়া'র জন্যে হাজারটা ঘোড়া নামানো হল মাঠে। সত্তর বছরের এক বুড়ো ক্যামেরার সামনে ছুটে এসে বলল: এ সব ঘোড়ার সঙ্গে আমার ছবিটাও তুলে নাও। এখন আমি মরতেও রাজী। এমন দিন আমি জীবনে কখনও দেখিনি।"

এ সব আলোচনায় পার্টি থেকে সংগঠকরা এসে যোগ দিত। তাদের মধ্যে যারা খামারের ব্যাপারে অভিজ্ঞ লোক, তারা চাষীদের পরামর্শ দিত; তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ছিল খামার সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ শিল্প-শ্রমিক, কিন্তু যৌথ খামার সম্পর্কে তাদের উৎসাহ তাই বলে কম ছিল না। "একটা মাঠে হাজার ঘোড়া নামানোর কি মানে হয়? তাতে খুব ফুর্তি হতে পারে, কিন্তু ভাল চাষের কাজে তার দরকার আছে কি?" খুব গরম গরম তর্ক হল; চটাচটিও হল। উত্তর কালে, মস্কো একে 'দৈত্যাকৃতি রোগ' বলে নিন্দা করেছিল। কিন্তু প্রথম দিকে উৎসাহীরা সব রকম সাবধানতাকেই 'প্রতিবিপ্লব' বলত। পরিবারে ভাঙন লাগল; ছোকরারা উৎসাহীদের অনুগামী হল, তারা নতুন পথে চলতে চায়। বুড়োরা দ্বিধা করতে লাগল; শুধু জমির উপর নয়, বাড়ির লোকজনের উপরও তাদের কর্তৃত্ব চলে যাচ্ছে। মেয়েদের ভাবনা ধরল, বাড়ির গরুটার কি হবে। কোন্‌ কোন্‌ পশুর উপর সমবেত মালিকানা বর্তাবে তা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না; কয়েক রকমেরই তো যৌথ খামার তৈরী হচ্ছিল তখন।

কুলাকরা আর পাদ্রীরা নানা গুজব রটিয়ে ব্যাপারটাকে আরও ঘোরাল করে তুলছিল, লোকের যৌনসংক্রান্ত ভাবাবেগ আর ভয় জাগাচ্ছিল তারা। আমি বলতে শুনেছি: যৌথ খামারের সবগুলো মেয়ে মর্দ 'একটা প্রকাণ্ড কম্বলের নীচে' শুয়ে থাকবে! সর্বত্র গুজব চলছিল যে, শিশুদের সাধারণ সম্পত্তি করে নেওয়া হবে! কোথাও কোথাও কুলাকরা যৌথ খামারে যোগ দিচ্ছিল—মধ্যে থেকে কর্তৃত্ব করতে, অথবা খামারের সর্বনাশ করতে। আবার কোথাও কোথাও অনভিপ্রেত সদস্য বলে যৌথ খামার থেকে কুলাকদের তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কোনো কোনো যৌথ খামার কুলাকদের ঘোড়া নিল কিন্তু কুলাকদের নিল না—'১৭ সালের বিপ্লবের সময় জমিদারদের কৃষি-সংক্রান্ত সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে যেমনটা করা হয়েছিল। কুলাকরা শোধ নিল যৌথ খামারের গোলা ঘর পুড়িয়ে দিয়ে, এমনকি গুপ্ত হত্যা করে। আৎকারস্কে, তখন একজন পার্টি সম্পাদককে খুন করার দায়ে ১২ জন কুলাকের বিচার প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। সরকার পক্ষের উকিল বললেন, "উনি আমাদের সকলের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন"; সে কথা শুনে চাষী শ্রোতাদের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। শহীদের নামে যৌথ খামারের নামকরণ হতে লাগল; যৌথ ব্যবস্থার হিড়িক আরও বেড়ে গেল।

ও অঞ্চল থেকে চলে আসার সময় আমি স্থানীয় একজন সরকারী কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করলাম, "মস্কো এসব সম্বন্ধে কি বলে?" তিনি তাড়াতাড়ি বেশ গর্বভরে উত্তর দিলেন, "মস্কোর মতামত জানার জন্যে অপেক্ষা করলে আমাদের চলে না; মস্কো তার পরিকল্পনা তৈরি করে আমরা কি করছি দেখে।"

মস্কো ফিরে আমি জানলাম, মস্কো পরিকল্পনা তৈরি করছে। সমস্ত প্রধান প্রধান শস্য-এলাকার সংবাদ আনিয়ে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে ঐ সব পরিকল্পনা রচিত হত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৩৩ সালের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ যৌথকরণের প্রস্তাব ছিল; কিন্তু এই অভিযানের ফলে কোনো কোনো এলাকায় ১৯৩০ সালের

মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগে যৌথ ব্যবস্থা হয়ে গেল। এত বেশী যৌথ খামারের উপযুক্ত ট্র্যাক্টর বা যন্ত্রপাতির জন্যে পরিকল্পনা করা হয়নি। সুতরাং মস্কো কাঁচা তুলোর আমদানি একেবারে কমিয়ে দিল; ফলে, লোককে আরও কয়েক বছর ছেঁড়া কাপড়ে রাখার ব্যবস্থা করা হল। ব্রেজিলের কাছে বেশ সস্তা দরে কফির অর্ডার দেওয়া হয়েছিল, সে অর্ডার বাতিল করে ব্রেজিলকে চটানো হল। কৃষিকর্মের যন্ত্রপাতির আমদানি বাড়িয়ে দিয়ে মস্কো হেনরী ফোর্ডকে একরকম বন্ধু করে ফেলল। এই সময়েই খারকভ উক্রাইনের চাহিদা মেটাবার জন্যে 'পরিকল্পনার বাইরে' তার নিজস্ব ট্র্যাক্টর কারখানা খোলার সিদ্ধান্ত করেছিল।

শীতকালের মাঝামাঝি আমি ওডেসা অঞ্চলে গেলাম ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলোর প্রথমটা দেখতে। মার্কোভিচ্ বলে একজন খামার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি খামারগুলোকে ট্র্যাক্টরের সুযোগ দেওয়ার একটা চমৎকার উপায় বার করেছিলেন। উপায়টা বেশ কাজের, অথচ তাতে খরচ কম। চাষীরা যন্ত্রপাতি ঠিকমত ব্যবহার করতে বা সারাতে পারবে না বুঝে, তিনি তাদের কাছে সেগুলো বিক্রি না করে, একটা কেন্দ্রে কয়েক কুড়ি ট্র্যাক্টর জড়ো করলেন; সব রকম যন্ত্রপাতি মজুত রাখা হল সে কেন্দ্রে; সঙ্গে একটা যন্ত্র মেরামতের কারখানা, আর, ট্র্যাক্টর চালানো শেখাবার ইস্কুলও খোলা হল। এই কেন্দ্র বিশ মাইলের মধ্যে সমস্ত খামারের সঙ্গে চুক্তি করে নিল যে, যে কাজের জন্যই হোক এখান থেকে ট্র্যাক্টর জোগানো হবে; তার ভাড়া হিসেবে নেওয়া হবে শস্য। দরকার মত এ ব্যবস্থার হেরফের করা যেত। একটা মোটামুটি সমৃদ্ধ খামারের অনেকগুলো ঘোড়া ছিল, সে খামার ট্র্যাক্টর ভাড়া নিল কেবল পতিত জমি আবাদ করার জন্যে; আবার ইহুদী অগ্রগামীদের একটা খামার সরকারের কাছ থেকে জমি পেলেও তার ঘোড়া বা গরু ছিল খুব কম; সে খামার মাঠের প্রায় সব কাজই ট্র্যাক্টর-কেন্দ্রকে দিয়ে করিয়ে নিত। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ট্র্যাক্টর ঘাঁটি এতই উপকারী দেখা গেল যে, সারা সোবিয়েৎ দেশে এ রকম ঘাঁটি

ছড়িয়ে পড়ল। বর্তমানে প্রধানতঃ এই রীতিতেই খামারগুলোর জন্যে যন্ত্রপাতি জোগান দেওয়া হয়।

১৯২৯-৩০ সালের শীতকালটা ছিল একটা খুব বিশৃঙ্খলার সময়। যৌথ খামার ঠিক কি রকম হবে, তা বোঝা যাচ্ছিল না। স্তালিনও চাষীদের কার্যধারা লক্ষ্য করে তাঁর পরিকল্পনা করছিলেন। ১৯২৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর, তিনি বললেন, "শ্রেণী হিসেবে কুলাক শ্রেণীকে উচ্ছেদ করার সময় এসে গিয়েছে।" তাঁর এ উক্তির দ্বারা গরীব চাষীরা যা করেছিল তাই সমর্থন করা হল; কিন্তু এ সমর্থন পাওয়ার পর চাষীদের উৎসাহ আরও বেড়ে গেল। কুলাকদের বাড়ির চালা খুলে নেওয়া, তাদিকে যথেচ্ছ নির্বাসনে দেওয়ার মর্মন্তুদ সংবাদ আসতে লাগল। ইতিমধ্যে সংগঠকরা অন্যদের উপর টেক্কা দেওয়ার তাগিদে চাষীদের 'কুলাক' বলে নির্বাসনে পাঠানোর ভয় দেখিয়ে যৌথ খামারে ভর্তি হতে বাধ্য করল; তারা গরু, ছাগল, মুরগী, এমন কি থালাবাটি, পরিধেয় অন্তর্বাস পর্যন্ত 'সাধারণ সম্পত্তি' করতে লাগল। এই অত্যাচারের কাহিনীকে যথাসম্ভব ফলাও করে কুলাকরা চাষীদের উস্কানি দিতে লাগল, তাদের গরু, ছাগল, মুরগী সব খেয়ে-দেয়ে ফেলতে; তারা চাষীদের বুঝাল, "এ সব খেয়ে ফেলে, তারপর খালি হাতে যৌথ খামারে চলে যাও সব; সরকার তোমাদের খাওয়াবে সেখানে।"

আমি একজন কমিউনিস্ট বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম "স্তালিন কেন এ সব বন্ধ করছেন না? কুলাকদের কি কোনো অধিকার নেই না কি? এ যে একদম অরাজকতা!"

তিনি বললেন, "সত্যিই তাই। এটা ঘটেছে পার্টির মধ্যে বিভেদের জন্যে; এর জন্যে আমাদের কমিউনিস্টদের দোষ মানতেই হবে। স্তালিন পথ নির্দেশ করে দিয়েছেন—শ্রেণী হিসেবে কুলাকদের উচ্ছেদ করতে হবে।" পার্টির মধ্যে যে সব দক্ষিণ-পন্থী শাসনযন্ত্র-নিয়ন্ত্রণ করছেন—আমি জানি তিনি রায়কভের সম্পর্কে এ ইঙ্গিত করলেন—"তাঁরা স্তালিনের নির্দেশিত নীতিকে আইনের রূপ দিতে

দেরী করছেন। ফলে আমাদের স্থানীয় কমরেডদের মধ্যে যাঁরা বামপন্থী তাঁরা হাতের কাছে কোনো আইন না পেয়ে, তাঁদের এবং খেতমজুর আর গরীব চাষীদের চোখে যা সঙ্গত ব'লে বোধ হচ্ছে তাই করছেন। এটা অরাজকতা। শীঘ্রিই সরকারী হুকুম বেরুবে বলে আশা করছি, তখন অনেকটা শৃস্খলা ফিরে আসবে।"

১৯৩০ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে প্রথম সরকারী হুকুম বার হল—তাতে বলা হল, যেসব জায়গায় যৌথীকরণ পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে আর রীতিমত শুনানীর পর বিশেষ বিশেষ লোককে নির্বাসনে পাঠানোর দাবি চাষীদের সভায় ওঠানো হচ্ছে, সেখানে কুলাকদের নির্বাসন দেওয়া বৈধ বলে বিবেচিত হবে। যেসব কুলাকদের নির্বাসন দাবি করা হচ্ছে; তাদের নামের তালিকা প্রাদেশিক কর্তারা পরীক্ষা করবেন; ঐ কুলাকরা কোথায় যাবে তাও ঠিক করে দিতে হবে। তাদের সাধারণতঃ পাঠানো হচ্ছিল নতুন নির্মাণকার্যগুলোতে বা সাইবেরিয়ার পতিত জমিতে। সরকারী হুকুম বের হওয়ার পর, অরাজকতা কমল; তবু অনেক ভুল ভ্রান্তি, অনেক অত্যাচার ঘটল।

স্তালিন কেন এ ব্যাপারটি নিজের হাতে নিলেন না?

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন আমার কমিউনিস্ট বন্ধুটি। "যৌথ বীজ যৌথ গোলায় না আসা পর্যন্ত, বীজ বোনা নিরাপদে না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা স্থানীয় কমরেডদের বাধা দিতে পারছি না। যদি দিতে যাই, ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে।" তাঁর এ কথার মর্ম ছিল :— যে চাষীরা তাদের গরু, ছাগল খেয়ে শেষ করে সরকার তাদের খাওয়াবে বলে আশা করছে, তারা বীজশস্যও খেয়ে সাবাড় করতে পারে। তিনি বললেন, "আমরা যেন খুব ঢালু বরফের উপর দিয়ে স্কী পায়ে চলেছি—আমরা না পারি থামতে, না গতি বা দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে। ঠিকমত ঝাঁপগুলো দেওয়া আর পায়ের উপর খাড়া থাকা ছাড়া আমাদের করার কিছু নেই। তা না পারলেই, সর্বনাশ!" তাঁর এ কথার মর্ম বুঝেছিলাম, যখন আমি নতুন পাসপোর্ট নেওয়ার জন্যে

রিগায় গেলাম। তখন সোবিয়েৎ দেশে ওয়াশিংটনের কোনো দূতাবাস ছিল না। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মার্কিন কন্‌সুলেট্‌-এর লোকগুলো সোবিয়েৎ দেশের নানা জায়গার কাগজগুলো থেকে সোবিয়েতের যৌথীকরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার কাজে তাদের সবটা সময় নিয়োগ করছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যের বৈদেশিক দপ্তরে তারা একটা হাজার পাতার রিপোর্ট দেয়। বিদেশীরা ভবিষ্যৎ বাণী করছিল ঃ সোবিয়েৎ দেশ দুর্ভিক্ষের দরুণ ভেঙে পড়বে। সোবিয়েৎ সীমান্তের একাধিক রাষ্ট্র সোবিয়েৎকে আক্রমণ করার জন্যে সৈন্য সাজাচ্ছিল বলে সংবাদ আসছিল।

১৯৩০ সালের ২রা মার্চ তারিখে, প্রধান শস্য-এলাকাগুলোতে বীজসংগ্রহ শেষ হলে, স্তালিন 'সাফল্যের দরুণ মাথা ঘুরে যাওয়ার' সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বিবৃতি বার করলেন। তিনি বললেন, চাষীদের হু হু করে যৌথ খামারে আসতে দেখে কিছু কমরেডের মাথা ঘুরে গিয়েছে। তিনি সকলকে মনে করিয়ে দিলেন যে, যৌথ খামারের সদস্য হওয়া না-হওয়া লোকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং বর্তমান সময়ের জন্যে যে ধরনের যৌথ খামার বাঞ্ছনীয় তাতে জমি, হালের ঘোড়া বা বলদ আর বড় যন্ত্রপাতিমাত্র সমাজের সাধারণ সম্পত্তি হবে ; গরু, ভেড়া, শূয়র, মুরগীর মত গৃহপালিত জীবগুলো তা হবে না। দেশের প্রত্যেকটা সংবাদপত্রে স্তালিনের এই বিবৃতি পুরোপুরি বের হল ; এর লক্ষ লক্ষ কপি 'পত্রিকা'-আকারে লোকের হাতে হাতে ঘুরল। চাষীরা এর জন্যে ঘোড়ায় চেপে শহরে এল, চড়া দামে পত্রিকার কপি সংগ্রহ করল। যেগুলো নিয়ে গিয়ে তারা স্থানীয় সংগঠকদের মুখের উপর নেড়ে দেখাল ;—সেটা তাদের স্বাধীনতার সনদ। হঠাৎ স্তালিন লক্ষ লক্ষ চাষীর চোখে বীর হয়ে উঠলেন— স্থানীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের রক্ষক হিসেবে দেখা দিলেন। স্তালিন অবিলম্বে এই বীরপূজা থামিয়ে দিলেন 'যৌথ খামারের চাষীদের প্রশ্নের উত্তর' বলে একটি লেখা প্রকাশ করে। তাতে তিনি লিখলেন ঃ "কেউ কেউ এমনভাবে কথা বলেন, যেন স্তালিনই ঐ

বিবৃতিটা দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সমিতি কোনো ব্যক্তিবিশেষকে এমন কোনো কাজ করার অধিকার দেন না। বিবৃতিটি কেন্দ্রীয় সমিতিই দিয়েছিলেন।"

* * *

মার্চের শেষ দিকে আমি দক্ষিণে গেলাম, বসন্তকালীন কৃষিকাজ দেখতে। মস্কো থেকে বেরুনোর ২৪ ঘণ্টা পরে স্তালিনগ্রাদ লাইনে বাসন্তিক কৃষিকাজ চোখে পড়ল। মধ্য রাত্রের পর ট্রেন থেকে নামতেই ঝাঁকে ঝাঁকে চাষী এসে আমায় ছেঁকে ধরল—তাদের মুখে তিক্ত অভিযোগ : "এক ডাকাত পার্টির মধ্যে ঢুকে পড়ে আমাদের গাঁয়ের উপর মুরুব্বিয়ানা করে গেল। স্তালিন বলছেন, যৌথ খামারে ঢোকা না ঢোকা লোকের ইচ্ছাধীন ; ওরা কিন্তু আমাদের বলদগুলো ফেরৎ দিচ্ছে না।"

পরদিন সকালে এ এলাকার প্রধান ঘাঁটিতে গিয়ে দেখলাম, ভোর থেকে অনেক রাত্রি পর্যন্ত একজন পরিশ্রান্ত সম্পাদকের উপর এ ধরনের অভিযোগ অবিরত বর্ষিত হচ্ছে। সম্পাদক আমাকে বললেন, "চেয়ারম্যান এখানে নেই। গতকাল রাত্রে কুলাকরা একটা গোলাবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে—সেখানে ২৭টা ঘোড়া ছিল ; বীজ বোনার জন্যে সেগুলোর উপর নির্ভর করা হয়েছিল। চেয়ারম্যান গিয়েছেন চাষীদের সাহায্য করতে। এ সংকটে যা হোক একটা ব্যবস্থা করতে হবেই তাঁকে।" ইতিমধ্যে তিনি সমস্ত আগন্তুককে একই কথা শান্তভাবে বলে যাচ্ছিলেন ; তারা যৌথ খামার ছেড়ে যেতে চাইলে, তাদের বলদ অবশ্যই ফেরৎ পাবেন ; তাই বলে একদিনের নোটিসে, বিশমাইল দূর মাঠ থেকে বলদ টেনে এনে, বীজ বোনার কাজে গোলমাল সৃষ্টি করতে দেওয়া তো চলে না। বিশেষ করে, সপ্তাহের মধ্যে দশবার যখন তাদের মতি বদলাচ্ছে।

নানা চাপে পড়ে খামারগুলো যেন ভেঙে পড়ছিল ;—কুলাকদের হিংসা, পাদ্রীদের আক্রমণ, সরকারী লোকের নির্বুদ্ধিতা এবং মধ্যযুগীয় রুশিয়ার সাধারণ অপটুতা—এ সব মিলে একটা কাণ্ড বাধিয়ে

তুলেছিল। তবু রেল-স্টেশন ছেড়ে একটু ভেতরে যেতেই চোখে পড়ল ব্যাপক বীজ বোনার দৃশ্য—দেখবার মত সে দৃশ্য। বুঝলাম, যেসব সাংবাদিকরা শুধু রেল-স্টেশনে অথবা এলাকা-কেন্দ্রগুলো দেখে বিচার করে, তাদের বিচারে ভুল থাকা অনিবার্য। যত অভিযোগ আর অত্যাচারের কাহিনী গিয়েছে রেল পথের দিকে; এলাকার প্রধান ঘাঁটিতে সে-সবের মীমাংসা চেয়েছে। যে চাষী লাঙ্গল দিতে পারত, সে রেল-স্টেশনে যায়নি; সে লাঙ্গলই দিচ্ছিল। রেলপথ ছেড়ে একটু গেলেই দেখা গেল, জমি ও যন্ত্রপাতির উপর তাদের মালিকানা কায়েম করার জন্যে লোকে সব চেয়ে সেরা ফসল তোলার চেষ্টা করছে।

লোকে তার নাম দিয়েছিল 'প্রথম বলশেভিক বসন্ত'; যৌথ খামারে প্রথম বীজ বোনার বছর ছিল সেটা। মাইলের পর মাইল উর্বরা কালো মাটি—সবটা মিলে একটি খেত; যখন যে ফসল বোনা হবে, সারা খেতটাতেই হবে। একটু দূরে দূরে রয়েছে কৃষি-লড়াইয়ের সৈনিকদল. তাদের ঘোড়া, বলদ বা ট্র্যাক্টর মাঠের উপর দিয়ে তালে তালে চলেছে; এমন দ্রুত অথচ গভীর কর্ষণ সে মাটি এর আগে কখনও পায়নি। রাত্রে মাঠের এখানে ওখানে চাষীরা তাঁবু ফেলে আগুন জ্বেলেছে; সেখানে নরনারী মিলে গান জুড়ে দিয়েছে, ব্যালালাইকা বাজছে। মস্কো থেকে অপেরা-গায়কবা এসেছে; ধর্ম-শোভাযাত্রীদের বদলে এখন যে শোভাযাত্রীরা মাঠে কাজ করতে বের হয়, তাদের আগে আগে চলে এই গায়করা। লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতির্বিদ্যার এক অধ্যাপক এসে চাষীদের মধ্যে গ্রহনক্ষত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন—গ্রহনক্ষত্রের ছায়া-ছবি দেখানোর ব্যবস্থা আছে তাঁর সঙ্গে। মাঠের লোকরা বলছে, এ হচ্ছে 'সংস্কৃতি'; কমিউনিস্টরা বলছে, 'এ হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে লড়াই'। চাষের যন্ত্রপাতি সারাবার জন্যে শহর থেকে একদল মেকানিক এসেছে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নাটকীয় বীজ বোনা আর কখনও হয়নি। লক্ষ লক্ষ চাষী প্রথম সচেতনভাবে শহরের জীবনের সঙ্গে, মজুর,

কৃষি-বিশেষজ্ঞ, শিল্পী ও সাংবাদিকের সঙ্গে মেলামেশা করল ; একটা বৃহৎ ধর্মযুদ্ধের মধ্যে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে, একটামাত্র বসন্ত ঋতুর মধ্যে সমাজতন্ত্রের কৃষিগত ভিত্তি স্থাপন করে ফেলল।

* * *

সেবারের সেই বীজ বোনার এলাহি কাণ্ডের ভিতর, তিনটি মূর্তি আমার চোখে ভাসছে। উস্তিনা বলে একজন কৃষি-মজুরনী ; মেলনিকভ বলে খবরের কাগজের একজন সংবাদ-দাতা ; আর কোভালেভ বলে একজন এলাকা-পার্টির সম্পাদক।

''সাম্যবাদের দুর্গ' বলে একটা বৃহৎ যৌথ খামারে মুরগী পালনের ভার ছিল উস্তিনার উপর। আট বছর বয়স থেকে সে দাসীবৃত্তি করে এসেছিল। বিপ্লবের পর, সে একটা ছোট ; কোনো-মতে-টিকে-থাকা খামার-কমিউনে যোগ দেয়। সে এত গরীব ছিল যে, তার নবজাত শিশুদের সে কাগজে মুড়ে রাখতে বাধ্য হত। আস্তে আস্তে ঐ কমিউনের লোকে খামারটাকে বেশ মজবুত করে গড়ে তোলে। খামারে ট্র্যাক্টর আসে, ডিমে তা দেওয়ার কল আসে ; ভাল কাজ দেখানোর জন্যে উস্তিনা মস্কো থেকে এই তা দেওয়ার কলটা পুরস্কার পেয়েছিল। দু'বছর মোটামুটি ভাল থাকার পর ঐ খামারের লোকদের আবার অন্নকষ্ট দেখা দেয় ; কারণ, বহু অন্নহীন নিঃস্ব কৃষি-মজুর ঐ সময় দলে দলে তাদের খামারে এসে যোগ দেয় ; পরের ফসলটা না ওঠা পর্যন্ত তাদের খাওয়ানোর দায় পড়ে খামারের উপর। অনেকে যুক্তি দিয়েছিল, যারা নিজেদের খাওয়ার মত শস্য আনতে পারবে শুধু তাদেরই খামারে যোগ দেবার অধিকার দেওয়া উচিত। উস্তিনা তখন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিল, "এটা আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ। প্রথম যুদ্ধে হয়েছে খুনোখুনি। এটাতে খুনোখুনি নেই, তবু এটা যুদ্ধই। সুতরাং আমাদের সঙ্গে আছে যারা, আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা।"

স্তালিনগ্রাদ হতে যাত্রা-শুরু-করা রেলগাড়ীর তিনটে কামরা থেকে প্রকাশিত হত 'ভ্রাম্যমান লড়াই' বলে একটা খবরের কাগজ। সারা

বসন্ত কালটা, এই কাগজের লোকগুলো জায়গার পর জায়গায় গিয়ে, সেখানে খোঁজ খবর নিয়ে, যত রকম অনাচার অবিচার প্রকাশ করে দিয়েছে ; বিশেষ আদালতগুলোর জন্যে শহর থেকে বিচারক আনিয়েছে পর্যন্ত। মেলনিকভ ছিলেন এই কাগজের একজন উৎসাহী সংবাদ-সংগ্রাহক। দিনে দশটা ভয়াবহ মামলা হাজির হলেও তিনি তাতে দমবার মত কিছু দেখতেন না ; সেগুলোকে তিনি আরও উৎসাহের সঙ্গে লড়াই চালানোর প্রেরণা বলে মনে করতেন। তাঁর কাছে শুনলাম, জোটেভ বলে একজন গুণ্ডা তার জ্ঞাতিগোষ্ঠীদের গ্রামে মোড়ল হয়ে বসে। রেড্ আর্মির একজন পুরানো যোদ্ধাকে কুলাক বলে নির্বাসনে পাঠানোর চেষ্টা করে সে ; সৈনিকের অপরাধ—সে জোটেভের গুণ্ডামির কথা ফাঁস করে দিয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে শুনলাম, এক অতি উৎসাহী সংগঠক সাতদিনে সাতটা ক্যালমাক্ বস্তি ঘুরে, তাদের সব কিছু 'যৌথ সম্পত্তি' করে ফেলে ;—তাদের সমস্ত সম্পত্তির একটা ফিরিস্তি তৈরি করে তাদের বলে দেয় যে, সব মিলিয়ে একটা খামার হয়ে গেল। নিরক্ষর ক্যালমাকদের চোখে সরকারী কাগজমাত্রেই জাদু আছে, তার মধ্যে বিশেষ কর্তৃত্ব নিহিত আছে, তাই পাছে 'সরকারী ভেড়া চুরি করার' দায়ে পড়ে, এই ভয়ে তারা প্রতিবার গ্রীষ্মকালে যে অঞ্চলে ভেড়া চরাতে যে এবার তারা সেখানে ভেড়া নিয়ে গেল না ; ভেড়াগুলোকে কষ্ট দিল। 'সাফল্যের দরুণ মাথা ঘুরে যাওয়ার' সম্পর্কে স্তালিনের বিবৃতি তাদের কাছে পৌছলে, ঐ সাতবস্তির লোকে একরাত্রে মরুভূমির দিকে সরে পড়ল।

মেলনিকভ তাঁর নিত্যিদিনের কাজ হিসেবে যে সব অনাচারের কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করতেন, মার্কিন দেশের সমস্ত সোবিয়েৎ-বিরোধী কাগজগুলোও 'বলশেভিক অত্যাচারে'র নামে তার চেয়ে নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে পারত না। সে বলে, এই 'ভ্রাম্যমান লড়াই'-এর চেষ্টায় দু'শোর বেশী সরকারী কর্মচারী গ্রেফ্তার হয়—তাদের অপরাধ ছিল, 'ঘুস থেকে রীতিমত ডাকাতি পর্যন্ত'। কিন্তু আমি যখন মেলনিকভকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব গোলমেলের দরুণ ফসল

অনেক কম হবার ভয় আছে কি না, তিনি আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে থাকলেন, যেন আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।

"কম? অনেক বেশী হবে। ট্র্যাক্টর এসে দ্বিগুণ জমিতে বীজ বোনা সম্ভব করেছে, দেখেননি? ট্র্যাক্টর ছাড়াও, কুলাকদের ঘোড়া ব্যবহার করে চাষীরা কর্ষিত জমি সত্তর শতাংশ বাড়িয়ে দিয়েছে। কুলাকরা খাজনার ভয়ে সোবিয়েৎ সরকারের প্রতি ঘৃণার বশে, ফসল নষ্ট করত; এই নতুন মালিকরা পাগলের মত কাজে এগোচ্ছে।" ভাল-ভাবে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা থেকে সেবারের 'প্রথম বলশেভিক বসন্তে', দরিদ্রতর চাষীদের মধ্যে একটা প্রচণ্ড শক্তির উৎস খুলে গিয়েছিল। এ শক্তিকে চালনা করেছিল কমিউনিস্টরা; অভিজ্ঞতার অভাব এবং অতিউৎসাহ সত্ত্বেও, তারা ছিল একটা সুশৃঙ্খল অক্লান্ত কর্মীর দল। সব কিছু যাতে ঠিকমত চলে, তার জন্যে তাদের ব্যাকুলতা দেখে, আমি বুঝতে পারতাম মাঠের কর্মরত লোকদের মধ্যে কারা কমিউনিস্ট। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে কোভালেভের কথা। স্তালিনগ্রাদের দক্ষিণে একটা তাতার অঞ্চলের পার্টি-সম্পাদক ছিলেন তিনি; দশজন বেকুব চাষী যৌথ খামার ছেড়ে যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা মনে পড়ছে।

চাষীগুলো তারা আর যৌথ খামারে থাকবে না কেন, তার কারণ বলছিল। একজন বলল, "আমার গরম জামা নেই, আর ওরা আমাকে বৃষ্টিতে ভিজে গরু-ভেড়া চরাতে বলে।" আর একজন বলল, "ওরা আমার উটটাকে না খেতে দিয়ে খাটিয়ে খাটিয়ে আমার চোখের সামনে মেরে ফেলেছে।" আর একজন বলল, "আমি যৌথ খামারে যোগ দেওয়ার পর থেকে আমার বৌ আমার সঙ্গে থাকে না।"

এ কারণগুলো আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বোধ হলেও কোভালেভের কাছে তা হল না। তিনি বললেন, "এ অবস্থা তোমাদের বরাবর ছিল। যৌথ খামারে এলেই মণ্ডামিঠাই দেওয়া হবে, একথা কেউ বলেনি। ব্যবস্থাপনার দোষ থাকলে, শোধরানো যাবে। রাতে যারা

কাজ করে তাদের গরম কাপড় চাই-ই। গত বারের অনাবৃষ্টির দরুণ গরু ঘোড়ার ঘাস দুষ্প্রাপ্য হয়েছে; ব্যক্তিগত খামার হলেই অবস্থায় কোনো উন্নতি হত না। যৌথ খামার ছাড়লে কারও অবস্থা একটুও ভাল হবে না; কারণ, সমস্ত সোবিয়েৎ-শক্তি সাহায্য করছে যৌথ-খামারকে। চাষী স্বতন্ত্র নয়, তার খেতখামারের কাজ নির্ভর করে জাতির উপর; জাতিও নির্ভর করে চাষীর খামারের উপর। ধনিক-তন্ত্রী রাষ্ট্ররা আমাদের দেশকে ঘিরে রয়েছে। আমাদের হয় দ্রুতবেগে বড় বড় যন্ত্রশিল্প এবং আধুনিক কৃষিব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, নয়তো মরতে হবে। স্তালিনগ্রাদের প্রকাণ্ড কারখানা আগামী গ্রীষ্মকালে তোমাদের খামারগুলোকে ট্র্যাক্টর দেবে। প্রকাণ্ড বিদ্যুৎশক্তি-উৎপাদন কেন্দ্র—স্তালগ্রেস্ এই বছরের শরৎকাল থেকেই তোমাদের বাড়িতে আলো দেবে। এসব কাজ যতদিন শেষ না হয়, তাদের খাবার চাই; শস্যের পরিমাণ আমাদের বাড়াতেই হবে। প্রত্যেক চাষী যদি ঘরে বসে ভাবতে থাকে, মাঠে লাঙ্গল দেবে কি না, তা হলে কি এসব করা যায়? এ বছর দেশের প্রত্যেক লোকের কর্তব্য হল যৌথ খামারকে শক্তিশালী করা।”

ঘণ্টা দুয়েক এমনি কথাবার্তা চলার পর, চাষীগুলোর বৌরা বাইরে থেকে তাদের স্বামীদের ডাকল। কোভালেভ তাদের ভিতরে আসতে বললে তারা এল না। তারা মনস্থির করে ফেলেছিল; তাদের স্বামীরা তাদের অনুগামী হল। এতটুকু দুঃখপ্রকাশ না করে কোভালেভ ঘরে যে পাঁচজন কমিউনিস্ট তখনও ছিলেন তাঁদের দিকে ফিরলেন। এই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন স্থানীয় শিক্ষক, আর একজন গ্রন্থাগারিক। কোভালেভ তখনই তাঁদের উপর ভার দিলেন যে, তাঁরা মাঠে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে গিয়ে মই-দেওয়ার কাজ করবেন, তাঁদের প্রধান কাজ হবে লোকের মনোবল তৈরি করা। তিনি স্তালিনগ্রাদে ফোন করলেন; অবিলম্বে যেন গরু-ঘোড়ার জন্যে ঘাস পাঠানো হয়; চাষী-বউদের মধ্যে কাজ করার জন্যে একজন তাতার মেয়ে-সংগঠকও চেয়ে পাঠালেন। গ্রন্থাগারিককে তিনি মাঠের

লোকদের জন্যে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পাঠাতে বললেন। এই হচ্ছে সুদক্ষ নেতৃত্ব! বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হওয়ার যোগ্য। এটি একটা গরীব তাতার গ্রাম, এখানকার মাটি অনুর্বর। সে বছর বসন্তকালে এমনি প্রত্যেক গ্রামেই পার্টির সংগঠকরা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল, সোবিয়েৎ গমের জন্যে লড়াই করতে।

মেলনিকভ ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। শ্রেণীযুদ্ধের বিশৃঙ্খলার মধ্যে বীজ বোনা হলেও,—লোকে মাত্র একবছরের মধ্যে মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যান্ত্রিক-যুগের দিকে ধেয়ে চললেও, তাদের নবজাগ্রত ইচ্ছার জোরে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করল। ফসলের হিসেব প্রকাশিত হলে সোবিয়েৎ দেশ (এবং অন্য যেসব দেশ বাজ পাখির মত তার দিকে চেয়েছিল তারাও) জানল যে, রুশিয়ায় সেবার সর্বাধিক পরিমাণ জমিতে বীজ বোনা হয়েছিল এবং যত ফসল সেবার পাওয়া গিয়েছে এত ফসল এর আগে কখনো রুশিয়ায় জন্মায়নি।

এইবারের ফসল বিশ্বের কৃষি-ইতিহাসের ধারা বদলে দিল।

* * *

যৌথ খামারের ব্যবস্থা পাকা করার জন্যে একটা ফসলই যথেষ্ট নয়। ১৯৩০ সালে চাষীরা তাদের প্রাণের তাগিদে যৌথ খামার খাড়া করে—তখন তাদের সংগঠন ভাল ছিল না, তাদের সাজসরঞ্জাম ভাল ছিল না। পরের দু'বছর, তাদের সংগঠনগত সমস্যায় পড়তে হল। ভাল ম্যানেজার পাওয়া যাবে কোথায়? ভাল হিসার-রক্ষক? যন্ত্রপাতি চালাবার লোক? ১৯৩১ সালে, পাঁচটা প্রধান শস্য-এলাকায় অনাবৃষ্টির দরুণ ফসল ভাল হল না। ১৯৩২ সালে ফসল কিছু ভাল হল বটে, কিন্তু সব ফসল মাঠ থেকে তোলা গেল না। যৌথ খামারের সভাপতিরা, হার মানার ভয়ে, বলল, তারা সব তুলে ফেলছে। মস্কো যখন আসল ব্যাপারটা টের পেল, অনেক ফসল তখন বরফের নীচে চাপা-পড়েছে।

এর কারণ অনেক। ১ কোটি ৪০ লক্ষ ছোট খামারকে মিলিয়ে ২ লক্ষ যৌথ খামারে পরিণত হল ; অথচ অভিজ্ঞ ম্যানেজারের অভাব,

উপযুক্ত পরিমাণ যন্ত্রপাতির অভাব। তা ছাড়া ১ কোটি ১০ লক্ষ লোক খামার ছেড়ে নতুন কারখানা-শিল্পে গিয়ে যোগ দিয়েছিল। চাষীদের অনুন্নত অবস্থা, কুলাকদের ধ্বংস-প্রচেষ্টা, সরকারী কর্মচারীদের নির্বুদ্ধিতা—এসবেরই ফল ফলল। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী নাগাদ, গমের লড়াই-এ জয়ী হওয়ার দু'বছর পর,—বেশ বোঝা গেল যে, গুরুতর অন্নসংকট আসন্ন।

পার্টির কেন্দ্রীয় সমিতির পূর্ণ অধিবেশনে স্তালিন পার্টির পক্ষ থেকে দোষ স্বীকার করলেন; পার্টির সজাগ থাকা উচিত ছিল। সংকট যখন বোঝা গেল, প্রতিকারের দ্রুত এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হল। অব্যবহিত অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে খামারগুলো রাষ্ট্রের কাছে যে শস্য ধারত সেসব শস্যই আদায়ের জন্য তাদের উপর নিষ্ঠুর চাপ দেওয়া হল। ট্যাক্স বাবদ, যন্ত্রপাতি বাবদ যত শস্য পাওনা ছিল, সব আদায় করা হল; খামারগুলোর নিজেদের ঘরে শস্য থাকল কি না, দেখা হল না। "মজুররা ভাল মনে তোমাদের ট্র্যাক্টর জুগিয়েছে, এখন কি তারা তোমাদের অকর্মণ্যতার ফলে উপোস দেবে?"—এই প্রশ্ন করা হল খামারগুলেকে। এই শস্য রাষ্ট্রের হাতে এলে, সারা দেশে রেশন-ব্যবস্থা চালু করা হল। যে সব খামার ফেল্ মেরেছিল তারাও যারা কাজ করবে তাদের জন্যে, বীজ বোনার সময় রেশনের শস্য পেল। দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অন্নের স্বল্পতা ও ক্ষুধা দেখা দিল,—তার ফলে অন্য সময়ের তুলনায় মৃত্যুসংখ্যাও সাধারণভাবে বাড়ল। কিন্তু সে অন্নকষ্ট হল সর্বসাধারণের—দুর্ভিক্ষ বললে যে আতঙ্ক ও বিশৃঙ্খলা বোঝায় সেটা কিন্তু কোথাও দেখা গেল না। দেশব্যাপী কঠোর রেশনিং ব্যবস্থার মধ্যে ১৯৩৩ সালের ফসল তোলা হল।

ইতিমধ্যে, ভবিষ্যতে এরকম সংকট যাতে না ঘটে তার জন্য তিনটি ব্যবস্থা করা হল—শস্য-সংগ্রহ সম্পর্কে একটা নতুন আইন; সেরা সেরা খামার কর্মীদের একটা কংগ্রেস; আর ট্র্যাক্টর-ঘাঁটিগুলোতে একটা করে 'রাজনৈতিক বিভাগ সংগঠন। শস্য-সংগ্রহের নতুন

আইনে, দুর্বল খামারগুলোর উপর কোনো চাপ না দেওয়ার নীতি ত্যাগ করে, যেসব খামার ভাল কাজ দেখাবে তাদের পুরস্কৃত করার এবং অকর্মণ্যতার শাস্তি দেওয়ার নীতি গৃহীত হল। সেরা খামার-কর্মীদের কংগ্রেসে সব চেয়ে ভাল খামারগুলো থেকে সেরা কর্মীদের মস্কোয় নিয়ে এসে সারা দেশময় তাদের কাজের পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হল ; তারপর, তাদের সম্মানিত করে নিজের নিজের এলাকায় সমস্ত খামারকে সাফল্যের দিকে চালানোর দায়িত্ব দিয়ে ঘরে পাঠানো হল। আর, যেহেতু দেশের দুই-তৃতীয়াংশ খামারই ট্র্যাক্টর কেন্দ্র-গুলোর সেবা পাচ্ছিল, বিশ হাজার নতুন কর্মদক্ষ লোক নিয়ে এই কেন্দ্র-গুলোকে বাড়ানো হল,—সে ধরনের লোক এর আগে কখনো রুশিয়ার গ্রামাঞ্চলে কাজ করেনি। খামারের কাজে দক্ষতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ট্র্যাক্টর-কেন্দ্রের 'রাজনৈতিক বিভাগে' কাজ করতে এগিয়ে এলেন কারখানা-পরিচালকরা, সেনাবাহিনীর নায়করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা।

বিদেশের সংবাদপত্রগুলোতে এটাকে বলা হল 'চাষীদের বিরুদ্ধে স্তালিনের লড়াই' ; সোবিয়েৎ সংবাদপত্রগুলো বলল ঃ 'আমাদের ফসলের জন্য লড়াই'। খামারে, শহরে—দু' জায়গাতেই সমগ্র জাতি এই লড়াই চালাল। আমার স্বামী তখন 'কৃষক-বার্তা' কাগজে কাজ করতেন। আরো দশজন রিপোর্টার নিয়ে গড়া একটা 'লড়ুয়ে দলের' ভার নিয়ে তিনি ঐ সময় একটা দু'-আসনযুক্ত বিমানে চল্লিশ দিন ধরে উত্তর ককেসাসের খামার থেকে খামারে ঘুরলেন। বিমান থেকে নেমে, তিনি ফসল কাটার এলাকার মধ্যে যত্র তত্র এক বর্গমীটার পরিমাণ জমিতে ক'টা শস্য নষ্ট হয়েছে গুণতেন ; তা দেখে হিসেব করতেন, সমস্ত এলাকায় কত শস্য নষ্ট হল। কি পদ্ধতিতে সব চেয়ে ভালভাবে ঐ শস্য বাঁচানো যেত, তাও লক্ষ্য করতেন। দশজন রিপোর্টার মিলে এসব তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদপত্রগুলোতে তার-যোগে জানানো হত, যাতে আরও উত্তরে যারা ফসল কাটছিল তারা শিখতে পারে। এ চল্লিশ দিনে আমার স্বামীর শরীরের ওজন ত্রিশ পাউণ্ড

(প্রায় পনর সের) কমে গিয়েছিল। তিনি শ্রান্তিতে অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরতেন গা-ময় উকুন নিয়ে। তিনি হিসেব করে দেখেছিলেন যে, তাঁর দল প্রায় দশ লক্ষ বুশেল্ ফসল বাঁচিয়ে দিয়েছিল। এ চিত্র থেকে সে বছরের সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামের একটু আন্দাজ পাওয়া যাবে।

সে বছর গ্রীষ্মকালে রুটির জন্যে লড়াই-এ জয়লাভ হল—একটা মহাবিপর্যয় নিবারিত হল। ১৯৩০ সালে রুশিয়ায় সবচেয়ে ভাল ফসল ফলেছিল; ১৯৩৩ সালের ফসল তার চেয়েও বেশী হল। ১৯৩০ সালের ফসল পাওয়া গিয়েছিল অর্ধসংগঠিত উৎসাহের জোরে; এবারকার ফসল পাওয়া গেল ক্রমবর্ধমান কর্মদক্ষতা ও স্থায়ী সংগঠনের জোরে।

পরের বছর, সমস্ত ইউরোপের দক্ষিণার্ধে বৃষ্টি হয়নি। যৌথ খামারের লোকরা এই অনাবৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের অন্ন-জয় পাকা করে দিল। আগেকার কালে, অনাবৃষ্টি-আক্রান্ত চাষীরা তাদের গরু ভেড়া মোরগ প্রভৃতি খাওয়া শেষ করে শহরে গিয়ে জমত, কাজের খোঁজে। ১৯৩৪ সালে যৌথ খামারের লোকরা আঞ্চলিক কংগ্রেস ডেকে 'অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করল—প্রতি অঞ্চলের জন্যে উপযুক্ত পরিকল্পনা করল। কোনো কোনো অঞ্চলে দমকলবাহিনীর 'ফায়ার ব্রিগেড'-এর সাহায্যে মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা হল; কোথাও বা বনের নগ্ন অংশে গাছ লাগানো হল। উত্তর ককেসাসের ঢালু ভূমিতে লোকে হাজার হাজার মাইল সেচ-খাল কাটল; তারা বলল, "আমাদের পাহাড় আছে; বৃষ্টি না হলেও আমাদের চলে।" যেখানেই শীতকালীন গম নষ্ট হল, বিজ্ঞানীরা স্থির করে দিলেন, অন্য কোন্ ফসল লাগানো যায়। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তটা প্রচার করে দেওয়া হল; সরকার অবিলম্বে বীজ পাঠিয়ে দিলেন। সমগ্র জাতির এই সহযোগিতার ফলে ১৯৩৪ সালের অনাবৃষ্টিকে পরাস্ত করা হল; সে বছর সোবিয়েৎ দেশে যে মোট শস্য ফলল, তা ১৯৩৩ সালের 'সব বছরের সেরা' ফসলের সমান। সব চেয়ে দুর্গত

অঞ্চলেও অধিকাংশ খামারে গরু বা পশুর জন্যে খাদ্যের অভাব হল না, অথচ সংঠগন আরও দৃঢ় হয়ে গেল।

১৯৩৫ সালে নতুন ধরনের কৃষি একটা স্থায়ী রূপ পেয়ে গেল; দু'বছরের মধ্যে প্রায় কেউই যৌথ খামার ত্যাগ করার কথা মুখে আনল না। খামারের জন্যে একটা 'আদর্শ সংবিধান', 'খামার পরিকল্পনা'র একটা আদর্শ ধাঁচ নির্ণীত হল। কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল লাগানো হবে, কোন্ জমিতে কোন্ ফসল লাগানো হবে, এসব নির্ধারিত হয়ে গেল। তিন বছর ধরে শস্য-ফসল আগেকার সেরা ফসলের চেয়েও এক কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ২ কোটি টন বেশী ফলল; চিনি-বীটের জমি দ্বিগুণিত হল; আগেকার যে কোনো বছরের তুলনায়, কার্পাস চাষের জমি আড়াইগুণ বেড়ে গেল। যৌথীকরণের প্রথম বছরে, চাষীরা বহু গরু শূয়োর মোরগ ইত্যাদি মেরে খেয়ে ফেলেছিল বলে এসবের বিশেষ ঘাটতি পড়েছিল; সেটাও এবার পূরণ হল। (রুশিয়ার ভুল থেকে শিখে, চীনের সমবায়-খামারগুলো চাষীদের কাছ থেকে গরু, মোরগ প্রভৃতি জীবগুলো কিস্তিতে কিস্তিতে কিনে নেয়।)

এসব অর্থনৈতিক লাভের চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চাষীদের পরিবর্তন। খামারের লোকে শুধু লিখতে পড়তেই শিখল না, তারা বিজ্ঞান ও শিল্পকলার দিকেও ঝুঁকল। দু'বছরের মধ্যে এক উক্রাইন প্রদেশেই ৭ হাজার 'লেবরেটরী কুটিরে' চাষীরা নিজ নিজ শস্য সম্পর্কে গবেষণা করতে লাগল, সরকারী পরীক্ষা-কেন্দ্রের সঙ্গে নিজেদের পরীক্ষার ফল মিলিয়ে দেখতে লাগল। প্রায় প্রত্যেক খামারের নিজস্ব নাট্য-সম্প্রদায় হল, গ্লাইডিং (কৃত্রিম পাখার সাহায্যে হাওয়ায় ভেসে চলা) আর বিমান থেকে ছাতা খুলে ঝাঁপ দেওয়া শেখার ক্লাব হল; বিমান-চালনা শেখার ব্যবস্থাও হল। চাষীরা নিজেদের গেঁথে নিল সমগ্র জাতির জীবনের সঙ্গে; জাতি আপন করে নিল চাষীদের। একজন সোবিয়েৎ কৃষিবিজ্ঞানী আমায় বলেছিলেন: "আমরা—বিজ্ঞানীরা—মনে করতাম, আমাদের কেউ

পৌঁছে না; আমাদের কাজের কোনো দাম নাই। এখন যৌথ খামারগুলো আমাদের বিজ্ঞানের উপর দাবি করছে বলে আমাদের চোখের সামনে খুলে গিয়েছে কয়েক হাজার বছরের কাজ।”

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জার্মানদের ট্যাঙ্ক আটকা পড়লে বা জার্মান বিমান নামতে বাধ্য হলে, স্থানীয় চাষী ‘গেরিলারা’ সে ট্যাঙ্কটা বা সে বিমানটাকে চালিয়ে রণাঙ্গনের পিছনে পৌঁছে দিত। ১৯৪৩ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার ‘লাইফ’ পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে ছিলঃ “খামার যৌথকরণের জন্য যে মূল্যই দেওয়া হয়ে থাক না কেন, এই বৃহৎ খামারগুলো যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব করেছিল। তার ফলে, উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়, কারখানা-শিল্পের জন্যে চাষীদের মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাদের না পেলে রুশিয়া তার কারখানা-শিল্প গড়ে তুলতে পারত না, গোলাগুলি তৈরি করে জার্মানবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পারত না”।

* * *

যুদ্ধের পর, ১৯৪৭ সালে আমি রুশিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিমানে ভ্রমণ করেছিলাম। সে সময় ভল্‌গা নদীর ধারে কাজানে নামি। বিমান ক্ষেত্রের একদিকে কয়েক ডজন ছোট ছোট বিমান দেখে আমি ভেবেছিলাম, সেটা বোধ হয় বিমান-সৈনিকদের শেখানোর জায়গা; বুঝতে পারছিলাম না, ওরা আমাদের এখানে নামতে দিল কেন।

একজন রুশ বললেন, “না, না। এগুলো যৌথ খামারের চাষীদের বিমান। তারা নানান কাজে শহরে এসেছে।”

নতুন মানুষ

যে মানুষগুলো এই নতুন কারখানা-শিল্প ও কৃষি-শিল্প গড়ে তুলল, তাদের বিশেষ চরিত্র ফুটে উঠেছিল তাদের সীমাহীন উদ্যোগিতায়। আমেরিকার লোকে যখনই বলে যে, সোবিয়েৎ দেশের লোকগুলোকে 'সৈনিকদের মত ছাঁচে ঢেলে গড়া হয়েছে', তখনই আমার হাসি পায়। প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক যুগের সামঞ্জস্য স্থাপনের নিজস্ব একটা ছাঁচ আছে, পরিবর্তনের নিজস্ব একটা প্রণালী আছে। সোবিয়েৎ দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলোতে যত লোকের কর্ম-চঞ্চল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ দেখেছি, উত্তর কালে চীনে ছাড়া, আর কোনো দেশে কখনো তত দেখিনি।

বিল্ স্যাটফ্ তার একটা নমুনা। তাঁকে দেখলাম, নভোসিবির্স্কের এক হোটেলে রোগ-শয্যায় প'ড়ে আছেন। তিনি রেলপথ তৈরি করছিলেন; রেলের জন্যে, সিমেণ্টের জন্যে, শ্রমিকের জন্যে লড়াই করতে করতে অতি-পরিশ্রমের ফলে তাঁর চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "স্ত্রীকে এনে, ঘরের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থাকেন না কেন? নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া, নিয়মিত বিশ্রাম পেতে পারেন তা হলে।" বিল্ আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

তিনি বললেন, "জীবনের সব চেয়ে বড় জিনিস হল কাজ। ঠিক কাজ নয়, সৃষ্টি! এই যে সময়টাতে আমরা বেঁচে আছি, এ সময়ে অন্তহীন সীমাহীন সম্ভাবনা রয়েছে সৃষ্টি করার। বৌকে খুশী করার জন্যে বা সময় মত খেতে আসার জন্যে এ-সময়ের একটা ঘণ্টাও নষ্ট হতে দেওয়া যায় কি?"

সৃষ্টির উৎসাহ শুধু নেতাদেরই পেয়ে বসেনি। জীবনের নব নব পথ খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিকের মধ্যেও এই উৎসাহ জন্ম নিয়েছিল। আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি, নিরক্ষর চাষীরা কিভাবে বিজ্ঞানী হয়ে উঠেছে, অ-পেশাদার অভিনেতা

হয়েছে, বৈমানিক হয়েছে, ছাতা খুলে বিমান থেকে লাফানোর কৌশল শিখেছে। খুব অনুন্নত জাতিগুলোর মধ্যে এর চেয়েও বড় পরিবর্তন এসেছিল। সোবিয়েৎ দেশে বল্‌গাহরিণ-পালক এস্কিমো আর মেষ-পালক যাযাবর কিরঘিজ থেকে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী আর্মেনীয় ও জর্জীয় পর্যন্ত প্রায় শ' দেড়েক 'জাতি' বিকাশের নানা স্তরে পড়েছিল।

সোবিয়েতের নীতি হলঃ অর্থনীতিকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখী রেখে সব জাতিরই সংস্কৃতিকে বিকশিত করে তোলা। কিন্তু আটান্নটা ছোট-খাটো জাতির অক্ষরমালা পর্যন্ত ছিল না, বই তো দূরের কথা। সুতরাং বিজ্ঞানীরা তাদের জন্যে লেখ্য ভাষা গড়ে তুললেন; মস্কোতে শ' খানেক ভাষায় বই ছাপা হতে লাগল। তার ফলে, প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা শেষ হলে দেখা গেল যে, সোবিয়েৎ দেশে যত বই প্রকাশিত হয়েছে, জার্মানি, ফ্রান্স আর ইংলণ্ড—এই তিন দেশ মিলেও তত বই প্রকাশ করেনি। রূপান্তরকারী শক্তিগুলোর মধ্যে একটা ছিল বই। এই বই ছাড়া, ছিল নতুন বিধান, বিজ্ঞান, শিল্পকলা।

সব চেয়ে বড় রূপান্তরকারী শক্তি ছিল—জীবনের জন্যে লোকের নিজেদের লড়াই। প্যারিসের একটা সম্মেলনে, লেখক প্যানফেরভ কথাটা এইভাবে বলেছিলেনঃ "স্রোতস্বিনী নীপার নদীর বাঁধ তৈরি করে শ্রমিকশ্রেণী তার অবাধ্য জলকে বাধ্য করেছে মানুষের সেবা করতে। কুয়াসাচ্ছন্ন উরাল পর্বতমালাকে তারা শ্রম-শিল্পের কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে; বুনো, সুদূর কুজবাস্‌কে সে বশ মানিয়েছে। দেশকে নতুন করে গড়তে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণী নিজেকেও নতুন ভাবে গড়ে তুলেছে।"

তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে, সবারই মুখে শোনা যাচ্ছিল 'নতুন মানুষে'র আলোচনা। একজন রুশ লেখক 'মস্কো নিউজ' কাগজের জন্যে 'নতুন মানুষে'র সম্পর্কে কয়েকটা এক-পাতা-জোড়া নকশা দিলেন। তিনি বললেন, তাঁর কাছে ওরকম হাজারটা নকশা আছে। আমাদের অবাক করে দিয়ে তিনি জানালেন, "এ তো কিছুই নয়;

সমাজতন্ত্রের আওতায় কত ধরনেরই যে নতুন লোক ফুটে উঠছে!"
স্বার্দ্‌লভস্কের একটা খবরের কাগজে প্রতিদিন 'নতুন মানুষ' নামে একটা স্তম্ভ ছাপা হত; তাতে থাকত, লোকের অভ্যাসে এবং ধ্যানধারণায় যেসব পরিবর্তন দেখা যাচ্ছিল সে সম্বন্ধে নানা কাহিনী। পরে এ সব পরিবর্তনের কিছু কিছু যে লেখকের ইচ্ছাকল্পিত, তা বোঝা গেল; সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে মানুষ 'রামরাজ্য'ও পায়নি, পাপকেও চির নির্বাসনে দেয়নি। তবু, লোকের মধ্যে বহু বড় বড় এবং অর্থপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। আমি দু'একটির কথা মাত্র আলোচনা করব: মধ্য এশিয়ার মেয়েদের স্বাধীন হওয়ার কথা; ছেলেরা কিভাবে তাদের ভবিষ্যতের কাজ বেছে নিচ্ছিল, তার কথা; আর স্তাখানভপন্থীদের উত্থানের কথা। এগুলো থেকে সেকালের জীবনের বিশেষত্বটা বোঝা যাবে।

* * *

সোবিয়েৎ দেশের সর্বত্র যেসব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটল, সেগুলোর মধ্যে মেয়েদের সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন একটি। বিপ্লবের ফলে মেয়েরা আইনগত এবং রাজনৈতিক সমানাধিকার লাভ করেছিল; কারখানা-শিল্পের প্রতিষ্ঠার ফলে, পুরুষদের সঙ্গে সমান মজুরী পাওয়ায় মেয়েদের এই সমানাধিকারের অর্থনৈতিক ভিত্তি রচিত হল। কিন্তু প্রতিটি গ্রামেই যুগ-যুগান্তরের অভ্যাসের বিরুদ্ধে মেয়েদের তখনো লড়াই করতে হচ্ছিল। একটা উদাহরণ দিই। যৌথ খামারে গিয়ে স্বাধীন জীবিকার্জনের সুযোগ পাওয়ার পর, সাইবেরিয়ার এক গ্রামের বিবাহিতা মেয়েরা স্বামীদের বৌ-ঠেঙানোর প্রতিবাদে হরতাল করে সপ্তাহের মধ্যে একটা প্রাচীন প্রথা ভেঙে দেয়।

এক গ্রাম-সোবিয়েতের সভানেত্রী আমায় বললেন, "আমাদের গ্রাম-সোবিয়েতে যখন একজন মেয়ে প্রথম নির্বাচিত হল, পুরুষরা আমাদের ঠাট্টা করত। কিন্তু পরের নির্বাচনে ছ'জন মেয়ে নির্বাচিত হল; এখন আমরাই ওদের দেখে হাসি।" ১৯২৮ সালে, সাইবেরিয়ার এমনি বিশজন গ্রাম-সভানেত্রী সঙ্গে রেলগাড়িতে আমার দেখা হয়;

তারা মস্কোতে মেয়েদের কংগ্রেসে যাচ্ছিল। তাদের অধিকাংশই এর আগে রেলগাড়িতে চড়েনি,—একজন মাত্র একবার সাইবেরিয়ার বাইরের গিয়েছিল। তারা মস্কোতে আমন্ত্রিত হয়েছিল মেয়েদের দাবি সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য; তারা তাদের অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হয়ে চলেছে।

মেয়েদের স্বাধীনতার জন্যে সব চেয়ে শক্ত লড়াই করতে হয়েছিল মধ্য এশিয়ায়। এখানে মেয়েরা ছিল আসবাবের সামিল; অল্প বয়সেই তাদের বিয়ের বাজারে বিক্রী করা হত; বিয়ের পর, তারা কুৎসিৎ 'পারাঞ্জা' না পরে রাস্তায় বেরোতে পারত না। 'পারাঞ্জা' হচ্ছে একটা লম্বা কালো রঙের ঘোমটা, ঘোড়ার চুল দিয়ে তৈরী; এই ঘোমটায় সারা মুখ ঢাকা পড়ত, নিশ্বাস-প্রশ্বাস এবং দৃষ্টি ব্যাহত হত। ঘোমটা খুললে সনাতন প্রথামত স্বামী স্ত্রীকে খুন করতে পারত। ধর্মের নামে মোল্লারা এ প্রথা সমর্থন করতেন। রুশ মেয়েরা এদেশে স্বাধীনতার প্রথম বাণী আনল; তারা 'শিশু-মঙ্গল' চিকিৎসালয় খুলল; স্থানীয় মেয়েরা সেখানে গিয়ে পরস্পরের সামনে ঘোমটা খুলে ফেলত। এই শিশু-মঙ্গলগুলোতে মেয়েরা মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে, পর্দাপ্রথার কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করত। কমিউনিস্ট পার্টি তার সদস্যদের উপর চাপ দিল, তারা যেন তাদের স্ত্রীদের ঘোমটা ত্যাগ করতে অনুমতি দেয়।

১৯২৮ সালে আমি যখন প্রথম তাস্‌খন্দ যাই, সেখানে কমিউনিস্ট মেয়েদের একটা সম্মেলন ঘোষণা করছিল: "অনুন্নত গ্রামগুলোয় আমাদের সদস্যদের বেইজ্জৎ করা হচ্ছে; তাদের উপর নানা উৎপীড়ন করা হচ্ছে; তাদের খুন করা হচ্ছে। কিন্তু এ বছর এই কুৎসিৎ ঘোমটাপ্রথা খতম করতেই হবে; এ বছর হবে ঐতিহাসিক বছর।" এই সংকল্পের মূলে ছিল কয়েকটা বীভৎস ঘটনা। তাস্‌খন্দের ইস্কুলের একটি মেয়ে ছুটিতে তার নিজের গ্রামে গিয়ে মেয়েদের অধিকার সম্বন্ধে আন্দোলন করেছিল। খণ্ড খণ্ড করে কাটা তার দেহটা একদিন গাড়িতে করে তার ইস্কুলে এসে পৌঁছল, তার উপর লেখা: "এই

হচ্ছে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রতিফল।” আর একটি মেয়ে জমিদারের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে একজন কমিউনিস্ট চাষীকে বিয়ে করে। তার আট মাস গর্ভের অবস্থায়, জমিদারের উস্‌কানিতে আঠারো জন পুরুষ তাকে বলাৎকার করে তার দেহটা নদীতে ফেলে দেয়।

মেয়েদের এই লড়াই-এর কথা নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ করায় মোল্লারা যখন জুলফিয়া খাঁকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে, তার গ্রামের মেয়েরা তার নামে শোকগাথা রচনা করে ঃ

“ওগো মেয়ে, স্বাধীনতার জন্যে তোমার লড়াই-এর কথা ছুনিয়া ভুলবে না !
ওরা যেন না ভাবে, আগুন তোমায় পুড়িয়ে মেরেছে।
সে-আগুনই তো আমাদের হাতে মশাল হয়ে জ্বলছে।”

গোঁড়াদের অত্যাচারের বড় ঘাঁটি ছিল ‘পবিত্র বোখারা’। এখানে নাটকীয় ভাবে ঘোমটা ফেলার ব্যবস্থা হয়েছিল। রটিয়ে দেওয়া হল, ৮ই মার্চ তারিখে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে ‘চমকপ্রদ একটা ঘটনা’ ঘটবে। সে দিন শহরের নানা জায়গায় মেয়েদের বড় বড় সভা হল ; মেয়ে-বক্তারা সকলকে ‘একসঙ্গে তখুনি বোরখা ফেলে দিতে’ বললেন। মেয়েরা দলে দলে বক্তৃতা মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল, মেয়ে-বক্তাদের সামনে তাদের ঘোমটা ফেলে দিয়ে শোভাযাত্রা করে পথে বেরল। জায়গায় জায়গায় মাচা বাঁধা হয়েছিল ; সেখানে সরকারী নেতারা মেয়েদের অভ্যর্থনা জানালেন। অন্য মেয়েরাও বাড়ি থেকে বেরিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দিল ; মাচার সামনে তারাও ঘোমটা ফেলে দিল। ঐ শোভাযাত্রাই ‘পবিত্র বোখারায়’ পর্দা-প্রথার উচ্ছেদ করল। অনেক মেয়ে অবশ্য তাদের ক্রুদ্ধ স্বামীদের সামনে আসার আগে আবার ঘোমটা পরেছিল। তবে ঐ সময় থেকে ঘোমটা-পরা ক্রমেই কমে যেতে থাকে।

মেয়েদের মুক্তি দেওয়ার জন্যে সোবিয়েৎ শক্তি অনেকগুলো অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। শিক্ষা, প্রচার, আইন—এ সবেরই ব্যবহার হয়েছিল। যেসব স্বামী তাদের স্ত্রীদের হত্যা করেছিল, তাদের প্রকাশ্যে বিচার হল। নতুন প্রচারের চাপে পড়ে বিচারকরা

আসামীদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন; প্রাচীন রীতি অনুসারে আসামীরা নিরপরাধ বলে বিবেচিত হত। খাস রুশিয়ায় যেমন, অন্যত্রও তেমনি, মেয়েদের মুক্তি দেওয়ার প্রধান অস্ত্র কারখানা-শিল্পের প্রসার।

প্রাচীন বোখারায় একটা নতুন রেশম-কল দেখতে গিয়েছিলাম। এর পরিচালক দিনরাত খেটে এই নতুন শিল্পটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন; তাঁর মুখ ফ্যাকাশে, তাঁকে শ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন, "এখনও অনেকদিন পর্যন্ত এ কারখানাকে লাভজনক করা যাবে না। তুর্কীস্তানে ভবিষ্যতে যে সব রেশম-কল খোলা হবে সেগুলোর জন্যে গ্রাম্য মেয়েদের শিখিয়ে তুলছি। আমাদের কল হচ্ছে সচেতনভাবে প্রযুক্ত একটা শক্তি, যা মেয়েদের ঘোমটা উঠিয়েছে। আমরা কলের মেয়েদের বলি, কাজ করতে এসে ঘোমটা খুলতে হবে।"

বয়ন-শিল্পের মেয়ে মজুররা ঘোমটা ফেলে রুশ মেয়েদের মত মাথায় রুমাল বাঁধতে শেখার পর জীবনের নূতন অর্থ-সম্বন্ধে গান বেঁধেছে ঃ

"কারখানার পথ যখন ধরলাম,
দেখলাম একটা নতুন রুমাল,
লাল রুমাল, রেশমী রুমাল,
নিজের গতর খাটিয়ে কেনা।
কারখানার গর্জন চলেছে আমার মধ্যে
তা থেকে আমি ছন্দ পাচ্ছি,
তা থেকে পাচ্ছি শক্তি।"

এ কবিতা পড়তে পড়তে টমাস্ হুডের 'কামিজের গান' কবিতাটি মনে পড়ে যায়। সেটার মধ্যে বৃটেনের প্রথম দিকের কারখানার ছবি রয়েছে ঃ

"শ্রান্ত, শীর্ণ আঙুল,
চোখের পাতা ভারি আর লাল,
একটা মেয়ে বসে আছে,—
পরনের বস্ত্রটা আদৌ মেয়েদের যোগ্য নয়,
তার হাতের সুচ-সুতো চলেছে তো চলেছে।

সেলাই, সেলাই, সেলাই—
দারিদ্র্য আর যায় না,
ক্ষুধা আর যায় না,
অপরিচ্ছন্নতা রয়েই যায়,
তবু তার করুণ কণ্ঠে
সে গান গায়—কামিজের গান।

ধনিকতন্ত্রী বৃটেনে কারখানা এসেছিল লাভের জন্যে ; পরশ্রম-শোষণের অস্ত্র হিসেবে। সোবিয়েৎ দেশে, কারখানা শুধু সমবেত কল্যাণের একটা উপায় মাত্র নয়, সেটা অতীতের দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙবার সচেতনভাবে প্রযুক্ত একটা হাতিয়ারও।

* * *

প্রতি বছরই সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দলে দলে বীরের সৃষ্টি হত,—যাদের অধিকাংশ উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩৫ সালে দু'জনের নাম খুব বেশী শোনা যেত। তাদের একজন ছিল স্তাখানভ। স্তাখানভ ছিল কয়লাখনির শ্রমিক, সে উৎপাদনের একটা উন্নততর পদ্ধতি বার করেছিল। তার নাম থেকে একটা আন্দোলনের নামকরণ হল। আর একজন—মারি দেমচেঙ্কো। সে একটা যৌথ খামারে চিনি-বীট জন্মাতো ; লেবোরেটারি কুটিরে সে বীট সম্বন্ধে গবেষণা করে, আর ১৯৩৫ সালে দেশের সমস্ত চিনি-বীট উৎপাদকদের শুনিয়ে দেয় : "এসো, দেশটাকে চিনি দিয়ে ভাসিয়ে দিই আমরা : আমার দল কথা দিচ্ছে যে, প্রতি একরে বিশ টন করে বীট উৎপাদন করা হবে।"

শত শত খামার পাল্লা দিতে এগিয়ে এল ; হাজার হাজার দর্শক মারির দলের কাজ করা দেখল ; লক্ষ লক্ষ পাঠক উদগ্রীব হয়ে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অভিযান লক্ষ্য করতে লাগল। মারির দল ন'বার মাঠে নিড়ানি দিল, আটবার রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে গাছের ক্ষতিকারক উড়ন্ত পোকা নষ্ট করল। আগস্ট মাসে বৃষ্টি হল না দেখে সমস্ত দেশের লোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল, কিন্তু মারি যখন 'ফায়ার ব্রিগেডকে' ডেকে

মাঠে ২০ হাজার বালতি জল ঢালল তখন আবার সবার মুখে হাসি ফুটল। প্রতি একরে ২১ টন বীট ফলিয়ে মারির দল সমগ্র জাতির উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করল। দু' এক বছরের মধ্যে অন্যে একর প্রতি আরো বেশী বীট ফলালেও লোকের মনে মারির নাম অম্লান হয়ে রইল।

তার কাহিনীর শেষটুকু বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। নভেম্বর উৎসবে মারির দলকে মস্কোতে নিমন্ত্রণ করে আনা হল। তারা নেতাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। মারি স্তালিনকে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে জানাল যে, অনেকদিন থেকে 'নেতাদের দেখতে আসার' ইচ্ছে তার ছিল। স্তালিন উত্তর করলেন, "এখন তো তোমরাই নেতা"। মারি কথাটা ভেবে দেখল, বলল, "হ্যাঁ, তাই।" স্তালিন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি পুরস্কার চায়। মারি জানাল, বীট সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে সে একটা বৃত্তি পেলে খুশী হবে। সে-পুরস্কার সে পেল। ১৯৩৫ সালে পুরস্কার ও নেতৃত্বের আদর্শ সম্বন্ধে লোকের ধারণা ছিল এই রকম।

সমাজতন্ত্রে কোন ধরনের লোকের উৎপত্তি হবে, তা নিয়ে বহু প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। একদল তার্কোমান্ ঘোড়াওয়ালা যখন কয়েকটি মরুভূমি পার হয়ে, একটানা ২,৬৯০ মাইল পথ ভেঙে মস্কো এসে পৌঁছাল স্তালিন তাদের 'লক্ষ্যের স্থিরতা. অধ্যবসায়, ··· আর চরিত্রের দৃঢ়তার প্রশংসা করলেন, আর 'প্রাভদা'য় তাঁর এই উক্তির ব্যাখ্যা করে সোবিয়েৎ দেশের চারিত্রিক আদর্শ সম্বন্ধে একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হল। সে প্রবন্ধে লেখা হল যে হিটলার কিছুদিন আগে জার্মান যুবকদের কাছে যে অন্ধ আনুগত্য চেয়েছেন, সোবিয়েৎ দেশ তার যুবকদের কাছ থেকে ঠিক তার উল্টোটা চায়। প্রবন্ধে লেখা হল, "সোবিয়েৎ নাগরিকের গুণ হচ্ছে 'সবল ও মৌলিক ব্যক্তিত্ব'—'বশ্যতা নয়, অন্ধ বিশ্বাস নয়; সচেতনতা, সাহসিকতা আর সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা; ··· শ্রমিকদের সবল সামগ্রিকতা থেকে অবিচ্ছেদ্য সবল ব্যক্তিত্ব।" "লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে যে পরিষ্কার লক্ষ্য রয়েছে, তা থেকে জন্ম নেয় বিশিষ্ট স্বৈচ্ছিক নিয়মানুবর্তিতা।" এইভাবে

নাৎসীদের আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা আদর্শ সচেতনভাবেই প্রচারিত হল।

১৯৩৫ সালের শেষার্ধে, স্তাখানভপন্থীরা দেশটাকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে লাগল। সময় সময় পরিচালকদের উদাসীনতা বা বিরোধিতা সত্ত্বেও একসঙ্গে একশ' জায়গায় মজুররা তাদের নতুন যন্ত্রে উৎপাদনের আগেকার মান চুরমার করতে লাগল। সহযাত্রী অন্য মজুরেরা কিন্তু একাগ্রচিত্তে সবকিছু নজর করত। পৃথিবীর সবদেশের লোকের নজর পড়ল এদিকে, তারা রুশ মজুরদের এ আন্দোলনের নাম দিল 'দ্রুত কাজ করার' আন্দোলন। এটা কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তারা দুনিয়ার উৎপাদনশক্তির সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করছিল। ডনবাসের কয়েকজন খনিমজুর রুরের দ্বিগুণ উৎপাদন করল; গোর্কি অটো (মোটরগাড়ির—) কারখানার কামাররা ফোর্ডের কারখানার লোকদের উৎপাদন-সীমা ছাড়িয়ে গেল; লেনিনগ্রাদের কয়েকজন মুচি চেকোস্লোভাকিয়ার বাটা কারখানার মুচিদের চেয়ে দেড়গুণ মাল তৈরি করে রেকর্ড সৃষ্টি করল।

বহু মার্কিন বিশেষজ্ঞ, পাঁচ বছর আগে যাঁরা 'রুশদের কাজ শেখাতে' চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই এ সব ব্যাপার শুনে গজ গজ করে থাকবেন, 'আমরা যখন তাদের করে দেখাতাম, তারা শিখতে পারত না কেন!' কারণ পরিষ্কার। সোবিয়েৎ দেশ নতুন নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে সেগুলো চালানোর জন্যে নিয়োগ করেছিল এক কোটি দশ লক্ষ একেবারে আনাড়ি লোককে। আনাড়িরা কত যন্ত্র ভেঙেছে, কিন্তু ভেঙেচুরেও কাজ শিখেছে। শিক্ষকরা যখন বলে দিত, তারা শিখতে পারেনি; জিনিসটা তাদের ধাতস্থ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু রুশ মজুররা যা শিখল তা শুধু মার্কিনদের যন্ত্রবিদ্যা নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল—যেসব যন্ত্রপাতি আধুনিক জগৎকে গড়ে তুলছে; তাদের উপর একটা মালিকানার গর্ব।

যারা স্তাখানভপন্থীদের সারা সোবিয়েৎ কংগ্রেসে গিয়েছিল— মস্কোর সবাই চেষ্টা করেছিল যেতে—তাদের কাছে শোনা গেল

প্রচণ্ড হর্ষধ্বনির কথা। সংবাদপত্রগুলো কবিত্ব করে লিখল, 'বিজ্ঞানের অগ্নিময় অশ্বকে বশীকরণেরই কথা, যে সাম্যবাদে যার যা প্রয়োজন পেতে পারবে, সেই সাম্যবাদের পথ পরিষ্কার করার' কথা। প্রতিটি আলোচনায় নতুন মানুষদের যে বিশেষ চরিত্র প্রকাশ পেল, তা হল— আনন্দভরা কর্মপ্রেরণা, নানান্ জটিলপদ্ধতি আয়ত্তে আনার গর্ব, সমাজের সঙ্গে সচেতন সহযোগিতা এবং শেখার আগ্রহ।

স্তাখানভ জানালেন তিনি প্রথম যখন পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন করতে লাগেন, তখন তাঁর মনের ভাব হয়েছিল: "আন্তর্জাতিক যুব দিবসের উৎসব এগিয়ে আসছে। আমি ঐ দিনটি একটা অপূর্ব কীর্তি দ্বারা চিহ্নিত করতে চাইছিলাম। সহকর্মীদের সঙ্গে আমিও কিছুদিন যাবৎ ভাবছিলাম, কিভাবে চালু রীতির শৃঙ্খল ভেঙে খনি-কর্মীদের কাজে সাবলীল গতি আনা যায়, ড্রিল মেসিনকে দিয়ে পুরো 'সিফ্ট্' কাজ করানো যায়।" কামার বুসিগিন বললেন, "ভালো করে বুঝে নেওয়ার চেয়ে আমার কোনো বড় স্বপ্ন নেই; আমি বুঝতে চাই, হাতুড়ি কেমন করে তৈরি করা যায়, আমি হাতুড়ি তৈরি করতে চাই। স্লাভনিকোভা বললেন, তিনি একটা মেসিনের সব কিছু বুঝে নিয়েছিলেন, কিন্তু সেটা কখনও ব্যবহার করেননি; তাঁর ইচ্ছে হল, ঐ মেসিনটা দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবেন। কারখানার ফোর্‌ম্যান বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন, স্লাভনিকোভা তখন তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি বিমান থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে শিখেছেন, সুতরাং সাধারণ রীতিনীতিকে তিনি ডরান না; ওসব তিনি পালটে দেবেনই এবং দিলেনও।

ভাসিলিয়েভ বলে একজন কামার রড জোড়া দেওয়ার কাজে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিলেন; তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে 'ফুটে ওঠা' আর 'ফেটে পড়া' শব্দ দুটো ব্যবহার করলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি যে সবার বাড়া কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, আর একজন তার বেশী কৃতিত্ব দেখানোর খবর পেয়ে তিনি 'ফুটে উঠলেন'—ছুটি শেষ হবার চারদিন আগেই এসে কাজে যোগ দিলেন। "আন্দ্রিয়ানভকে

আমি হারিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু কাগজে দেখলাম, খারখভের একজন কামার হাজারের বেশী রড জোড়া দিচ্ছে। ফেটে পড়লাম আমি। এক সিফ্‌টে ৯৪৫টা রড জোড়া দিলাম। দলের লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করলাম—কাজের জায়গাটা কিভাবে ঠিক করে নেওয়া যায়। তার ফলে ১০৩৬ রড্ জুড়তে পারলাম। ফোর্‌ম্যানের সঙ্গে আলোচনা করলাম কিভাবে ফার্নেস্‌টা (চুল্লী) একটু পরিবর্তন করা যায়; ফোর্‌ম্যান এমন একটা ফার্নেস্ দিলেন যাতে এক সিফ্‌টে দেড়হাজার রড গরম করা যায়। আর আমাদের পায় কে? নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে রডগুলো এমনভাবে সাজানোর ব্যবস্থা করলাম যাতে টপাটপ সেগুলো ধরে নেওয়া যায়। ২৭শে অক্টোবর তারিখে আমি সমস্ত রুশিয়ার মধ্যে সবার সেরা কাজ দেখালাম—এক সিফ্‌টে ১১০১টা রড জোড়া দিলাম। ভাই সব, আমার হাতুড়িটা থেকে যত কাজ আদায় করা সম্ভব ততটা এখনও আদায় করিনি আমি; তবে করতে যাচ্ছি।”

স্তাখানভপন্থীরা ওভারটাইম কাজের সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করত—সেটাকে অপটুতা স্বীকার করা হয়। তাদের ঝোঁক ছিল কাজের এমন একটা ছন্দ বার করতে যাতে শরীর অবসন্ন না হয়ে পড়ে। “কাজ যদি ঠিকভাবে করা হয়, শরীরটা আরো সুস্থ ও সবল বোধ করবে।” নিজেদের কৌশল অন্যদের শেখানোর উপর তাদের খুব ঝোঁক ছিল। লোকোমোটিভ্ (রেল-ইঞ্জিনের) ইঞ্জিনিয়ার ওমেলিয়ানভ নিজে সবার সেরা কাজ দেখিয়ে ‘সব চেয়ে ঢিলে’ ইঞ্জি-নিয়ারকে তাঁর চেলা বানিয়ে দিলেন, তাকে তিনি অন্য সবার চেয়ে বেশী কাজের লোক করে ছাড়লেন। এই লোকগুলোর চাহিদা মেটাতে গিয়ে প্রচলিত কার্যপদ্ধতি ভাঙতে হল। একজন ইঞ্জিনিয়ার আমাকে বললেন, “ওদের সঙ্গে তাল রেখে যাতে কাজের স্রোত চলতে পারে, তার জন্যে আমাকে রাতের পর রাত জেগে পরিকল্পনা করতে হয়।”

একজন স্তাখানভপন্থী আমাকে বললেন, “আজ থেকে দশ বছর পরে শিল্প ও কৃষি আর আমাদের প্রধান কাজ থাকবে না, হয়তো।

আমাদের যা কিছু দরকার সব প্রস্তুত করতে পারব। তবে, অন্য-ধরনের কাজও তো আছে। মানবীয় বিকাশ, নতুন দেশের সন্ধান, বিজ্ঞান—এগুলোর তো কোথাও অন্ত নাই।” তিনি মানুষের অগ্রগতির কোনো সীমারেখা মানতে রাজী ছিলেন না, মানুষের নিজের প্রকৃতিতে বা স্থানকালে কোথাও কোনো সীমা তাঁর চোখে পড়ছিল না।

ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে, কোথাও কোনো সীমা মানতে রাজী ছিল না। কার মনের ঝোঁক কোন ধরনের কাজের দিকে, সেটা শীঘ্রই আবিষ্কার করে নিতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করত ইস্কুল; গ্রীষ্মকালীন শিবির আর ভ্রমণ তাদের বেছে-নেওয়ার ক্ষেত্র প্রসারিত করত। সংবাদপত্রে আলোচনা করে তাদের আত্মপ্রকাশের শক্তি স্ফুরিত হত। ‘পাইওনীয়ার প্রাভদা’ বলে একটা কাগজের প্রায় সমস্তটা লিখত ছেলেমেয়েরা। তিফলিসে রেলওয়ে মজুরদের ছেলে-মেয়েরা সেখানকার ‘কৃষ্টি ও বিরাম উদ্যানে’ আধমাইল রেলপথ তৈরি করে তার উপর গাড়ি চালাত, তাদের ঐ রেলওয়ে যাত্রী বহন করত, ভাড়া আদায় করত, আর সে ভাড়ার টাকা লাগাত তাদের রেলওয়ে প্রসার করার কাজে। বড়দের সবরকম কাজে ছেলেদের ঠাঁই করা হত। ১৯৩৪ সালে ‘অনাবৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধে’ দলে দলে ছেলেরা ফসল কাটার পর মাঠে পড়ে থাকা গম কুড়োত, কোন দল কত কুড়োতে পারে তা নিয়ে তাদের প্রতিযোগিতা চলত। উত্তরের একটা অঞ্চলে ছেলেরা আমাকে গর্বের সঙ্গে বলেছিল, তারা উর্বরতা ফুরিয়ে আসা জমির জন্যে কিভাবে টন টন পাখির গু আর কাঠের ছাই সংগ্রহ করেছে।

১৯১৪ সালে, মুরম্যান্স্ক-এর রেলগাড়িতে আমার দেখা হয় বিশজন ‘উত্তরমেরু অভিযাত্রী’ ছেলেমেয়ের সঙ্গে। তাদের কারো বয়স ষোলর বেশী নয়; তারা চলেছিল মেরু অঞ্চলের দিকে। মানচিত্র, উত্তর মেরু অঞ্চলে ভ্রমণের কাহিনী এবং উত্তরের লোকদের সম্বন্ধ তাদের কৌতূহল দেখে তাদের জন্যে এই ভ্রমণের ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। তারা গিয়ে মেরুসন্ধানী বড়দের সঙ্গে দেখা করবে; বড়রা তাদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সহকর্মী বলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাবে। ঐ গ্রীষ্মকালেই উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় বাছাই-বাছাই দশজন ছাত্রকে আলতাই পর্বত অভিযানে পাঠানো হয়েছিল; তারা ১২০০ মাইল বেড়িয়ে ২৭টা নতুন রকমের কালো কিস্‌মিস্ আর এক ধরনের বরফ-জমানো ঠাণ্ডাতেই জন্মানো পেঁয়াজ-এর গাছ নিয়ে আসে। এই তরুণ উদ্ভিদ্‌-বিদ্‌দের দু'জনকে তাদের দলের প্রতিনিধি হিসেবে বৃদ্ধ উদ্ভিদ্‌-যাদুকর মিচুরিনের কাছে ঐ গাছেগুলো পৌঁছে দিতে পাঠানো হয়েছিল।

ঐ সময়কার সোবিয়েৎ ছেলেমেয়েদের মনোভাব কেমন ছিল, সেটা বোঝা যাবে দু'টো ঘটনা থেকে। ১৯৩৫ সালের জুন মাসে নতুন দশবছরী ইস্কুলের বিদায়ী ছাত্রদের একজন, আনা ম্লাইনিক বিদায়-বক্তৃতায় বললেন, "বেঁচে থাকা সুখের—এই রকম একটা দেশে, এই রকম একটা যুগে। আমরা হচ্ছি এদেশের মালিক, আমরা এখনো ছেলেমানুষ, আমাদের ডাক পড়েছে কাল ও স্থান জয় করতে।" বিদায়-বক্তৃতায় একটু বড় বড় কথা বলা হয় বটে, কিন্তু আগেকার দিনে ছেলেমেয়েরা ছিল হয় রাজাদের, নয় গণতন্ত্রের অধীন নাগরিক —সমাজতন্ত্র আসার আগে তারা নিজেদের দেশের 'মালিক' বলতে পারত না। ঐ বছরই, নিনা কামেনোভা রেইনার পাহাড়ের মত দ্বিগুণ উঁচু স্থান থেকে প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পৃথিবীর মধ্যে একটা রেকর্ড স্থাপন করে। মাটিতে নেমে সে যে কথাগুলো বলেছিল, সেগুলো সোবিয়েৎ দেশের ছেলেমেয়েদের মুখে রণধ্বনি হয়ে গেল: "আমাদের দেশের আকাশ হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে উঁচু।"

দেশের লোক যখন মনের আনন্দে এমনি ধারা বড় বড় কথা বলছে, ঠিক সেই সময় সার্‌জাই কিরভ আততায়ীর হাতে নিহত হলেন; ঐ হত্যার সূত্র ধরে শুরু হল পুলিসী অনুসন্ধান, একটার পর একটা চক্রান্তের হদিস পাওয়া যেতে লাগল; তার ফলে দেশে লোকের মনে ১৯৩৫ সালের 'রামরাজ্য' প্রায় এসে যাওয়ার ভাব রূপান্তরিত হতে হতে ১৯৩৭ সলের 'প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা'য় পরিণত হল।

এই সুখের দিনগুলোর একটা ফল ইতিহাসে রয়ে গেল—এই সময় নতুন সোবিয়েৎ সংবিধান জন্ম নিল।

সোবিয়েৎ রাষ্ট্র সব সময়েই নিজেকে গণতন্ত্রী বলে দাবি করে এসেছে ঃ পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো সে কথা সব সময়েই অস্বীকার করে এসেছে। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও নির্বাচন-পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। মার্কিনরা সোবিয়েৎ নির্বাচনগুলো সম্বন্ধে যাই মনে করুক না কেন, সোবিয়েৎ দেশের লোকে মার্কিনদের মতই উৎসাহ ও আশা নিয়ে প্রতি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে। তারা শুধু নির্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষে ভোট দেয়নি, তারা 'নাকাজ' অর্থাৎ 'জনগণের নির্দেশ' লিখিত ভাবে পেশ করেছে; ভাবী-সরকারের পক্ষে সেই নির্দেশগুলো হয়েছে প্রথম করণীয়।

১৯০৭ সালের নির্বাচনে আমার স্বামী একমাস ধরে প্রতি সন্ধ্যেয় 'গণ্ডী'-কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন; তাঁর গণ্ডীর সমস্ত লেকেদের সঙ্গে দেখা করে তিনি তাদের শুধু নির্বাচনের ব্যাপারে টানেননি, সরকারের কি কি করা উচিত তার ফিরিস্তি তৈরি করতেও উৎসাহিত করেছেন। তাঁর কাছে এক বুড়ীর কথা শোনা গেল, সে এর আগে কখনো ভোট দেয়নি; সে প্রথমে বলেছিল, "আমাকে নিয়ে সোবিয়েৎ সরকারের কি কাজ!" কিন্তু পরে, আমার স্বামী তাকে বারবার বলাতে সে নিজের রান্নাঘরে অনেকগুলো কাপড় সাবান-কাচা করে মেলা রয়েছে দেখে স্থির করল যে, সে সরকারের কাছে আরো ধোবিখানা খোলার দাবি করতে পারে। পরে তার দাবি মত আরো ধোবিখানা খোলা হয়েছিল। সে বছর মস্কোর শহর সোবিয়েৎ-এর হাতে ৪৮ হাজার 'জনগণের নির্দেশ' আসে, আর তিন মাসের মধ্যে সে সবের সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে হয়েছিল তাঁকে। অনেক নির্দেশই অবশ্য ছিল মূলতঃ একই রকম, অনেক নির্দেশ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হয়েছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ নির্দেশই লোকের কাছে পুনরায় ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল একটা অভিনব পন্থায়। শহর সোবিয়েৎ লোককে জানিয়ে দিল, তারা যদি স্বেচ্ছায় খেটে

দিতে পারে, তা হলে তাদের ঐ সব দাবি পূরণ করা সম্ভব। সোবিয়েৎ গণতন্ত্রের বিচার হয় কত লোক নির্বাচনে ভোট দিল তা দেখে নয়,—১৯২৬ সালের নির্বাচনে শতকরা ৫১ জন ভোট দিতে এসেছিল, ১৯৩৪ সালে ভোট দিতে এল তার চেয়ে অনেক বেশী, শতকরা ৮৫ জন ;—নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারী কাজে সাহায্য করার জন্যে কত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করতে পারে, তা দেখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ট্যাক্স ও ঘরবাড়ি সংক্রান্ত সরকারী-দফতরের অনেকখানা কাজই এই স্বেচ্ছাসেবকরা করে দেয়। এর ফলে যে আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা লক্ষ্য করে ; হাওয়ার্ড কে. স্মিথ তৃতীয় দশকের শেষ দিকে তাঁর মস্কোর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বলেছিলেন, "মনে হচ্ছিল যেন প্রত্যেকটা লোক সে যত সামান্যই হোক—নিজেকে রাষ্ট্র-গঠনের বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত বেশ একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে বোধ করছে। ··· আবহাওয়া দেখে আমার শুধু একটা কথা মনে হচ্ছিল ··· হাঁ, এই হচ্ছে 'গণতন্ত্র'।"

১৯২২ সালের সংবিধানের পর, দেশে বড় বড় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। দেশের মূল সম্পদের মালিক হয়েছিল সর্বসাধারণ ; লোকে আর নিরক্ষর ছিল না। কর্মস্থান হতে পরোক্ষ, অসম ভোট-দেওয়ার নিয়ম অচল হয়ে পড়েছিল ; সর্বত্রই লোকে তাদের জাতীয় বীরদের খবর রাখত, তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে ভোট দিতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সোবিয়েৎ কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করল যে, জাতীয় পরিবর্তিত জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংবিধানটা পরিবর্তন করা উচিত। ৩১ জন ইতিহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতির পণ্ডিতের একটা কমিশনের উপর নতুন সংবিধানের একটা খসড়া তৈরি করার ভার দেওয়া হল; স্তালিন হলেন তার চেয়ারম্যান। বলে দেওয়া হল, নতুন সংবিধান যেন জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষায় আরো বেশী করে সাড়া দিতে পারে, সেটা যেন সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের উপযোগী হয়।

সংবিধান অবলম্বনের পদ্ধতিটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সমবেত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষ যেসব ঐতিহাসিক কাঠামোর মধ্যে—তা

রাষ্ট্রেরই হোক বা ঐচ্ছিক সঙ্ঘের হোক—নিজেদের সংগঠিত করেছে, কমিশন এক বছর ধরে সে সমস্ত আলোচনা করল। তারপর, ১৯৩৬ সালের জুন মাসে সরকার কর্তৃক একটা প্রস্তাবিত খসড়া পরীক্ষামূলক ভাবে গৃহীত হল এবং ঐ খসড়ার ৬ কোটি কপি জনসাধারণের কাছে পেশ করা হল। ৫ লক্ষ ২৭ হাজার সভায় সমবেত হয়ে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ লোক সেটা আলোচনা করল। কয়েক মাস ধরে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র লোকের চিঠিতে ভরে থাকত। ১ লক্ষ ৫৪ হাজারটা সংশোধন প্রস্তাব এল—তাদের অনেকগুলোই অবশ্য মূলতঃ এক রকমের ; অনেকগুলো আবার ঠিক সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আইনের গ্রন্থে যাবার বেশী উপযুক্ত। জনসাধারণের এই আগ্রহের ফলে ৪৩টা সংশোধন কার্যতঃ গৃহীত হল।

১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ক্রেমলিন প্রাসাদের বিরাট হলঘরে সংবিধান-সম্মেলনে ২ হাজার ১৬ জন জন-প্রতিনিধি মিলিত হলেন। শিল্পে, কৃষিকর্মে, বিজ্ঞানে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, সেই নতুন মানুষের কংগ্রেস ছিল এটা। চাষীরা এ কংগ্রেসে আর 'শস্য-উৎপাদক' এই সাধারণ নামে অভিহিত হয়ে এলেন না, তাঁরা এলেন বিশেষজ্ঞ, ট্র্যাক্টর চালক, 'কম্বাইন্'-চালক হিসেবে—তাঁদের বেশীর ভাগ 'সবার সেরা' কর্মী হিসেবে নাম করেছিলেন। বড় বড় কারখানার পরিচালকরা এলেন ; বিখ্যাত শিল্পীরা, অস্ত্র-চিকিৎসকরা এলেন; বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এলেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষ দিকে এঁরাই ছিলেন সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের নূতন প্রতিনিধিস্থানীয় লোক।

সংবিধানে, দেশে যেসব পরিবর্তন ঘটেছিল, তার ছাপ পড়ল। তার আরম্ভে থাকলঃ রাষ্ট্রের কাঠামো আর সম্পত্তির নানা মূলগত রূপের কথা। ভূমি, মৌলিক সম্পদ, শ্রমশিল্প হল 'রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি, সমগ্র জনসাধারণের সম্পদ।' যৌথ খামারের সমবায়মূলক সম্পত্তি এবং নাগরিকদের আয়, বাড়িঘর আর ব্যবহারের জিনিসপত্রে অধিকার 'আইন দ্বারা রক্ষিত' হল। নির্বাচন হবে "আঠারো বছরের বেশী বয়সের সমস্ত নাগরিকের প্রত্যক্ষ, সম ও গোপন ব্যালট দ্বারা।"

সংবিধানের মধ্যে 'নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য' সংক্রান্ত পরিচ্ছেদের প্রত্যেকটি ধারা সকলের হর্ষধ্বনির মধ্যে গৃহীত হল। এর আগে কোনো জাতি তার নাগরিকদের এতগুলো অধিকার ভোগ সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেয়নি। 'বাঁচার অধিকার' সংরক্ষিত হল চারটি উপধারায়ঃ কাজ করার অধিকার, ছুটি ভোগ করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার এবং বাস্তব সাহায্য পাওয়ার অধিকার। স্বাধীনতার অধিকার ব্যখ্যাত হল ছয়টি অনুচ্ছেদে; তার অন্তর্ভুক্ত হলঃ বিবেকের স্বাধীনতা; উপাসনার স্বাধীনতা; কথা বলার বা বক্তৃতা করার স্বাধীনতা; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা; একত্র মেলামেশা, বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সংগঠন করার স্বাধীনতা; যথেচ্ছ গ্রেপ্তার হতে মুক্ত থাকা; গৃহ-জীবন এবং পত্রালাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা—এই সমস্ত স্বাধীনতাই জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে বিহিত হল।

জার্মানিতে তখন নাৎসী-ফাসিজ্‌ম্ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত—এই সংবিধান হল তার সরাসরি জবাব। নাৎসীরা বলত, গণতন্ত্র জীর্ণ হয়ে গেছে; সমস্ত সোবিয়েৎ বক্তা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে 'অজেয়' বলে অভিনন্দন জানালেন। হিটলার বলেছিলেন, বড় জাতি ছোট জাতির কথা; স্তালিন তার জবাব দিলেন,—সব মানুষ সমান, এই মর্মে অশ্রুতপূর্ব এক ব্যাপক বিবৃতি প্রচার করেঃ "ভাষা, গায়ের রঙ, সাংস্কৃতিক অনুন্নতি বা রাজনৈতিক বিকাশের স্তর—কোনো কিছুই জাতিগত ও বর্ণগত অসাম্যের সঙ্গত কারণ হতে পারে না।"

এই ঘটনাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সোবিয়েৎ দেশের সর্বত্র লক্ষ লক্ষ লোক অবিরাম জনস্রোতে শীতের রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। পৃথিবীর সর্বত্র প্রগতিকামী লোকে এটাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সুদূর চীনে বসে শ্রীমতী সান্-ইয়াৎ সেন বললেন, "এ হচ্ছে মানব-জাতির সব চেয়ে বড় সিদ্ধি।" জেনেভার শান্ত হ্রদের ধার থেকে রোম্যা রোলাঁ বললেনঃ "স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ এতকাল ছিল মানুষের স্বপ্নের বস্তু মাত্র; এই সংবিধান থেকে তারা প্রাণ পেল।"

সংবিধান যখন লেখা হচ্ছিল, তখনই তা লঙ্ঘিতও হয়েছিল। এটা কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়; খুব কম সংবিধানই খুঁটিনাটি ভাবে মেনে চলা হয়। তবে, সোবিয়েৎ দেশের সংবিধান লঙ্ঘন করলেন তার রচয়িতা স্তালিন। স্তালিন তাঁর 'গণতান্ত্রিক সংবিধান' সম্পর্কে স্পষ্টতঃ গর্বিত হলেও, তাঁর মধ্যে একটা অদ্ভুত দ্বৈতভাবের দোষ ছিল। কারণ, সংবিধান যখন সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের মূলগত আইন রয়েছে, সাধারণ লোকে, সরকারী বিভাগগুলো, সাধারণ বিচারালয়গুলো যখন গর্বের সঙ্গে তা মেনে চলেছে, তখন রাজনৈতিক পুলিস এর দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করত না। এই সংস্থাকে ১৯২২ সালে কেন্দ্রীভূত শক্তি অর্পণ করেছিলেন স্তালিন, সেটা ক্রমে রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল। এ সংস্থা সংবিধান বা দেশের অন্য কোনো আইনের মর্যাদা রাখত না। এ থেকেই পরের কয়েক বৎসরের বিভীষিকাময় ঘটনাবলীর উদ্ভব।

প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা

১৯৩৬-৩৮ সালে সোবিয়েৎ দেশে যেসব বাড়াবাড়ি ঘটেছিল তার পুরো ইতিহাস কেউ জানে, অথবা সে সম্পর্কে ঠিকমত দোষ নির্ণয় করতে পারে বলে আমার মনে হয় না। লক্ষ লক্ষ লোককে— অগণিত লোককে অতর্কিতভাবে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে উত্তর ও সুদূর প্রাচ্য রুশিয়ার কয়েদী শিবিরে পাঠানো হয়েছিল; হাজার হাজার লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল আর তাদের সে দুর্ভাগ্যের সংবাদ এমনকি তাদের আত্মীয় বন্ধুদের কাছেও দেওয়া হয়নি। স্তালিনের মৃত্যুর পর সোবিয়েৎ রাষ্ট্রে এই সব মামলার পুনরালোচনা শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিংশ পার্টি কংগ্রেসে, স্তালিনকে আক্রমণ করার সময়, খ্রুশ্চেভ বিগত দু'বছরে এই রকম ৭,৬৭৯ জনের 'নির্দোষ প্রমাণিত' হওয়ার সংবাদ দেন। তাদের অনেকেই তখন মৃত।

তাঁর উদ্‌ঘাটিত কাহিনীর মধ্যে সব চেয়ে মর্মান্তিক হল এই যে, ১৯৩৪ সালে, যাকে 'জয়ের কংগ্রেস' বলা হয়, সেই কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে যে ১৩৪ জন সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁদের মধ্যে ৯৮ জনকে—শতকরা ৭০ জনকে—গ্রেপ্তার করে গুলি করা হয়। এদের বেশীর ভাগকে মারা হয় ১৯৩৭-৩৮ সালে।

সোবিয়েৎ-বিরোধী সংবাদপত্রে এর একটা মামুলি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়; এদের বক্তব্য হচ্ছে; সমাজতন্ত্র স্বভাবতঃই 'একনায়কত্বমূলক এবং নিষ্ঠুর।' সোবিয়েতের লোকদের সাম্প্রতিক কয়েক বছরের উদ্যোগের কথা যাঁরা জানেন, তারা যেটাকে তাদের 'স্বাধীনতা' বলে তার প্রতি তাদের একান্ত আসক্তির কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা এ ব্যাখ্যা মেনে নেন না। খ্রুশ্চেভ ও আরো অনেকের ব্যাখ্যাও প্রায় ঐরকমই মামুলি: তাঁরা স্তালিন এবং 'ব্যক্তিপূজা'র দোষ দেন। স্তালিনকে অবশ্যই দায়ী করতে হবে, কিন্তু তাঁর দোষের কথা বলেই এ সম্পর্কে শেষ জবাব হয় না। কারণ, স্তালিন প্রণালী মত কাজ করেছিলেন; ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যা কিছু আরম্ভ করা হয়, সে সব কাজই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে সমর্থিত হয়েছিল। একটা সমগ্র শাসনব্যবস্থা এ ব্যাপারে জড়িত। তা ছাড়া, খ্রুশ্চেভ নিজেই বলছেন যে, এ সমস্ত কাজেই স্তালিন "বিবেচনা করতেন যে, শ্রমিক-সাধারণের স্বার্থে···বিপ্লবের বিজয়গুলো রক্ষা করার জন্যে, এ সব না করলে চলবে না।" মামলাগুলোর পুনরালোচনা করতে বসে, ইতিহাসের পুনরালোচনা করতে বসে, সোবিয়েৎ দেশ একদিন সত্যিই যা ঘটেছিল তার মূল্য নিরুপণ করতে পারবে বলে আমার মনে হয়। আপাততঃ আমার কাছে এটা একটা 'প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা' বলে মনে হচ্ছে; এটা কি করে হল তার সূত্র ধরার চেষ্টা করছি।

শত্রুপক্ষের গুপ্তচর বা বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর দ্বারা 'উচ্ছেদ' হওয়ার সমস্যা সব সরকারেরই থাকে। বিশেষ বিচার-বিবেচনা করে, দেশের সাধারণ আইনের মধ্যে তার প্রতিবিধান ক্বচিৎই করা হয়। প্রায়ই এ থেকে জন্ম নেয় এলোপাথারি তল্লাসী আর প্রতিবেশী সম্পর্কে

আতঙ্ক—যেমন দেখতে পাচ্ছি আমাদের দেশ। এ রকম উদ্‌ভ্রান্তির কারণ অবশ্য এই যে, এ ক্ষেত্রে অপরাধীরা সাধারণ দুষ্কৃতিকারী নয়, তাদের বিশেষ কোনো পর্যায়ে ফেলে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা যায় না। রাষ্ট্র যেসব আনুগত্য দাবি করে, তাদের তা নেই। সুপ্রতিষ্ঠ বা নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ কোনো শাসনব্যবস্থা এদের সম্বন্ধে বড় বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে না; কারণ, তখন এরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। কিন্তু যখন কোনো লড়াই চলছে অথবা শাসনব্যবস্থা যখন ঝড়ঝাপটার মধ্যে যাচ্ছে, তখন সাধারণ দুষ্কৃতিকারীদের চেয়ে এরা বেশী উদ্বেগজনক হয়ে উঠে।

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকেব শেষদিকে, সমস্ত ইউরোপ এইভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। স্পেনীয় যুদ্ধের সময় 'পঞ্চমবাহিনী' কথাটার উদ্ভব হয়; পঞ্চমবাহিনী বলতে বোঝাত, ফ্রাঙ্কোর যেসব গুপ্ত অনুচররা তাঁকে সাধারণতন্ত্রী মাদ্রিদ অধিকার করতে ভিতর থেকে সাহায্য করেছিল, তাদের। উত্তরকালে, হিটলারের পঞ্চমবাহিনী ইউরোপের বহু সরকারের মধ্যে এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাতেই সেগুলো ধ্বসে পড়ে। মোটামুটি বলতে গেলে, এই পঞ্চম-বাহিনীর মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের, যারা স্পেনের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে, এবং পরে হিটলারের বাহিনীকে পূর্বমুখে অগ্রসর হতে প্রলুব্ধ করার আশায় চেকোস্লোভাকিয়ার রক্ষা-প্রাচীর হিটলারের হাতে তুলে দিয়ে নিজ নিজ জাতির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল করে দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিলেন মার্কিন শিল্পপতিরা, যারা জাপানের কাছে পুরানো লোহা বিক্রি করে তাকে মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে লড়বার শক্তি জুগিয়েছিলেন। এঁদের কেউই নিজেদের স্বদেশদ্রোহী মনে করেননি। কুইস্‌লিং লাভাল প্রভৃতি যাঁরা নানারকম অজুহাত দেখিয়ে আক্রমণকারীর অধীনে তাঁবেদার সরকারে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরাও সম্ভবতঃ নিজেদের স্বদেশদ্রোহী মনে করেননি। কিন্তু উনিশ শতকের জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা স্বজাতিদ্রোহী; এ যুগের প্রগতিবাদীদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সমগ্র মানব-জাতির

প্রতি বিশ্বাসঘাতক। হিটলার জয়ী হলে, তাদের সম্বন্ধে রায় অন্যরকম হত। বিজয়ী দলই ইতিহাস রচনা করে।

এই পটভূমিতে আমরা রুশিয়ার কথা বিচার করব। প্রাক্তন রুশ নেতাদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে বহু বৈদেশিক সৈন্য বাহিনী প্রথম কয়েক বছরে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল; বহু লড়াই করেই তাদের তাড়াতে হয়েছিল। তারপরও দেশের যে দলকেই অসন্তুষ্ট পাওয়া গিয়েছে, তাদের ব্যবহার করে ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলো চাপ ও ভীতি-প্রদর্শন করে চলছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম দু'বছর, উচ্চতম ইঞ্জিনিয়াররা গোপনে গোপনে 'ধ্বংস-চেষ্টার হিড়িক' লাগিয়ে দিয়েছিলেন; যেসব কলকারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল, সেগুলোর প্রাক্তন বৈদেশিক মালিকদের সঙ্গে এই ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকেরই যোগ ছিল। এই ধ্বংস-প্রচেষ্টার দিকে এক নজর দেওয়া যাক। যেসব মার্কিন নাগরিক ঐ সময় সোবিয়েতের কলকারখানায় কাজ করেছে তাদের যে কেউ এর দৃষ্টান্ত দিতে পারবে।

এই ধ্বংস-চেষ্টার সবচেয়ে সাধারণ রূপ ছিল, কারখানায় নিজেদের লোক ঢুকিয়ে রাখা। সিন্‌সিনাটির একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সোবিয়েৎ শিল্পের জন্যে যন্ত্রপাতি বিক্রি করত; ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে বলা হয় যে, তাঁদের যন্ত্রপাতি কোনো কাজের নয়। সামারার যে কার-খানায় তাঁদের যন্ত্রপাতি কাজ দিচ্ছে না বলে তাঁকে বলা হল, সেটা দেখার জন্যে তিনি সেখানে যেতে চাইলেন। মস্কো থেকে সামারা যাওয়ার ব্যাপার নিয়ে তাঁকে সরকারী অফিসের খাতাপত্রের ঝামেলার সঙ্গে যথেষ্ট লড়তে হল। সামারায় গিয়ে তাঁকে কারখানায় ঢুকতে হল জোর করে, রাজনৈতিক পুলিসের সাহায্যে। দেখলেন, কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ভীত-সন্ত্রস্ত; এই ব্যক্তি স্বীকার করলেন যে, মার্কিন যন্ত্রপাতিগুলো আদৌ পরীক্ষা করে দেখা হয়নি; সেগুলো তখনো বাক্সবন্দী হয়ে আছে। একটা জার্মান কোম্পানীর কাছে ঘুষ খেয়ে তিনি ওগুলো সম্বন্ধে খারাপ রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন আর আমেরিকানটি যাতে সামারা না আসতে পারে, তার জন্যে মস্কোর এক

সরকারী কর্মচারীর সঙ্গে সাট করেছিলেন। আমার মার্কিন সংবাদ-দাতা এ ঘটনায় মোটেই বিস্মিত হননি; 'চালাকিটা' কেমন ধরিয়ে দিয়েছিলেন ভেবে তিনি হাসছিলেন। রুশরা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে জাতীয় শিল্প গড়ছিল, তাদের কাছে এ ধরনের ব্যাপার মোটেই হাসির ছিল না; ছিল মস্ত অপরাধ।

১৯৩০ সালে যখন আমি ওডেসার কাছে প্রথম ট্র্যাক্টর কেন্দ্র দেখতে যাই, তখন বিদেশী চরদের চক্রান্তের কথা নিজে প্রথম টের পাই। রেলগাড়িতে 'জিপিউ'র—রাজনৈতিক পুলিসের লোকরা আমাকে দু'বার জিজ্ঞাসাবাদ করে; আমি তাদের যখন বিশ্বাস করাতে পারলাম যে আমি একজন মার্কিন লেখিকা, তখন তারা চলে গেল। আমি রেলের দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজনৈতিক পুলিস এখানে এত ব্যস্ত কেন? রেল লাইন রোমানিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি বলে না কি?"

সে বলল, "তোমার ঐ জার্মানির তৈরী চামড়ার কোট দেখে ওরা ভেবেছিল, যেসব চররা মেননাইটদের খেপিয়ে দিচ্ছে তুমি হয়তো তাদেরই একজন।" পরে, আমি স্থানীয় চাষীদের কাছে শুনলাম, জার্মান বংশের অনেক মেননাইট চাষী হঠাৎ 'নাস্তিকদের দেশ ছেড়ে' যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেছে, আর তাদের এ সিদ্ধান্তে জার্মান চরদের হাত রয়েছে। কয়েকটা গ্রামের সমস্ত লোক তাদের ঘরবাড়ি, গরু ভেড়া বেচে বা ফেলে রেখেই মস্কো গিয়ে বিদেশে যাওয়ার জন্যে পাসপোর্ট চাইছে। ফলে, ফসল তোলার কাজে বিশৃঙ্খলা এসে পড়েছে।

কারখানা-শিল্পে ধ্বংস-চেষ্টার কাহিনী আমি অনেক আমেরিকানের মুখে শুনেছি। একজন একটা মোটর কারখানায় তদারকের কাজ করতেন। একদিন রাজনৈতিক পুলিসের একজন লোক তাঁকে ডেকে তার সামনে কয়েকখণ্ড ধাতু ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, সেগুলো কি? —তিনি বলতে পারেন কি না।

তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই, এগুলো ভারী মেশিনগানের কয়েকটা অংশ।" তাঁর নিজের কারখানাতেই রাতের সিফ্‌টে এ সব তৈরী

হচ্ছে, এই সংবাদ দিয়ে পুলিস কর্মচারীটি তাঁকে অবাক করে দিলেন। ফোরম্যান্ ও একজন টেক্‌নিসিয়ানের দোষ ধরা পড়ল; বাকি শ্রমিকরা জানত না যে, বিশ্বাসঘাতকদের একটা দলের জন্যে তারা গোপন অস্ত্রাগার সাজাচ্ছিল।

আর একজন আমেরিকান ইস্পাত কারখানাগুলোতে যন্ত্র বিকল হওয়ার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। তিনি হাসতে হাসতে আমায় বললেন, "আমি ধ্বংস-প্রয়াসীদের বেছে বেছে বার করছি। আমি অপরাধীদের ধরি না। তবে, আমি গিয়ে ইস্পাতের টেবিলের তলায় ঘড়াঙ্-ঘড়াঙ্ করা কোনো একটি বেয়াড়া কলের গীয়ার বাক্স খুলে ফেলি—ক্রেনের সাহায্যে ঐ ইস্পাত টেবিলটা সরাতেই অর্ধ দিন লেগে যায়। দেখি, ন' হাঁড়ি ধুলো আর ইস্পাতের চাঁচাড়িতে গীয়ারগুলো জাম হয়ে আছে। কারখানার পরিচালককে সেগুলো দেখিয়ে বলি, "এটা এমনি অকারণে হতেই পারে না।" বেচারা লোক ভাল—ইস্পাত কারখানার রহস্য বড় বোঝেন না; কিন্তু তাঁর চোখ জ্বলে ওঠে; তিনি জানেন, এর জন্যে কাকে ধরতে হবে।

কারখানা-শিল্পের কলাকৌশল রুশদের বেশী সংখ্যায় আয়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস-চেষ্টা কমল; কারণ, সেগুলো আরো সহজে ধরা পড়তে লাগল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের দরুণ ইঞ্জিনিয়ারদেরও আনুগত্য পাওয়া গেল। ১৯৩১ সালে স্তালিন ঘোষণা করলেন যে, ইঞ্জিনিয়ার আর টেক্‌নিসিয়ানরা আগে সন্দেহ-ভাজন ছিল, এখন তারা "সোবিয়েৎ সরকারের দিকে ঝুঁকছে", শ্রমিকদের উচিত তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। 'ধ্বংস-চেষ্টার হিড়িক' এইভাবে কেটে গেল, কিন্তু বিদেশী চরদের দ্বারা প্ররোচিত গভীরতর ধ্বংস-চেষ্টা আগেকার মতই রইল। ১৯৩১-'৩৪ সাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে আদালতে মামলা উঠলে, তার জন্যে ক্রমেই অধিকতর লঘুভাবে শাস্তি দেওয়া হত। দেশের অর্থনীতি তখন উন্নতির মুখে চলেছে, স্বল্পসংখ্যক ধ্বংসপ্রয়াসীকে বিশেষ ভয় করা হত না। আগে যারা ধ্বংস-চেষ্টা করেছিল, তাদের বেশীর ভাগ রাজনৈতিক পুলিসের

নজরবন্দী থেকে, নিজ নিজ পেশা মত কোনো-না-কোনো গঠনের কাজ করার দণ্ডাদেশ পায়। এই সময় তাদের স্বাভাবিক কাজেকর্মে ফিরে আসতে দেওয়া হয়; শাস্তি-খাটার সময়ের কাজের জন্যে তাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অর্ডার অব্ লেনিন' দিয়ে সম্মানিত করাও হয়।

রাজনৈতিক পুলিস তখনো ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে তার সার্থকতা প্রমাণ করছিল; কিন্তু দণ্ডাদেশ হ্রাস পাচ্ছিল। ১৯২৮ সালে, সাখ্তা মামলায় ৫২ জন ইঞ্জিনিয়ার আর টেক্নিসিয়ানকে খনি ধ্বংস করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়; তাদের ৫ জনের প্রাণদণ্ড কার্যতঃ হয়েও যায়। দু' বছর পরে, ইনডাস্ট্রিয়াল পার্টির মামলায় ঐ রকমেরই অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ডের আদেশ আইন-মাফিক দিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু অপরাধীরা 'অনুতপ্ত দেখে' তাদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হল। যারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিল শীঘ্রই তারা আবার ভালো ভালো কাজে বহাল হল। ১৯৩১ সালে যেসব 'মেনশেভিক কয়েকটি বিদেশী রাষ্ট্রের যোগসাজসে চাষীদের বিদ্রোহ উস্কিয়েছিল', তাদের শুধু কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। বলা হল, তারা এখন আর এত বিপজ্জনক নয় যে তাদের মেরে ফেলতে হবে।

আত্মশক্তিতে দেশের বিশ্বাস বাড়ছিল বলে শাস্তিদান ব্যাপারে কঠোরতা কমে আসছিল। ১৯৩১ সালে জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা প্রবল ছিল। কিন্তু জাপান যখন সাইবেরিয়ার সীমান্তে এসেও আক্রমণ করল না, তখন সে ভয় কমল। হিটলার অবশ্য সোবিয়েৎ উক্রাইনের উপর দাবি জানাচ্ছিলেন, কিন্তু সে সময় খুব কম লোকেই বিশ্বাস করত যে, হিটলার টিকে যাবেন। লিৎভিনভ সফলতার সহিত প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করছিলেন তখন; মনে হচ্ছিল, সোবিয়েৎ দেশ যে যুদ্ধের ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত, সেটা হয়তো এড়ানো যাবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হলে, আমরা আগের পরিচ্ছেদে যে স্বস্তিভাবের কথা বলেছি সেটার জন্ম হল। বিশেষ করে, ১৯৩৩ সালের ফসলের পর,

সোবিয়েতের জনসাধারণ নিজেদের ক্রমবর্ধমান শক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত বোধ করল।

১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে সার্জাই কিরভ গুপ্তভাবে নিহত হওয়ায় এই নিরাপত্তার স্বপ্ন চুরমার হয়ে গেল। লেনিনগ্রাদের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক কিরভ ছিলেন স্তালিনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী। কিরভকে হত্যা করেছিল একজন কমিউনিস্ট, পার্টির কার্ড দেখিয়ে সে পার্টির সদর দপ্তরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল। কোনো কমিউনিস্ট তার নেতাদের এত ঘৃণা করতে পারল যে, তার খুন করতে বাধল না, এ ভেবে সারা দেশ শিউরে উঠল। লোকের বিস্ময় আরো বাড়ল, যখন শোনা গেল, কিরভকে যারা রক্ষা করছে বলে মনে হচ্ছিল সেই রাজনৈতিক পুলিসের কর্মচারীরা এই হত্যা ব্যাপারে জড়িত; যখন অনুসন্ধানের ফলে জানা গেল যে, এর সঙ্গে কোনো বাল্টিক রাজ্যের মারফত জার্মানির মত কয়েকটা বৈদেশিক রাষ্ট্রের যোগ রয়েছে। তারপর দেড় বছর ধরে অনুসন্ধান চলল, অধিকাংশ লোকে তখন কিরভকে ভুলে বসে আছে। তারপর, হঠাৎ ঘোষণা করা হল যে, উচ্চতর পর্যায়ের কমিউনিস্টরাও জড়িত। সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের ফৌজদারী সংক্রান্ত উকিল পার্টির তথাকথিত 'লেনিনগ্রাদ কেন্দ্রকে' বিচারের জন্যে হাজির করলেন। ১৯৩৬ সালের ১৬ই আগস্ট জিনোভিয়েভ, কামেনেভ প্রভৃতির বিচার শুরু হল। তাঁরা অপরাধী সাব্যস্ত হলেন, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। তারপর আরো কয়েকটি মামলা হল—তাদের কোনোটার ব্যাপকতা জাতীয়, কোনোটা বা স্থানীয়। তার পরিণতি স্বরূপ, ১৯৩৮ সালের ১১ই জুলাই সোবিয়েৎ বাহিনীর আটজন নেতৃস্থানীয় সেনাপতির সামরিক আদালতে বিচার হল, রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হল। একটার পর একটা এতগুলো চাঞ্চল্যকর রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা ইতিহাসে আর দেখা যায় না।

সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর শুনানি হত একটা প্রকাণ্ড হল-ঘরে। সেখানে ঢুকতে দেওয়া হত সোবিয়েৎ ও বৈদেশিক সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিদের, বৈদেশিক কূটনীতি বিভাগের কর্মচারীদের, আর

দলের পর দল, কারখানা ও সরকারী দপ্তরের প্রতিনিধিদের। আদালতে বসে বসে আমি আদ্যোপান্ত কাহিনীর ক্রম-প্রকাশ লক্ষ্য করেছিলাম। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ একদা এঁরা লেনিনের বন্ধু ছিলেন, মার্ক্স্‌বাদের বড় পণ্ডিত ছিলেন—বিচারকদের, মামলার শ্রোতাদের এবং বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকার করলেন যে, স্তালিনের উত্থানের ফলে শক্তিচ্যুত হয়ে তাঁরা কয়েকজন নেতাকে—সম্ভবতঃ এই নেতাদের মধ্যে স্তালিনও একজন—গুপ্তভাবে হত্যা করিয়ে নিজেরা রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করার চক্রান্ত করেন। স্থির হয়, নেতাদের হত্যা করা হবে লোক লাগিয়ে, যারা ধরা পড়লেও উপরওয়ালা চক্রান্ত-কারীদের পরিচয় জানবে না, যাদের জার্মান গোয়েন্দা পুলিসের—গেস্টাপোদের সাধারণ চর বলে সকলেই মনে করবে। হত্যালীলা শেষ হলে, প্রধান চক্রান্তকারীরা তাঁদের পূর্বতন খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রেখে, জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার জন্যে 'দলগত ঐক্য' দাবি করবেন। আর বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাঁরা সবচেয়ে বড় বড় পদগুলো দখল করে নেবেন। ঠিক হয়, চক্রান্তকারীদের অন্যতম, বাকায়েভ, রাজনৈতিক পুলিসের কর্তা হয়ে আসল হত্যাকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, যাতে উপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে কোনো রকম সাক্ষ্য প্রমাণ কোথাও না থাকে।

দিনের পর দিন আদালতে বসে এই কাহিনী ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে আসতে দেখেছি আমি। আসামীরা মুখর ছিলেন; তাদের উপর কোনো রকম উৎপীড়ন হওয়ার কোনো চিহ্ন দেখা যায়নি। কামেনেভ বললেন, "১৯৩২ সাল নাগাদ দেখা গেল যে, জনসাধারণ স্তালিনের নীতি গ্রহণ করেছে, রাজনৈতিক পন্থায় স্তালিনকে উৎখাত করা আর সম্ভব নয়; উৎখাত করতে হবে 'ব্যক্তিগত আতঙ্কের' দ্বারা।" তিনি বললেন, "নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অসীম তিক্ততার বশে এবং যে শক্তি একদা আমাদের প্রায় হাতের মধ্যে এসে গিয়েছিল সেই শক্তির লোভে, আমরা এ পথে চালিত হয়েছিলাম।" জিনোভিয়েভ আদালতে বললেন, বহু লোকের উপর হুকুম করতে তিনি এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন

যে, তা না করতে পারায় তাঁর পক্ষে জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। এ চক্রান্তের ছোটখাট কর্মকর্তারা এই দলের সঙ্গে গেস্টাপোর যোগাযোগের সাক্ষ্যপ্রমাণ দিল। এদের একজন—তার নাম এন. লুরিয়ে—দাবি করল যে, সে "হিমলারের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ফ্রাঙ্ক ভাইৎজের পরিচালনায় কাজ করেছে।" ছোটখাট আসামীদের কয়েকজন আদালতে এসেই যেন প্রথম জানল, কর্তারা তাদের জন্যে কোন্ ভাগ্যের বিধান করেছিলেন ; এই কারণেই নেতাদের আক্রমণ করার সময় তাদের মনের জ্বালা তীব্রতর হয়েছিল।

আসামী রাইন গোল্ড তার সহ-আসামী কামেনেভের বিরুদ্ধে চীৎকার করে জানাল, "ওর অত ভালো মানুষ সেজে আর কাজ নেই। মৃতদেহের পাহাড় ভেঙেও ও শক্তি দখল করতে ছুটত।"

কাহিনীটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? সোবিয়েৎ দেশের বাইরে সংবাদপত্রগুলোতে বলল, এটা বানানো। আদালত ঘরে যারাই বসেছিল—তাদের মধ্যে বৈদেশিক সংবাদ-দাতারাও ছিল—তাদের মতে কাহিনী সত্যি। রাষ্ট্রদূত ডেভিস্ তাঁর 'মিশন টু মস্কো' বইয়ে বলেছেন, তাঁর বিশ্বাস যে আসামীদের যেসব অপরাধে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, সে সব অপরাধে তারা অপরাধী। বিখ্যাত আইনজীবী—ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য, ডি. এন. প্রিটেরও ঐরূপ বিশ্বাস হয়েছিল। 'ইন্স্টিট্যুট অব প্যাসিফিক্ রিলেসন্স'-এর সাধারণ সম্পাদক এডোয়ার্ড সি. কার্টার লিখেছিলেন, "ক্রেমলিনের মামলা ভয়াবহ রকম সত্যি। এর মানে বোঝা যায়...এটা বিশ্বাসযোগ্য।" ঐ সময়কার অত্যাচারগুলোর উপর ব্যাপক আক্রমণ করতে গিয়ে খ্রুশ্চেভও বলেননি যে, প্রকাশ্য মামলাগুলোর কোনোটা ভুয়ো।

আমি আসামীদের বক্তব্য শুনেছি—প্রায়ই কয়েক ফুট মাত্র দূর থেকে শুনেছি ; আমার কাছে, বিপ্লবী নেতারা কোন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়ায় সেটা সুবোধ্য মনে হল। বাইরের সাহায্য না পেলে রুশরা সমাজতন্ত্র গড়তে পারবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নিয়ে নেতাদের পতন শুরু হল। ১৯২৪-২৭ সালে এ সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা

চলেছিল। তাঁদের সন্দেহ আরো গভীর হল যখন তাঁরা তাঁদের পরিচিত জার্মানদের পাকা সংগঠনের সঙ্গে রুশিয়ার আনাড়িপনার তুলনা করলেন—যে আনাড়িপনার দরুণ ১৯৩২ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত ঘটল। একথা কি বিশ্বাস করা শক্ত যে, লোহা বসানো বুটের তলে চাপ দিয়ে তৈরি করা জার্মান নিয়মানুবর্তিতা পেলে রুশিয়া লাভবান হবে? সে সময় বহু লোকে বিরক্ত হয়ে এ রকমই মন্তব্য করত।* শেষ পর্যন্ত জার্মান-ঢঙের একটা বিপ্লব হবেই; তাঁরা নিজেরা ভেতরে থেকে সেটা এগিয়ে দিতে পারবেন। ইত্যবসরে ঘৃণিত স্তালিনটার হাত থেকে তাঁরা নিস্তার পাবেন।

প্রথম দিকের এই মামলাগুলোকে একবার যদি সত্যি বলে মেনে নেওয়া যায়,—পাকা বৈদেশিক পর্যবেক্ষকরা ওগুলোকে সত্যি বলেই মনে করতেন—তা হলে বুঝতে হবে, অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছিল যে, সে অবস্থায় কোনো জাতিই মাথা ঠিক রাখতে পারত না। রুশরা কেবল শত্রুভাবাপন্ন ধনিকতন্ত্রী দেশগুলোর দ্বারাই পরিবেষ্টিত ছিল না, তাদের বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও তাদের চররা গভীর ভাবে অনুপ্রবেশ করে গুপ্তহত্যা ও সরকারকে উচ্ছেদ করার চক্রান্ত করছিল। জিনোভিয়েভ ও কামেনেভ দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর গ্রেপ্তার আর বিচারের ধুম পড়ে গেল। আসামীদের একজন আদালতে দাঁড়িয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি টম্‌স্কির নাম উল্লেখ করলে, টম্‌স্কি দোষ স্বীকার করে গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে আত্মহত্যা করলেন। ককেশাসে, মধ্য এশিয়ায়, সুদূর প্রাচীতে আঞ্চলিক মামলা শুরু হল। সুদূর প্রাচ্য রুশিয়ার রাজনৈতিক

---

* ককেশাসে একজন সরকারী কর্মচারীকে উদ্দেশ করে কোনো একজন ক্রুদ্ধা চাষী মেয়েকে বলতে শুনেছিঃ "আসুক ইংরেজরা, আসুক জার্মানরা। যারা হয় আসুক, এসে এই হতভাগা দেশে একটা শৃঙ্খলা আনুক।" মেয়েটিকে গ্রেপ্তার করা হয়নি; বরঞ্চ সরকারী কর্মচারী তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করেন। শহরের কোনো বুদ্ধিজীবী ঐ কথা বললে তাকে হয়তো গ্রেপ্তার করা হত।

—আ. লু. স্ট্রং

পুলিসের বড় কর্তা জাপানে পালালেন; তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের অনেকেই জাপানের চর বলে গ্রেপ্তার হল।

এরপর সৈন্যবাহিনীকেও জড়িত দেখা গেল। সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের বড় কর্তা মার্শাল গামারনিক্ ১৯৩৭ সালের ১লা জুন তারিখে আত্মহত্যা করলেন। ১১ই জুলাই তারিখে সাত জন উচ্চপদস্থ সামরিক অধিনায়কসহ মার্শাল তুকাচেভ্স্কীর সামরিক বিচার হল; —মাত্র কিছুকাল আগেই তুকাচেভ্স্কী ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপমন্ত্রী। এইটাই হল প্রথম বড় মামলা যার বিচার হল গোপনে। বিচারের পর ঘোষণা করা হল যে, আসামীরা হিটলারের কাছে টাকা খাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; হিটলারের কাছে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁকে উক্রাইন দখল করতে সাহায্য করবেন। তাঁরা মৃত্যুদণ্ড পেলেন। রুশিয়ার বাইরে থেকে তাঁদের দোষের কিছুটা প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৮ই জুন তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্স্-এর প্রাহাস্থ সংবাদ-দাতা জি. ই. আর. গেডিয়ে তার করেন, "প্রাহার উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদের হু'জন" তাঁকে বলেছেন যে তাঁরা নিশ্চিত ভাবে জানেন, র‍্যাপ্যালো সন্ধির সময় থেকেই জার্মান সেনাপতি মণ্ডলীর সঙ্গে কয়েকজন উচ্চপদস্থ রুশ সেনাপতির গোপন যোগাযোগ চলে আসছিল।" উত্তরকালে আমি নিজে চেক সরকারের কর্মচারীদের মুখে শুনেছি: তাঁদের সামরিক লোকরাই প্রথম জানতে পারে এবং মস্কোকে জানিয়ে দেয় যে, চেকোস্লোভাকিয়ার যেসব সামরিক গোপন তথ্য পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি মারফত কেবল রুশরাই জানত, সেগুলো মার্শাল তুকাচেভ্স্কী জার্মানির সামরিক কর্তাদের কাছে ফাঁস করে দিচ্ছেন।

বোধ হয়, সোবিয়েৎ নাগরিকরা সব চেয়ে বেশী চমকে উঠল, যখন ষড়যন্ত্র মামলাগুলোর প্রসঙ্গে রাজনৈতিক পুলিসের বড় কর্তা যাগোদা স্বয়ং জালে পড়লেন। তাঁকে যখন দেশদ্রোহী বলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল, রাজনৈতিক পুলিসের বহু কর্মচারীকে যখন "নির্দোষ নাগরিকদের গ্রেপ্তার" এবং "স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে অন্যায় উপায় অবলম্বনের"

দায়ে জেলে ভরা হল, তখন সরকারের অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সন্দেহ ছড়ানো হতে লাগল। কে দোষী? কে নির্দোষ? কে কাকে গ্রেপ্তার করছে?

সোবিয়েৎ জনগণের মধ্যে একটা অ নিরাপত্তার ভাব ছড়িয়ে পড়ল; ১৯৩৪ সালে তাদের ভেতরে যে প্রগতির উল্লাস দেখা যেত সেটা আর রইল না। নিজে গ্রেপ্তার হওয়ার ভয় বা বন্ধুদের সম্পর্কে উদ্বেগ—একমাত্র, এমন কি, প্রধান কারণ হিসেবে এর জন্যেই লোকের মনোভাব বদলায়নি। বদলেছিল এই ভেবে যে, প্রধান নেতাদের মধ্যেও শত্রুরা সিঁধোতে পেরেছে; কে বিশ্বস্ত, কে নয়, বোঝার উপায় নেই। হিটলারের পঞ্চমবাহিনীর মারাত্মক দক্ষতার সঙ্গে এর আগে কোনো জাতিকে লড়তে হয়নি। রুশরা অনুভব করল, এটা তাদের জাতির বেঁচে থাকার লড়াই—এ লড়াই চলছে অন্ধকারে! এ লড়াইএর এই দুঃস্বপ্নের মত ভাব শুধু জনসাধারণকে পেয়ে বসল না; আমার মনে হয়, স্তালিনও এ ভাবকে এড়াতে পারলেন না। তিনি একটা তত্ত্ব প্রচার করলেন যে, দেশ যত সমাজতন্ত্রের নিকটবর্তী হবে, তার শত্রুসংখ্যাও তত বাড়বে।

যাদের প্রকাশ্য বিচার হল, তারাই যে শুধু বলি পড়ল এমন নয়। সোবিয়েৎ নাগরিকরা ঐ কয় বছরকে, বিশেষ করে ১৯ ১ সালটিকে, একটা তীব্র মানসিক যন্ত্রণার সময় বলে স্মরণ করে—যে যন্ত্রণা জন্মেছিল বহু গ্রেপ্তারের কোনো কারণ না খুঁজে পেয়ে; সেগুলোর দরুণ সর্বত্র একটা সন্দেহের ভাব ছড়িয়ে পড়ায়। হঠাৎ রাত্রে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল, তারপর থেকে তাদের আর দেখা পাওয়া গেল না। কখনো কখনো তারা ফিরে আসত। জর্জ আন্দ্রেচিনকে দু'বার সাইবেরিয়াতে পাঠানো হয়, দু'বারই সে আগের চেয়ে ভালো কাজ পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। এ ভাবে যারা গ্রেপ্তার ত, তাদের বেশীর ভাগকেই মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে কোনো কয়েদী-খাটানো শিবিরে, বা সুদূর কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া হত। বন্ধুদের কি হল, সে খবর পাওয়ার জন্যে নয়, না-পাওয়ার ফলেই 'সন্ত্রাস-ভাবে'র সৃষ্টি হয়েছিল।

আমার ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী দশ বছরের দণ্ডাদেশে নির্বাসিত হয়েছিলেন। বিয়ের আগে তিনি কয়েক বছর আমার সঙ্গেই বাস করতেন, বিয়ের পর চলে যান লেনিনগ্রাদে। ন' বছর পরে মস্কোতে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হলে তাঁর কাছে বৃত্তান্তটা শুনলাম। তাঁর স্বামীকে আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল; তাঁর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল, তা আমার বান্ধবী কোনো দিন জানতে পারেননি। স্বামীকে নির্দোষ ভেবে, আমরা বান্ধবীটি রাজনৈতিক পুলিসের দপ্তরে গিয়ে গোলমাল বাধাতেন, ফলে তাঁকেও 'লোক-শত্রুর স্ত্রী বলে' গ্রেপ্তার করে তারা। তাঁকে পাঠানো হল কোনো শিবিরে নয়, কাজাকস্তানের একটা ছোট শহরে; সেখানকার উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ পেলেন। মাসে একবার তাঁকে স্থানীয় একজন রাজনৈতিক পুলিসের কর্মচারীর কাছে হাজিরা দিতে হত। কর্মচারীটি বেশ বুদ্ধিমান, তাঁর সঙ্গে আমার বান্ধবীর "অনেক কৌতুকর আলোচনা" হত। কয়েকবারই কর্মচারীটি বান্ধবীর কাছে তাঁর নিজের এবং অন্যদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছেন।

একবার আমার বান্ধবী এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "আমার তো মনে হয়, নাৎসী পঞ্চমবাহিনীর লোক রাজনৈতিক পুলিসের মধ্যে ঢুকে বড় বড় পদে জেঁকে বসেছে; তারাই, যাদের গ্রেপ্তার করা উচিত নয়, তাদিকে গ্রেপ্তার করছে।" প্রশ্নকারী তার জবাবে বললেন: "অনেকেই এমনি মনে করে বটে।" তিনি বললেন না, এই 'অনেকে' কোন্ ধরনের লোক, তিনি নিজেও এই 'অনেকের' মধ্যে আছেন কি না।

ঐ মত যদি ঠিক হয়, তবে তার দ্বারা খ্রুশ্চেভ উদ্ঘাটিত সবচেয়ে সাংঘাতিক যে ঘটনা তারও একটি আংশিক ব্যাখ্যা করা যায়; খ্রুশ্চেভ উদ্ঘাটিত ঐ সাংঘাতিক ঘটনা হচ্ছে এই যে, ১৯৩৪ সালের পার্টি কংগ্রেসের মোট ১৯৬৬ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১১০৮ জনকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়, ঐ কংগ্রেস যে ১৩৪ জনকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচন করেন, তাদের মধ্যে ৯৮ জনকে অর্থাৎ শতকরা ৭০ জনকে শুধু গ্রেপ্তার করা হয়নি, গুলি করে মারাও হয়েছিল।

যাঁরা এই ঘটনার জন্যে স্তালিনের উদ্দাম বাতিককে দায়ী করতে চান, তাঁরা কি বোঝাতে পারেন, এই বাতিকগ্রস্ত লোকটি তাঁর সবচেয়ে কৃতী ও অনুগত সমর্থকদেরই একেবারে খতম করলেন কেন? ১৯৩৪ সালের 'বিজয় কংগ্রেস' তো গঠিত হয়েছিল যারা স্তালিনের পন্থায় বরাবর চলছিল ঠিক তাদেরই দিয়ে, যারা শিল্প ও কৃষিকর্মে সমাজতন্ত্রের জয়োৎসব করছিল ঠিক তাদেরই দিয়ে। তিন বছরের মধ্যে তাদের শেষ করে ফেলার এই ব্যাপারটা অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, যদি এটাকে নাৎসী পঞ্চমবাহিনী কর্তৃক জাতির সবচেয়ে কর্মদক্ষ দেশপ্রেমিকদের উচ্ছেদ করার সার্থক চেষ্টা হিসেবে দেখা যায়।

আমি যেসব মামলার কথা নিজে জানি তা থেকে এই মতেরই সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রায়ই 'ভুল লোককে', বিশৃঙ্খলা আনবার উদ্দেশ্যেই যেন বাছাই করে গ্রেপ্তার করা হত। আমাদের 'মস্কো নিউজের' কর্মীদের ৩ জনকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করা হল। আমাকে যদি সব চেয়ে কাজের, সব চেয়ে উৎসাহী কর্মী বাছতে বলা হত, আমি এদেরই বাছতাম। ওরা পার্টির সদস্য ছিল; সর্বদাই তারা আমাদের কাগজের জন্যে, ট্রেড ইউনিয়নের জন্যে কঠোর পরিশ্রম করত; ঠেকার সময় রাতের পর রাত কাজ করতেও পরান্মুখ ছিল না তারা। তবু আমাদের কাগজের কর্মীদের কাছে থেকে আশা করা হল যে, তারা ট্রেড ইউনিয়নের সভায় গিয়ে "ধ্বংসকারীদের সরানোর জন্যে সরকারকে ধন্যবাদ" জানাবে। আমি যেতে রাজী হলাম না, বরং প্রধান সম্পাদকের কাছে গিয়ে এ সম্পর্কে প্রতিবাদ জানালাম।

তিনি মেনে নিলেন যে, বহু নির্দোষ লোকেরও বলি-পড়া অসম্ভব নয়। তিনি বললেন, "ওদের ডেপুটিদের কাছে যাক ওরা, এর একটা বিহিত করতে। উচ্চতম সোবিয়েতের ডেপুটিরা এ ধরনের বহু অভিযোগ নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নির্দোষিতা সম্বন্ধে যারা সজাগ, তার জন্যে যারা লড়বে, তারা শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে।" এ কথা সত্যি যে, সমস্ত ডেপুটিই নিজ নিজ এলাকার লোকদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদ্বির করছিলেন। আমার মহল্লার ডেপুটি, বিখ্যাত অভিনেতা

কোচালভ আমাকে বলেছিলেন যে, সে বছর তাঁর কাজের সব চেয়ে বেশীর ভাগই ছিল এই সব প্রতিকার-আবেদন সম্পর্কে। কিন্তু এ কথা সত্যি নয় যে, নির্দোষরা সব সময়েই ফিরে আসত। হাজার হাজার নির্দোষ লোক নির্বাসনে মারা গিয়েছিল।

এখন দেখা যাক, পার্টির উচ্চতর মহলে কি ঘটছিল ; ১৯৫৬ সালে খ্রুশ্চেভ স্তালিনকে আক্রমণ করতে গিয়ে সে কথা উদ্ঘাটন করেছেন। খ্রুশ্চেভও বলেছেন যে, "অত্যাচার আরম্ভ হয় সার্জাই এন. কিরভের অপরাধমূলক হত্যার পর" ১৯৩৫-৩৮ সাল থেকে। তিনি বলেছেন, "ঠিক এই সময়েই সরকারী শাসনযন্ত্র মারফত ব্যাপক উৎপীড়নের প্রথা জন্ম নেয়—প্রথমে শত্রুদের বিরুদ্ধে এবং পরে অনেক সৎ কমিউনিস্টেরও বিরুদ্ধে।" খ্রুশ্চেভ প্রকাশ করে দিয়েছেন যে, কিরভ-হত্যার পরে পরেই স্তালিনের উদ্যোগে, আদালতগুলোকে অপরাধ সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিচার ও শাস্তি-ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। সে সময় যাগোদা ছিলেন রাজনৈতিক পুলিসের বড় কর্তা। স্তালিন তাঁকে অতি বেশী ঢিলা দেখে, ১৯৩৬ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর সোচি থেকে তার করলেন যে, যেহেতু যাগোদা অপটুতা দেখাচ্ছে, য়েঝভকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের-ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করা হোক। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশনে য়েঝভের নিয়োগ ও তাঁর কাজের ছক অনুমোদিত হল। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে গেল। খ্রুশ্চেভ বলেছেন, ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৭ সালের মধ্যে গ্রেপ্তার দশগুণ বেড়েছিল। ঐ সময় স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে আসামীদের উৎপীড়ন করা হত ; স্তালিন তাতে সমর্থন জানান। আগে সোবিয়েৎ নাগরিকরা গর্ব করত যে, তাদের কারাগারে নাৎসীদের মত যন্ত্রণা দেওয়ার রেওয়াজ নাই ; এমনকি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত 'থার্ড ডিগ্রি'রও কোনো ব্যবস্থা নাই।

১৯৩৭ সালে, উৎপীড়নে কোটালে বান ডেকেছিল। হঠাৎ য়েঝভ অদৃশ্য হলেন ; গুজব রটল, তাঁকে পাগলা-গারদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ১৯৩৮ সালের প্রথম দিকে, পার্টির একটা নতুন প্রস্তাব গৃহীত হল।

পাগলামির জোয়ার কমতে লাগল। স্তালিনের সময়েও, এটাকে পাগলামি বলে স্বীকার করে নেওয়া হল। চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি, আমি রাজনৈতিক পুলিসের একজন পদস্থ লোককে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম, ১৯৩৭ সালের একটা মামলার পুনর্বিচার হতে পারে কি না? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "১৯৩৭ সালের যে কোনো মামলার পুনর্বিচার হতে পারে।" স্তালিনের মৃত্যুর পর পর্যন্ত, হাজার হাজার মামলার কিন্তু পুনর্বিচার হয়নি।

১৯৩৭ সালে নির্দোষ লোকদের উপর এই যে জঘন্য পীড়ন হয়েছিল, তার জন্যে দোষ নির্দেশ করতে গিয়ে খ্রুশ্চেভ কয়েকটা কথা বলেছেন: "১৯৩৭ সালের অমানুষিক কার্যাবলীর জন্যে আমরা য়েঝভকে ন্যায়-সঙ্গতভাবেই দোষী বলছি।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বলেছেন যে, কোনোরকম শুনানির আগেই যে লোকগুলোর দণ্ড ঠিক হয়ে যেত, য়েঝভ তাদেরই একটা তালিকা তৈরি করতেন; সে তালিকাটা য়েঝভ স্তালিনের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাতেন; স্তালিনের মত না থাকলে য়েঝভ কয়েকজন বড় বড় লোককে শাস্তি দিতে পারতেন কি না সন্দেহ। খ্রুশ্চেভ বলছেন, "স্তালিনের মন ছিল অত্যন্ত সন্দিগ্ধ, তাঁর সন্দেহ করার রোগ ছিল।" ঠিক যা ঘটেছিল তার সারসংক্ষেপটা গুরুত্বপূর্ণ:

> "আমরা যত সমাজতন্ত্রের নিকটবর্তী হব, আমাদের শত্রুদের সংখ্যাও তত বাড়বে—স্তালিনের এই নীতিটা কাজে লাগিয়ে এবং য়েঝভের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণ অধিবেশন ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেটা ব্যবহার করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপ্রবিষ্ট শত্রু-পক্ষের **উস্কানিদাতারা** এবং **নীতিবিবর্জিত পদোন্নতিলোভীরা** পার্টির নামের আড়ালে ঐ ব্যাপক উৎপীড়নকে প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে।"

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা, স্বেচ্ছাচারী স্তালিনের শত্রুনিধনের মত, অত সোজা নয়। ব্যাপারটা জটিল, এর পিছনে বহু দলের কার্যকলাপ এসে মিলেছিল। স্তালিনের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে,

তিনি 'সন্দিগ্ধ, সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত' হওয়ার দরুণ য়েঝভকে নিয়োগ করেছিলেন, তাঁকে অনুসন্ধান ও দণ্ডাদেশ ত্বরান্বিত করতে হুকুম দিয়েছিলেন, আর সমাজতন্ত্র যত নিকটবর্তী হবে, শত্রুসংখ্যা তত বাড়বে—এই তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন। স্তালিনের তখনকার মনের অবস্থা একটুও অস্বাভাবিক নয়, যাঁর নিকট বন্ধুকে গোপনে হত্যা করা হয়েছে, যিনি নিজের গুপ্তহত্যার চক্রান্তের কথা প্রকাশ্য আদালতে শুনেছেন, তাঁর মনের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। য়েঝভের হুকুম মতই কাজ হত ; পরে দেখা গেল যে তিনি পাগল। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি স্তালিনের যুক্তি এবং য়েঝভের রিপোর্টের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঐ কাজগুলো অনুমোদন করত। খ্রুশ্চেভ ঠিকই বলেছেন, কলকাঠি আসলে ছিল শত্রুপক্ষের অর্থাৎ নাৎসী ফাসিজিমের দালালদের আর নীতিবিবর্জিত পদোন্নতিকামীদের অর্থাৎ নিজেদের চাকরীর উন্নতির জন্যে যারা নিজেদের মস্তিষ্ক থেকে ষড়যন্ত্র তৈরি করত, তাদের হাতে।

খ্রুশ্চেভের এই বিশ্লেষণ আমার নির্বাসিত বিপ্লবী বান্ধবীর বিশ্লেষণ থেকে বিশেষ তফাৎ নয়। তিনিও বলেছিলেন যে, নাৎসী পঞ্চমবাহিনীর লোকেরা "রাজনৈতিক পুলিসের বড় বড় পদে বসে ভুল লোকদের গ্রেপ্তার করছিল।" আমি এই সময়কার কাণ্ডগুলোকে 'প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততা' বলেছি, কারণ ঐ কাণ্ডকারখানাগুলোতে সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় ছিল না, কিন্তু বহু লোকই এর মধ্যে অংশগ্রহণ করেছিল, আর ব্যাপারটা আজও পুরোপুরি বোঝা যায়নি। যে সোবিয়েৎ অনুসন্ধানকারীরা মামলাগুলো পুনর্বিবেচনা করছেন তাঁরা হয়তো শেষ পর্যন্ত ব্যাপারের হদিস পাবেন। খুব সম্ভব তাঁরা দেখতে পাবেন যে, এ ব্যাপারের মূলে রয়েছে : রাজনৈতিক পুলিসের মধ্যে নাৎসী পঞ্চবাহিনীর বাস্তব ও ব্যাপক অনুপ্রবেশ, বহু বাস্তব ষড়যন্ত্র, আর যে অতিসন্দিগ্ধ মানুষ নিজের জীবনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হতে দেখেছেন এবং যিনি নিরঙ্কুশ বিতাড়নের দ্বারা বিপ্লবকে বাঁচাচ্ছেন বলে বিশ্বাস করতেন, সেই মানুষটির (স্তালিনের) উপর পঞ্চমবাহিনীর ঐরূপ অনুপ্রবেশ ও ঐ সব বাস্তব ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া।

১৯৩৭ সাল বা তার আগে-পিছে সময়েই শুধু সোবিয়েৎ ইউনিয়নে স্তালিন যুগের অন্যায় গ্রেপ্তার আর মৃত্যুদণ্ড ঘটেছে—এ কথা মনে করলে ঠিক হবে না। কম সংখ্যাতে হলেও এ জিনিস ঘটেছে বিপ্লবের প্রথম দিক থেকে শুরু করে স্তালিনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত। স্তালিনের জীবনের শেষ দিকে, সোবিয়েৎ নেতাদের স্বাস্থ্যনাশের চক্রান্ত করার দায়ে কয়েকজন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়, সম্ভবতঃ উৎপীড়নের চোটে তাঁরা তাঁদের দোষ স্বীকারও করেন। কিন্তু উত্তর কালে তাঁরা নির্দোষ প্রমাণিত হন। স্তালিন যুগের সব চেয়ে বড় অমঙ্গলের জিনিস ছিল রাজনৈতিক পুলিসের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার। তার আবিষ্কারক স্তালিন নন; জারের যুগে তার উৎপত্তি হয়েছিল, লেনিনের আমলের 'আতঙ্কে'র মধ্যে হয়েছিল তার পুষ্টি। ভালো ভালো কমিউনিস্টরা সকলেই বলতেন যে, বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্যে একটি বিশেষ, সাধারণ আইনের নাগালমুক্ত, দৃঢ় বাহুর প্রয়োজন আছে। মার্কিন ও ফরাসী বিপ্লবসহ অন্যান্য বিপ্লবেও এরকম আতঙ্ক দেখা গিয়েছিল। তবে, একটা রাজনৈতিক পুলিস সৃষ্টি করা যত সহজ, লোপ করা তত সহজ নয়। শাসকরা দেখেন এটা দিয়ে বেশ কাজ হয়, এটা দিয়ে বিরুদ্ধ মতের লোকদের সংযত রাখা যায়। সুতরাং ১৯২২ সালে, রাজনৈতিক পুলিসকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অধীনে দেওয়ার প্রস্তাব উঠলে স্তালিন সেটাকে নিয়ন্ত্রণের একটা অস্ত্র হিসেবে কেন্দ্রের হাতে রাখার সিদ্ধান্ত করেন। আমার সোবিয়েৎ দেশে থাকা কালে, তিন বার পুলিসের শক্তি সীমিত করার এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে সাধারণ আইনের অধীনে আনার সিদ্ধান্ত হয়; প্রতিবারই শুধু নামই বদলায়, পুরানো কর্তৃত্ব বজায় থাকে। এ রকম পুলিস রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে দাঁড়ায়; তার স্থিত স্বার্থ থাকে 'চক্রান্ত' আবিষ্কার করায়; কয়েকটা চক্রান্ত প্রকৃতপক্ষে থাকেও। এ রকম পুলিস থাকার আরো একটা বিপদও আছে; এ রকম সংস্থার সদস্য-পদ গুপ্ত হওয়ায় এটাই শত্রু-চরদের অনুপ্রবেশের প্রথম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

কোনো রকম রাজনৈতিক পুলিসের কি প্রয়োজন ছিল ? সোবিয়েতের লোকে মনে করে, তা ছিল। আমার নিজের স্বামী যখন আমার বান্ধবীর নির্বাসন দণ্ডের কথা শুনলেন, শুধু বললেন : "ঐ স্বামীটির সঙ্গে ওঁকে যে ফাঁসতে হয়েছিল, সেইটাই কাল হল।"

অন্য রুশ বন্ধুরা এর চেয়েও নিষ্ঠুর মত পোষণ করতেন। একজনের কথা আমার মনে পড়ছে ; তাঁর মত ছিল যে, রাজনৈতিক পুলিস যদি এক'শ জনকে সন্দেহ বশে ধরে, আর নিশ্চিতভাবে জানে যে তাদের মধ্যে একজন সাঙ্ঘাতিক বিশ্বাসঘাতক আছে, কিন্তু সেটা কোনজন স্থির করতে না পারে, তা হলে পুলিসের উচিত সবগুলোকে প্রাণদণ্ড দেওয়া ; ৯৯ জন নির্দোষ ব্যক্তির উচিত হচ্ছে একজন বিশ্বাসঘাতককে বেঁচে থাকতে দেওয়ার চেয়ে স্বেচ্ছায় মরতে চাওয়া।

আমাদের কাগজের তিনজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হলে আমি যখন প্রতিবাদ জানাই, আমাদের প্রধান সম্পাদক, সোবিয়েতের লোকে কেন এ সবের প্রতিবাদ করছে না, তার কারণ সম্পর্কে আরো ব্যাপক একটা বিবৃতি দেন :

"আসল ব্যাপারটা আপনি বুঝছেন না কেন ? আমাদের নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন, ১৯৩৯ সাল নাগাদ পৃথিবী ভেঙে পড়বে। মানুষ এ পর্যন্ত যত দ্বন্দ্ব দেখেছে তার মধ্যে বৃহত্তম দ্বন্দ্বটা এখনো ঘটতে বাকি আছে। ঐ দ্বন্দ্বের ফলের উপর নির্ভর করবে, দুনিয়া আবার দাসত্ব ও যুদ্ধের অন্ধকারের মধ্যে ফিরে যাবে, না মানুষ একটি সুষ্ঠুতর জগতের মধ্যে বিজয়ী হয়ে প্রবেশ করবে।

"এই দ্বন্দ্বের মধ্যে, দাঁড়াবার মত নিশ্চিত ঠাঁই কোথায় পাওয়া যাবে ? আমরা, বলশেভিকরা, মনে করি যে, শিল্প-ব্যাপারে অনুন্নত হলেও, দুনিয়ার হয়ে সভ্যতাকে বাঁচানোর দায়িত্ব এসে পড়বে এই দেশের উপর। মানুষের ধ্বংসকারিণী শক্তি দ্রুত বেড়ে চলেছে। ধনিকতন্ত্রী জগতের অর্ধেকটা মধ্যযুগের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। এর আগেও বহু সভ্যতার পতন হয়েছে। আগামী বিশ্ব-সংকটের জন্যে আমাদের কর্তব্য কি ? তার জন্যে আমাদের যথাসম্ভব শক্তি সংগ্রহ

করতে হবে ; যত বেশী সম্ভব গম নিয়ে, যত বেশী সম্ভব সুস্থ লোক নিয়ে, যত কম সম্ভব ধ্বংসকারী রেখে আমাদের তৈরী হতে হবে। আমরা সেই ভাবে প্রস্তুত হচ্ছি। দু'টো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সফল হয়ে গেলে, আমরা প্রস্তুত হতে পারব। যারা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বা বাধা জন্মায় তারা বিশ্বাসঘাতক, শুধু আমাদের সোবিয়েৎ দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক নয়, তারা সমগ্র মানব-জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতক।"

কথাগুলো কড়া ; আমাকে চুপ করিয়ে দিল। কথাগুলো বলেছিলেন মাইকেল এম. বোরোডিন্। আমি যে সময় গ্রেপ্তার হই প্রায় সেই সময়, ১৯৪৯ সালে, তিনিও গ্রেপ্তার হন এবং সুদূর প্রাচীর কোনো শিবিরে তাঁর মৃত্যু হয়।

* * *

অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোথাও কি কোনো রক্ষাকবচ আছে? পশ্চিমী দেশগুলোতে অবশ্য 'নির্দিষ্ট প্রণালী' 'বন্দীদের আদালতে হাজির করানোর অধিকার', 'জুরীর বিচারে'র মত দু'চারটে কষ্টার্জিত অধিকার আছে। এসব অধিকার ব্যয়সাপেক্ষ, গরীবদের জন্যে নয়। রুশিয়ায় এসব অধিকার কোনো কালে ছিল না। ১৯৩৬ সালে স্তালিন-সংবিধানে যেসব অধিকারের ফিরিস্তি সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল, সেটা এর চেয়েও দীর্ঘতর হলেও ঐ বছরেই ঐ সংবিধানের নির্মাতা স্বয়ং সেটা লঙ্ঘন করেন, তিনি অবশ্য—তাঁর প্রধান নিন্দুকই বলেছেন—মনে করতেন যে, এর দ্বারা তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করছেন। আমার মনে হয়, এ থেকে রুশদের মত, এই সিদ্ধান্তই করা উচিত যে, স্তালিনকে যেমন দেবতা বানানো হয়েছিল, তেমন ভাবে কাউকে দেবতা বানানো উচিত নয়। একথা সত্যি যে, তিনি যা করেছিলেন 'যথাযথ প্রণালী'র মারফত করেছিলেন, ১৯৩৭ সালের প্রচণ্ড ক্ষিপ্ততাও কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। কিন্তু এ অনুমোদন হয়েছিল সাহসিক বিরোধিতার কষ্টিপাথরে যাচাই না করে, স্তালিনের সঙ্গে যাঁরাই এ ভাবে মত দিয়েছিলেন তাঁদের সকলেই দোষী। দুনিয়ার কোথাও ন্যায় বিচার নিশ্চিত বা নিখুঁত নয়। স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার পাওয়া যায়,

চিরন্তন প্রহরারূপ মূল্য দিয়ে—শুধু ধনিকতন্ত্রের নয়, সমাজতন্ত্রে তো আরও বেশী করে। খ্রুশ্চেভের বক্তৃতার মূল্য হচ্ছে এই যে, এর ফলে রাজনৈতিক পুলিসের শক্তি আইন দ্বারা শুধু খর্ব করাই হয়নি, সোবিয়েতের লোকের মধ্যে এ সম্পর্কে একটা বিভীষিকা জাগানোও হয়েছে। অন্যায়ের সম্পর্কে সজাগ একটা জাতির এই বিভীষিকাই হচ্ছে তার নিশ্চিত রক্ষাকবচ।

'প্রচণ্ড স্বি গুতার' মধ্যে সোবিয়েতের লোকে এক ধরনের হুঁসিয়ারি শিখেছিল। রুশদের এটি শেখা দরকার ছিল। গুপ্তচর আর ধ্বংস-কারীদের সম্পর্কে 'জনসাধারণের সতর্ক হওয়া'-র আবেদন করা হত কাগজে কাগজে। "ট্রামে বসে তোমার ফ্যাক্টরীর কথা আলোচনা করো না; তোমার কথা থেকে শত্রুরা আমাদের শিল্পকারখানাগুলোর স্থান ও মূল্য নির্ণয় করে নিতে পারে।" লোকে এ ধরনের আবেদনে সাড়া দেয়, সুখী বাকপটু রুশরা বিদেশীদের কাছে সাবধানে কথা বলত। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে, কোনো মাকিন পত্রিকার জন্যে 'আমার সোবিয়েৎ কন্যা' বলে আমি যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম তার কথা; যে-প্রবন্ধে তার রাসায়নিক কারখানা সম্পর্কে আমার সৎ-মেয়ের প্রীতির কথা বর্ণনা করেছিলাম। আমার স্বামী আমাকে বললেন, প্রবন্ধে 'রাসায়নিক কারখানা' না লিখে 'বৈদ্যুতিক কারখানা' লেখা হোক। তাঁর ভয় ছিল, পাছে আমাদের বাড়ি থেকে ট্রামে-বাসে একঘণ্টার পথ দূরে একটা রাসায়নিক কারখানার অস্তিত্বের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

আর দু'টো ব্যক্তিগত কাহিনী থেকে বোঝা যাবে, এই সময়টা লোকের মনকে কি ভাবে মোচড় দিয়েছিল। একবার মে-দিবসের শোভাযাত্রার ঠিক আগে আমি শুনতে পেলাম যে, কয়েককুড়ি আমে-রিকান শোভাযাত্রা দেখার উদ্দেশ্যে মস্কো এসে, 'রেড্ স্কয়ারের'-এ কোনো মঞ্চে স্থান না পেয়ে উতলা হয়ে পড়েছেন। আমি 'ইন্টুরিস্ট'-* এর কাছে প্রস্তাব করলাম যে, তাঁরা মস্কো নিউজের কর্মচারীদের সঙ্গে

* যাঁরা দেশ-বেড়াতে এসেছে তাঁদের দেখাশোনা করার ভারপ্রাপ্ত সংস্থা।
—অনুবাদক

শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে চলতে চলতে 'রেড্ স্কোয়ার' দেখে নিতে পারেন। ইনটুরিস্টের প্রতিনিধি উত্তর দিলেন, "সে ব্যবস্থা হলে তো ভালোই হয়, কিন্তু আপনি কি এঁদের ভালো করে জানেন? এঁদের কারো সঙ্গে বোমা বা পিস্তল নেই, আপনি এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন?" ব্যস্, সমস্যার সমাধান হয়ে গেল ঐখানে। সংবাদপত্রের সমস্ত সংবাদ-দাতাই জানতেন, এই সব শোভাযাত্রার সময় স্তালিনের শরীর কত অরক্ষিত থাকত। এর আগে আমি শুনেছিলাম যে, পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর চররা প্রায়ই 'আমেরিকান পর্যটক' সেজে সোবিয়েৎ দেশে আসে। না জেনে শুনে আমার স্বদেশবাসীদের সকলের হয়েই কোনো কথা দিতে আমি পারলাম না।

সেবার গ্রীষ্মকালটা আমি মস্কো নদীর ধারে, ফিলি বলে একটা ক্ষুদ্র শহরতলীতে ছিলাম। আমি জানতাম, ওখানে একটা প্রকাণ্ড কারখানা আছে; আমি ফিলির মজুরদের হাজারে হাজারে কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখেছিলাম। কয়েক বছর পরে, জার্মানি আর রুশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধার পরে আমি নিউ ইয়র্কে বসে একটা কাগজে পড়লাম যে, আমেরিকার 'ফ্লাইং ফোর্টেসের' প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কোনো কোনো বিষয়ে তাদের চেয়েও ভাল, বিখ্যাত ছয়-মোটরের বোমারু-বিমান এই ফিলি কারখানাতেই তৈরী হত। এ সংবাদ যদি সত্যি হয় আমি জানি ফিলির প্রত্যেকটি মজুর এ সম্বন্ধে আমার মত একজন আমেরিকানের কাছে বড়াই করার জন্যে কত না ব্যাকুল ছিল। কিন্তু তারা তা করেনি।

এই নীরবতা রুশদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না, তাদের বন্ধুদের কাছেও ছিল অপ্রীতিকর। কিন্তু ঐ কয় বছর বেঁচে থাকার জন্যেই এর একটা বিশেষ মূল্য ছিল।

শেষ পর্যন্ত রুশিয়ায় যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এল, দুনিয়ার লোকে দেখল, হিটলারের যে পঞ্চমবাহিনী ইউরোপের অধিকাংশ সরকারকে উচ্ছেদ করতে পেরেছিল, রুশিয়ায় তাদের লোক নেই বললেই চলে। এ সম্বন্ধে হাওয়ার্ড কে. স্মিথ মন্তব্য করেছিলেন, "রুশিয়া যদি কয়েক হাজার আমলাতন্ত্রীকে এবং বড় বড় সরকারী কর্মচারীকে উৎখাত না

করত, তা হলে তার 'রেড্ আর্মি' দু'মাসের মধ্যেই ভেঙে পড়ত, এ সম্বন্ধে সন্দেহের বড় একটা অবকাশ নেই।"* এ মত অন্যদের; আমি এ মত পুরোপুরি পোষণ করি না। কিন্তু আমি জানি, সোবিয়েতের লোকেরা ক্ষিপ্ততার বছরগুলো সহ্য করে নিয়েছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, ঐ অবকাশে তারা মরিয়া হয়ে তাদের রক্ষাব্যবস্থা তৈরি করে নিচ্ছে; এর মধ্যেই একটা অন্ধকার-চারী অনির্দেশ্য শত্রুর সঙ্গে তারা লড়াই করছে এবং প্রতিটি বিশ্বাসঘাতককে ধ্বংস করে তারা হাজার হাজার মানুষের জীবন, এমনকি দেশের ভাগ্যকে পর্যন্ত ভবিষ্যতের বিপদ থেকে রক্ষা করছে। নেতৃত্বের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত শত্রুর সঙ্গে অন্ধকারে লড়াই চালানোর এই বোধটাই মানুষের মনে এই বছরগুলো একটা দুঃস্বপ্নের মত করে তুলেছিল।

শান্তির লড়াই ব্যর্থ হল

১৯৫৫ সালের প্রথম দিকে, মস্কো আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করায় কয়েকদিন যে চাঞ্চল্য এসেছিল সে সময় টেলিভিসন সাহায্যে অনেকেই আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁদের প্রায় সকলেই আমাকে প্রশ্ন করেন, সোবিয়েতের জনসাধারণ ও নেতারা সত্যিই শান্তি চান বলে আমি মনে করি কি না। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা পরিষ্কার অনুভব করছিলেন যে, যারা আমাদের আলাপ শুনছে তাদের কাছে এটা একটা জীবনমরণের প্রশ্ন, আর এ প্রশ্ন সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

আমি উত্তরে বলেছিলাম: "ওরা যে ভাবে শান্তি কামনা করে; কোনো আমেরিকান সে ভাবে শান্তি কামনা করতে জানে না। তিনি শান্তির জন্যে চেষ্টা করবেন, সোবিয়েতের লোক একথা বিশ্বাস না করলে, কোনো নেতাই তাঁর পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারেন না।

* দি লাস্ট ট্রেন টু বার্লিন —১২৫পৃঃ

এখানে, আমেরিকায়, যুদ্ধ জনসাধারণের সমৃদ্ধি এনেছে, খুব কম বাড়িরই ছেলে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। সোবিয়েৎ দেশে প্রত্যেক পরিবারেরই নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে। সকলকেই ক্ষিধের কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে; অনেক পরিবারের ঘরবাড়ি গিয়েছে; আমি যতগুলো পরিবারকে জানি তাদের প্রত্যেকটার কোনো-না-কোনো পুরুষ প্রাণ হারিয়েছে। আড়াই কোটি লোক যুদ্ধের ফলে গৃহহারা হয়েছিল। এই ক্ষতিপূরণ করার জন্যে যে কাজের বোঝা, সোবিয়েৎ দেশের প্রত্যেকটি লোককে তা বইতে হচ্ছে।"

সোবিয়েতের জনসাধারণের এই গভীর শান্তিকামনার কথা আমেরিকার লোকেরা জানে না দেখে বিস্মিত হতে হয়। অক্টোবর বিপ্লব থেকে এই শান্তিকামনার সূত্রপাত; যুদ্ধের অবসাদ থেকেই এই বিপ্লবের উদ্ভব এবং বিপ্লবের আওয়াজই ছিল: 'শান্তি, জমি, রুটি'। বিপ্লবী সরকারের প্রথম সরকারী কাজও হয়েছিল, ১৯১৭ সালের ৮ই নভেম্বর তারিখে: সমস্ত যুদ্ধরত জাতি ও সরকারের কাছে রাজ্যের অন্তর্ভুক্তীকরণ বা ক্ষতিপূরণ ব্যতীত একটা ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক শান্তির জন্য অবিলম্বে আলাপ-আলোচনা চালানোর প্রস্তাব করা।" বলশেভিকদের কাছে ধার করে নিয়ে, উত্তরকালে প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন বচনটাকে বিখ্যাত করে দিয়েছেন।

উইলসন বা ইঙ্গ-মার্কিন মিত্ররা বা জার্মানি সে সময় শিশু সোবিয়েৎ সাধারণতন্ত্রকে শান্তি দেননি। বরং মিত্রশক্তিরা এ প্রস্তাব করার জন্যে বলশেভিকদের নিন্দাবাদই করে; তারা দাবি করে, রুশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যাক। যুদ্ধ চালানোর ক্ষমতা না থাকায় লেনিন জার্মানির সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হন। লেনিনের ভাষায় সে সন্ধি ছিল 'ডাকাতে সন্ধি'; সে সন্ধির বলে জার্মানি উক্রাইন ও বাল্টিক রাজ্যগুলো অধিকার করে বসে। জার্মানি পরাজিত হওয়ার পর, বিজয়ী মিত্রশক্তিরা এবং জার্মানি উভয়েই আরো দু'বছর ধরে রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যায়।

রুশদের শান্তি-কামনা সে সময়ে এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, লেনিন একবার রুশিয়াকে দু'খণ্ড করতেও প্রায় রাজী হয়ে যান। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে, উইলিয়ম ক্রিশ্চিয়ান বুলিট, প্রেসিডেন্ট উইলসনের আধা-সরকারী দূত হিসেবে মস্কো গিয়ে প্রস্তাব দেন যে, ঐ সময় রুশ মুল্লুকের যে-অংশ যে-সরকারের অধিকারে আছে, তাকেই সে অংশ ছেড়ে দিয়ে দেশটাকে ভাগ করে ফেলা হোক। তার অর্থ হতো, সুদূর প্রাচ্যে জাপানীদের তাঁবেদার একটা রাষ্ট্র, এবং উক্রাইন, কাকেশাস, মধ্য এশিয়া ও উত্তর মেরুঅঞ্চলের বন্দরগুলোতে বৃটেন ও ফ্রান্সের আধিপত্য। রুশিয়ার জনসাধারণ সে সময় অনাহার, রোগ ও যুদ্ধের ফলে মরতে বসেছিল দেখে লেনিন এই অবিশ্বাস্য রকম ডাকাতে প্রস্তাবেও রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁবেদার রাজ্যগুলো একমত হল না, এবং ভার্সাই-এর সন্ধি-সম্মেলনের রাষ্ট্রগুলো বলশেভিকদের একেবারে খতম করে দেওয়ার ইচ্ছায় তাদের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে রাজী হল না।

শান্তির জন্যে আবেদন করে বা নিজেদের ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে চেয়ে রুশরা শান্তি পেতে পারেনি। কিন্তু রুশ জনসাধারণ তাদের সাহস ও ত্যাগের দ্বারাই শান্তি অর্জন করেছিল। সত্যিকার শান্তি এসেছে ধীরে ধীরে: প্রথমে যুদ্ধবিরতি; তারপর বাণিজ্য-চুক্তি; তারপরে—বহুবছর পরে কূটনৈতিক স্বীকৃতি। রুশিয়ার উপর শেষ সশস্ত্র আক্রমণ ঘটে ১৯২০ সালে ফরাসীদের সাহায্যপ্রাপ্ত পোলদের দ্বারা; ১৯২০-২১ সালে জার্মানি ও মিত্রপক্ষ, এই দু'য়েরই সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যারন মানারহাইম পরিচালিত ফিনদের দ্বারা। ১৯২২ সালের অক্টোবরের আগে ব্লাদিভোস্তক থেকে জাপানীদের তাড়ানো যায়নি। ১৯৩৩ সালের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোবিয়েৎ সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। ঐ সময় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের আমলে সে স্বীকৃত দেওয়া হয়।

কোনোরকম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এই নতুন রাষ্ট্র প্রথম যোগ দেয় ১৯২২ সালে জেনোয়ায়। ঐ সময়, জার্মানি ও রুশিয়ার উপর

যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বোঝা চাপাবার জন্যে মিত্রপক্ষ আসামীকে (জার্মানি ও রুশিয়াকে) হাজির হতে হুকুম দেয়। সোবিয়েৎ সরকার তখনি অস্ত্র-সঙ্কোচের প্রস্তাব করে। সোবিয়েৎ প্রতিনিধিদলের নেতা জর্জেস্ চিচেরিন্ বললেন: "যতক্ষণ ইউরোপে তথা পৃথিবীর মাথার উপর যুদ্ধের খাঁড়া ঝুলবে ততক্ষণ বিশ্বের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে যেসব শক্তির প্রয়োজন সেগুলোর স্ফুরণ হবে না।" তাঁর এ আবেদনে কোনো সাড়া না পেয়ে চিচেরিন্ জার্মানির সঙ্গে বিখ্যাত র‍্যাপ্যালো চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন। এই চুক্তি দ্বারা উক্ত সম্মেলনের দুই অনাথ রাষ্ট্র 'সাম্যের ভিত্তি'তে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করল, একে অন্যের ঋণ বাতিল করল। এটা ছিল একটা সরল, ভব্য, কার্যকরী চুক্তি— জার্মানিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর দিকে যে কোনো জাতির পক্ষ থেকে প্রথম প্রয়াস। সে সময়, জার্মানি যখন গণতন্ত্রের অভিলাষী ছিল— অন্যেরা যদি এই আদর্শ অনুসরণ করত, তা হলে হিটলারী জার্মানির উদ্ভব হত বলে মনে হয় না।

এইভাবে সোবিয়েৎ কূটনীতি দুনিয়ার আসরে এগিয়ে এল দু'টো নীতি নিয়ে:—অস্ত্র-সঙ্কোচের মাধ্যমে শান্তি, আর যেসব জাতি ঝড়-ঝাপটার মধ্যে পড়েছে তাদের সঙ্গে সমতার সম্পর্ক। এই নীতিদ্বয়ের উদ্ভব হয়েছিল সোবিয়েৎ মতবাদ ও সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রয়োজন থেকে। সোবিয়েৎ দেশ চাচ্ছিল শান্তি—যাতে সে নিজেকে আরো গড়ে নিতে পারে। বৃহৎ শক্তিগুলোর ক্ষুধা ছিল শান্তির সবচেয়ে বড় অন্তরায়, সুতরাং সোবিয়েৎ দেশের স্বাভাবিক মিত্র ছিল পরাজিত বা ঔপনিবেশিক জাতিগুলো। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন শান্তির সন্ধান করল, প্রথমে নিজের সীমান্তে; তারপর, তার চেষ্টা হল যতখানা সম্ভব বিশ্বের সর্বত্র শান্তি বজায় রাখার দিকে; কারণ, কোথাও যুদ্ধ লাগলে তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ম্যাক্সিম লিৎভিনভের মুখ দিয়ে সোবিয়েৎ কূটনীতি ঘোষণা করল: "শান্তি অবিভাজ্য।" প্রত্যেকটি বিশ্ব কংগ্রেসে গিয়ে তিনি এই নীতি উচ্চারণ করলেন। কার্যতঃ অস্ত্রত্যাগ না করে যে অস্ত্রত্যাগের ব্যবস্থা

করান যায় না—এই কথা বলে তিনি অন্যদেশের কূটনীতিকদের বিব্রত করলেন।

যুদ্ধকে অবৈধ ঘোষণা করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে 'কেলগ' চুক্তির প্রস্তাব করেছিল, তাতে প্রথম দস্তখত দিলেন সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। যে কোনো শান্তির প্রস্তাবে সোবিয়েৎই সাধারণতঃ প্রথম স্বাক্ষর দিয়েছে, কখনো কখনো আমন্ত্রিত হওয়ার পূর্বেই। লিৎভিনভ শান্তি সঙ্ঘগুলোর প্রশংসা অর্জন করলেন বটে, কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গের নীতির উপর তাঁর বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ল না; ছোট রাজ্যগুলো, যা হোক, সোবিয়েৎ কূটনীতির ফলে উপকৃত হল। ১৯২৩ সালের লোজান্ সম্মেলনে, তুরস্ক একটা আধুনিক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব লাভ করল, অনেকটা রুশিয়ার সমর্থনে। দ্বিতীয় দশকের প্রথম দিকে সোবিয়েৎ রুশিয়া ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনকে যে সাহায্য দেন তার জোরেই আধুনিক চীনের—পিকিং সরকার ও ফরমোসার ক্ষীয়মান সরকার, এ দু'য়েরই উদ্ভব হয়।

ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা হচ্ছে বলশেভিক বিপ্লবের প্রত্যক্ষ দান। জারের পতন হলে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা প্রার্থনা করে। কেরেন্স্কি সরকার* তাতে রাজী হয়নি। বৃটেন, ফ্রান্স বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেউই প্রথম মহাযুদ্ধে তাদের মিত্র জারের সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরিয়ে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীন হওয়ার পক্ষপাতী ছিল না। বলশেভিকরা রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করার পরই, জাতি সমূহের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্তালিন প্রস্তাব করেন যে, ফিনল্যাণ্ডের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হোক। তিনি বলেন, "যেহেতু ফিনল্যাণ্ডের জনসাধারণ নিশ্চিত ভাবে স্বাধীনতা দাবি করছে, শ্রমিক রাষ্ট্র সে দাবি না মিটিয়ে পারে না।"

হিটলারের অভ্যুত্থানের ফলে ইউরোপের সমস্ত শক্তির রাজনীতি বদলে গেল। কয়েক বছর ধরে সোবিয়েৎ দেশ জার্মানি কর্তৃক

---

* জারের পতনের পরেই কেরেন্স্কির নেতৃত্বে একটা ধনিকতন্ত্রী অস্থায়ী সরকার স্থাপিত হয়। এই সরকার জনসাধারণের দাবি মেটাতে না পারায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তাকে উচ্ছেদ করে। —অনুবাদক।

উত্থাপিত ভার্সাই সন্ধির পুনরালোচনার দাবি সমর্থন করে আসছিল; কারণ, সোবিয়েৎ সেটাকে একটা যুদ্ধ-উস্কানো তুষ্ট-সন্ধি বলে বিবেচনা করত। কিন্তু ভার্সাই সন্ধির তুলনায় হিটলারকে বড় বেশী যুদ্ধের উস্কানিদাতা দেখা গেল। জার্মান আর জাপানীরা যখন জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ করল, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তখন আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে জাতিসঙ্ঘে প্রবেশ করল। তারপর থেকে, লিৎভিনভ নাৎসীদের যুদ্ধবাজি সংযত করার জন্যে 'গণতন্ত্রী শক্তিগুলোর' মধ্যে মৈত্রীর সন্ধান করতে লাগলেন।

বৃটেন কিন্তু তার প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের নেতৃত্বে হিটলারকে মজবুত করতে লাগল, দশ বছর ধরে সাধারণতন্ত্রী জার্মানিকে যা কিছু সে দিতে রাজী ছিল না তার সবই সাততাড়াতাড়ি মঞ্জুর করে—বৃটেন হিটলারকে রাইন্‌ল্যাণ্ডে সামরিক ঘাঁটি ও সৈন্য স্থাপন করতে দিল, সার-এ নাৎসী-সন্ত্রাসিত গণভোট মেনে নিল, জার্মানির আবার অস্ত্রসজ্জা ও নৌবল-বৃদ্ধি সমর্থন করল, স্পেনে হিটলার-মুসোলিনির মাথা গলানো সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকল। বৃটেনের ধনিকরা অসম্ভব (যুদ্ধের) ক্ষতিপূরণ দাবি করে জার্মান গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে দিয়েছিল, এখন হিটলারকে তারা সাহায্য করল জার্মানিতে টাকা লগ্নী করে, নগদ ঋণ জুগিয়ে। পৃথিবীর প্রত্যক বুদ্ধিমান নাগরিকই জানত যে, হিটলারের প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখানো হল; কারণ, বৃটেনের রক্ষণশীল দল হিটলারকে সোবিয়েতের বিরুদ্ধে লাগাবার উপযুক্ত 'বলবান গুণ্ডা' বলে মনে করত। বৃটিশ ও ফরাসী বৈদেশিক দপ্তরের লক্ষ্য সম্বন্ধে যদি বা কারো কোনো সন্দেহ ছিল, সেটা দূর হল মিউনিক সম্মেলনের ফল দেখে। নির্বিকার চিত্তে তারা চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের কাছে বেচে দিল। পূর্বমুখী অভিযানে হিটলারকে প্ররোচিত করতে ইংরেজ ও ফরাসীর হাতে এইটাই ছিল তুরুকের তাস।

যে কেউ, আমার মত, বৃটেনের ঐ সময়কার চালগুলো লক্ষ্য করেছে তারাই দেখেছে যে, চেম্বারলেন মুখে হিটলারকে 'তুষ্ট করার'

কথা বললেও, আসলে তাঁকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। জার্মানির কেউ যখন দাবি করার সাহসও করেনি, চেম্বারলেন তখনি হিটলারকে চেকদের স্থুদেটান্‌ল্যাণ্ড দেওয়ার কথা পাড়েন। হিটলারকে বিনা প্রতিরোধে দেশে ঢুকতে দেওয়ার চেয়ে চেকরা যখন যুদ্ধ করতে প্রস্তুত বলে মনে হল, প্রাহাস্থ বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্রদূতরা চেক প্রেসিডেণ্ট বেনেসের কাছে গিয়ে ভয় দেখালেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স স্পেনের ব্যাপারে যে রকম মাথা না-গলানোর নীতি নিয়েছিল, চেকোস্লো-ভাকিয়ার ব্যাপারেও তাই করবে। তাদের ঐ নীতি স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারকে হত্যা করেছিল। নাৎসী সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত যখন চেকদের ভূমি দখল করে বসল, তখন জানা গেল যে, তার কয়েক সপ্তাহ আগেই বৃটেনের ধনিকরা জার্মান শিল্পপতিদের সঙ্গে নব-অধিকৃত শিল্পগুলোতে টাকা খাটানোর সম্পর্কে চুক্তি করে নিয়েছিল।

এই দুর্ভাগ্য প্রতিরোধ করার চেষ্টাতে চেকোস্লোভাকিয়াকে সাহায্য করার প্রস্তাব নিয়ে একমাত্র যে মিত্র এগিয়ে এসেছিল, সে হচ্ছে সোবিয়েৎ দেশ। মিউনিক সম্মেলনের সংবাদ যখন এল, আমি তখন ককেশাসের এক স্বাস্থ্য নিবাসে ছুটি কাটাচ্ছিলাম। চেকরা যখন প্রতিরোধ করার ভয় দেখায়, রুশদের তাতে সানন্দ সমর্থন দেখলাম। কয়েকজন সামরিক কর্মচারী মস্কো যাওয়ার জন্যে বিমান নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। তাঁরা বললেন: "আমাদের হয়তো চেকদের সাহায্য করতে হবে।" তারপর খবর এল, বৃটেন আর ফ্রান্সের চাপে বেনেস্‌ নতি স্বীকার করেছেন। অফিসাররা তাঁদের বিমানের ব্যবস্থা বাতিল করলেন। খাওয়ার টেবিলে তাঁদের একজন আমাকে বললেন, "এখন আমাদের করার কিছু নেই। এখন বরং পরবর্তী আক্রমণের জন্যে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। সে আক্রমণ আসতে পারে পোলাণ্ড বা ফ্রান্সের উপর।"

এই বিশ্বাসঘাতকতার পিছনে কোন্‌ কোন্‌ শক্তি ক্রিয়া করছে, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল। চেম্বারলেন আর দালাদিয়ের কেন এভাবে চেক সৈন্যের ২৭টি ডিভিসন আর ইউরোপের একটা

আত্মরক্ষামূলক শ্রেষ্ঠ দুর্গশ্রেণী হাতছাড়া হতে দিলেন? ইউরোপের মধ্যে অস্ত্র নির্মাণের একটা শ্রেষ্ঠ কারখানা হল স্কোডা কারখানা; তাঁরা কেন সেটাকে হিটলারের হাতে তুলে দিলেন? তাঁরা কি জেনে শুনে বিশ্বাসঘাতক, না শুধু দুর্বল? একটা স্থানীয় শিল্প-কারখানার ম্যানেজার বললেন, "চারটি শব্দে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়—ওরা বলশেভিজ্‌ম্‌কে ভয় করে।"

অতঃপর হিটলারের আক্রমণ পূর্বদিকে দ্রুত এগিয়ে চলল। ১৯৩৯ সালের ১৫ই মার্চ তারিখে উদ্ধতভাবে চুক্তি লঙ্ঘন করে জার্মান সৈন্যরা নিরস্ত্রীকৃত প্রাহায় প্রবেশ করল। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন জার্মানিকে জানিয়ে দিল যে, তার এই চেক-ভূমি-অধিকার রুশিয়া মেনে নিতে পারে না। জার্মানি যাতে আরো আক্রমণ চালাতে না পারে, তার জন্য সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বৃটেনের কাছে, বৃটেন, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, রোমানিয়া, তুরস্ক, ও রুশিয়ার অবিলম্বে একটা মন্ত্রণা-সভায় মিলিত হওয়ার প্রস্তাব করে। চেম্বারলেন উত্তরে জানালেন, তার এখনো সময় হয়নি। এই ইঙ্গিত পেয়ে হিটলার লিথুয়ানিয়ার প্রধান বন্দর মেমেল অধিকার করে বসলেন, এবং বাল্টিক সাগরের দিকে পোলাণ্ডের নির্গম পথ ডানজিগের অবস্থা বিপন্ন করে তুললেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি পোলাণ্ডের সীমান্ত বরাবর সাতটি জার্মান ডিভিসন পোলাণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করার হুকুমের প্রতীক্ষা করতে লাগল; খুঁচিয়ে ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা চলল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ইউরোপস্থ প্রতিনিধি তাঁর দপ্তরকে জানালেন যে, "ফরাসী সরকারের সব চেয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মতে এ যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দশটা হলে, না-হওয়ার সম্ভাবনা একটা।" *

বৃটেন ও ফ্রান্সের অনেকেই হিটলারকে থামাবার জন্যে সোবিয়েৎ রুশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার দাবি করলেন। বৃটেনের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী লয়েড্‌ জর্জ বললেন, "সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে যোগ দিলে শান্তি রক্ষিত হতে পারে"; ফ্রান্সের প্রাক্তন বিমান বিভাগীয় মন্ত্রী পিয়ের

* রিপোর্টেড বাই এ্যালসপ ব্রাদার্স

কং বললেন, "গণতন্ত্রী সরকারগুলোর পক্ষে রুশিয়ার সাহায্য নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।" এপ্রিল মাসে বেসরকারী ভাবে জনসাধারণের মতামত সংগ্রহ করে দেখা গেল যে, শতকরা ৯২ জনই সোবিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের পক্ষপাতী।* নাৎসীদের আক্রমণ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপকে বাঁচাবার নিশ্চিত উপায় হিসেবে ত্রিশক্তি মৈত্রী বন্ধনের জন্যে কয়েকটা প্রস্তাবই সোবিয়েৎ ইউনিয়ন করল। চেম্বারলেন সরকার এ ধরনের কোনো প্রস্তাবকেই পাত্তা দিল না, অকারণ সময়ক্ষেপ করে প্রত্যাখ্যান করল। চেম্বারলেন বরং হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলেন। ৩রা মে তারিখে, জার্মানির সঙ্গে তিনি অনাক্রমণ চুক্তি করার জন্যে প্রস্তুত—একথা ঘোষণা করে চেম্বারলেন কমন্সসভাকে চমকে দিলেন। তার দু'দিন পরে, তিনি সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রদত্ত সামরিক মৈত্রীর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করলেন।

রক্ষণশীল দলের লোকরাও চেম্বারলেনের কাজের প্রতিবাদ করতে লাগলেন। ৭ই মে তারিখে, উইনস্টন চার্চিল কমন্সসভায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের দাবি করলেন। এই রকম চাপে পড়ে, ২৫শে তারিখে মস্কোস্থ বৃটিশ ও ফরাসী দূতকে শেষপর্যন্ত মৈত্রী সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার নির্দেশ দেওয়া হল। চেকোস্লোভাকিয়ার ধর্ষণের পর দশটা অতি মূল্যবান সপ্তাহ নষ্ট করা হয়েছিল। আরো তিন সপ্তাহ নষ্ট করা হল কে-একজন মিঃ স্ট্র্যাং-এর মস্কো পৌঁছানোর প্রতীক্ষা করে। বৃটেনের বৈদেশিক দপ্তর কর্তৃক 'কথাবার্তার তদ্বির' করার জন্যে প্রেরিত এই প্রতিনিধিটি মস্কো পৌঁছালে দেখা গেল যে, কোনো কিছুতে স্বাক্ষর দেওয়ার কর্তৃত্ব তাঁকে দেওয়া হয়নি। ৭৫ দিন ধরে কথাবার্তা চলল, বৃটিশ পক্ষ তার মধ্যে ৫৯ দিন লাগিয়ে দিল প্রস্তাব লিখতে; যে রুশদের মন্থরগতি মনে করা হত তাদের কিন্তু তা করতে লাগল মাত্র ১৬ দিন। বেশ বোঝা যাচ্ছে, সোবিয়েৎ সরকার যেমন সবকিছু তাড়াতাড়ি করতে চাচ্ছিল, বৃটিশ সরকার তেমনই চাচ্ছিল দেরি করতে। হঠাৎ মস্কো জানতে পারল যে, বৃটিশের বহিঃর্বাণিজ্য

* নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন, ৪ঠা মে, ১৯৩৯

দপ্তরের পরিষদ-সম্পাদক জার্মানির সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে ৫ কি ১০ হাজার কোটি পাউণ্ড ঋণের সম্পর্কে কথাবার্তা চালাচ্ছে।

মস্কোর নেতাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বৃটিশ হয় সমস্ত ব্যাপারটিকে তাচ্ছিল্য করছে, নয়তো যুদ্ধটাকে পূর্বাভিমুখী করার চেষ্টা করছে। তাঁদের আশঙ্কা হল, সোবিয়েতের ঘাড়ে যুদ্ধ আসন্ন—শুধু হিটলারের সঙ্গে নয়, বৃটেন এবং ধনতন্ত্রী জগতের অন্যান্য শক্তি দ্বারা সাহায্য-প্রাপ্ত হিটলারের সঙ্গে,—ঠিক এই রকম যুদ্ধের আশঙ্কাই তাঁরা বরাবর করে আসছিলেন। বৃটেনের অধিকাংশ লোক মৈত্রী বন্ধনের কথাবার্তা চলছে জেনেই আশ্বস্ত ছিল, তাদের বিশ্বাস ছিল, একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাচ্ছে। লয়েড জর্জ ছিলেন বেশী সূক্ষ্মদর্শী ; তিনি বললেন, "দুনিয়া একটা খাড়া পাহাড়ের সুউচ্চ চূড়ায় দাঁড়িয়ে টলমল করছে।"

দু' দু'বার মস্কো বৃটেনের লোকদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল যে, কথা-বার্তা কোনো সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছে না। প্রথম ইঙ্গিত এল, যখন ৩রা মে তারিখে সোবিয়েৎ বৈদেশিক মন্ত্রী ম্যাক্সিম্ লিৎভিনভ পদ-ত্যাগ করলেন। দশ বছর ধরে তিনি জগৎবাসীর চোখে, আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তি রক্ষার নীতির প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর সে কর্মপন্থা যে ব্যর্থ হয়েছে—সেই কথাটাই মস্কো ঘোষণা করল তাঁর পদত্যাগের মাধ্যমে। তাঁর সে নীতি মাঞ্চুরিয়ায়, আবিসিনিয়ায়, স্পেনে, চীনে, অস্ট্রিয়ায়, আলবেনিয়ায়, চেকোস্লোভাকিয়ায়, মেমেলে, ব্যর্থ হল। আটবছর ধরে সে নীতি ব্যর্থ হল, কারণ পশ্চিমের গণতন্ত্রী দেশগুলোর সরকারী কর্তারা আক্রমণ-কারীকে হয় তুষ্ট নয় উৎসাহিত করে চলছিল। লিৎভিনভের পদত্যাগ এই কথাই জানালো ; কিন্তু পশ্চিমী সংবাদপত্রগুলো সোবিয়েতের ঘটনাবলীকে এত তাচ্ছিল্যের ভাবে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল যে, তারা ভাবে ভঙ্গীতে তাদের পাঠকবর্গকে জানিয়ে দিল যে, কোনো কাল্পনিক অপরাধের জন্যেই লিৎভিনভকে সরিয়ে ফেলা হয়। •

ছ' সপ্তাহ পরে মস্কো আর একটা ইঙ্গিত দিল। ২৯শে জুলাই তারিখে উচ্চতম সোবিয়েতের 'বৈদেশিক ব্যাপার সমিতি'র সভাপতি

আন্দ্রে ঝ্‌দানভ প্রাভদায় একটা প্রবন্ধে ঘোষণা করলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে কথাবার্তা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে না; তাঁর ধারণা, বৃটেন বা ফ্রান্স সোবিয়েতের সঙ্গে কোনো মৈত্রী বন্ধন করতে অথবা হিটলারকে প্রতিরোধ করতে চায় না; তারা হয়তো, হিটলার যতদিন রুশিয়া আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত না হয়, ততদিন রুশদের শান্ত রাখার জন্যে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রবন্ধ রুশিয়ার বাইরে কয়েক-দিন একটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল বটে, কিন্তু অধিকাংশ সংবাদ-সমালোচক ঝ্‌দানভকে 'মাথা-গরম লোক' বলে উড়িয়ে দিল।

জুলাই মাসের শেষ দিকে, সারা ইউরোপের বৈদেশিক দপ্তরগুলো যখন জানল যে, হিটলার এক মাসের মধ্যেই 'পোলিশ করিডর'টা* দখল করার মতলব করেছেন, তখন সোবিয়েৎ সরকার একটা শেষ চেষ্টা করলেন। তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্স মস্কোতে সামরিক মিশন (বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত দল) পাঠাক, যাতে ঐখানে বসেই পূর্ব ইউরোপের পারস্পরিক রক্ষণ-ব্যবস্থার ছক তৈরী হয়ে যেতে পারে। মিশন দশদিন অপেক্ষা করে, যে পথে আসতে সব চেয়ে দেরি হয় সেই পথ ধরে মস্কো এসে পৌঁছল; কিন্তু মস্কোতে পৌঁছানোর পর দেখা গেল যে, কোনো কিছুতে সম্মতি দেওয়ার কোনো অধিকার তাদের দেওয়া হয়নি। একদল সোবিয়েৎ সামরিক কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে সোবিয়েৎ সমর-মন্ত্রী ক্লিমেন্তি ভরোসিলভ ইঙ্গ-ফরাসী মিশনের কাছে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব করলেন; কিন্তু ইঙ্গ-ফরাসী মিশনের সেগুলো গ্রহণ করার কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। ভরোসিলভ বললেন, হিটলার যদি পোলাণ্ড আক্রমণ করে, তিনি দু'টো সোবিয়েৎ বাহিনী পাঠাবেন,—একটা উত্তরে পূর্ব-প্রুসিয়ার দিকে যাবে, আর একটা দক্ষিণ পোলাণ্ডের মধ্য দিয়ে মধ্য জার্মানির দিকে এগোবে। ইঙ্গ-ফরাসী মিশন বলল, এ সম্বন্ধে তাঁদের ওয়ারশর

* পূর্বে জার্মান রাজ্যের—প্রুসিয়াকে তার বাকি অংশের সহিত যোগ রাখতে হত পোলাণ্ডের মধ্য দিয়ে। এই যোগের পথটিকে বলা হত পোলিশ করিডর।
—অনুবাদক

(অর্থাৎ পোল্ সরকারের) মত জানতে হবে ; পরে, তারা সংবাদ দিল যে পোল্ সরকার সোবিয়েৎ সাহায্য নিতে রাজী নয়। ইংরেজ ও ফরাসীরা চেকদের ভয় দেখিয়ে হিটলারের কাছে নত হতে বাধ্য করতে দ্বিধা করেনি, কিন্তু সোবিয়েৎ সাহায্য গ্রহণ করানোর জন্যে পোল্দের উপর চাপ দিতে তাদের বাধল।

এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনা ভেঙে গেল। উচ্চতম সোবিয়েতের আগস্ট অধিবেশনে রিপোর্ট দেওয়ায় সময় ভরোসিলভ এ আপস-আলোচনাকে 'ছ্যাবলামিভরা আলোচনার ভান' বলে অভিহিত করলেন।

অতঃপর সোবিয়েৎ ইউনিয়ন মন স্থির করে ফেলল। হিটলার আগেই রুশিয়ার কাছে একটা অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব করেছিলেন—উত্তরকালে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় হিটলার স্বীকার করেন যে, প্রস্তাবটা তাঁর তরফ থেকেই গিয়েছিল। ২৩শে আগস্ট তারিখে জার্মানি আর সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বৃটেন এবং ফ্রান্সের কাছে যে মৈত্রী প্রস্তাব করেছিল, এটা সে ধরনের নয় ; জার্মানি আর রুশিয়ার মধ্যে যে নিরপেক্ষতা ১৯২৬ সাল থেকে চলে আসতে আসতে হিটলারের আমলে ব্যাহত হয়েছিল, এটা শুধু তারই পুনঃসমর্থন। মলোটভ জানালেন, "(বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে) পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি সম্পাদিত হল না দেখে" সোবিয়েৎ ইউনিয়ন জার্মানির সঙ্গে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে।

ইউরোপ যখন প্রতিমুহূর্তে হিটলার কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রমণের প্রতীক্ষা করছিল, ঠিক সেই সময়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায়, ইউরোপের শক্তির হেরফের হয়ে গেল। পূর্ব ইউরোপের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া অনুকূল হল। বুলগেরিয়া থেকে তারবার্তা এল, "উত্তেজনা হ্রাস পেয়েছে।" লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়া থেকে সংবাদ এল, "যেহেতু আমাদের প্রতিবেশী বড় রাষ্ট্রদ্বয় পরস্পরের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে সম্মত হয়েছে, সেহেতু বাল্টিক উপকূল বরাবর উত্তেজনা

দূর হল।” পোলাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী কিন্তু পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন দেখলেন না, কারণ, “পোলাণ্ড কোনোদিন সোবিয়েতের সাহায্য আশাও করেনি, চায়ও না।” স্পষ্টই বোঝা যায়, পূর্ব ইউরোপ আশা করেছিল যে, এই চুক্তি পোলাণ্ডের উপর হিটলারের আক্রমণ বন্ধ না করতে পারলেও, যুদ্ধটাকে পূর্বদিকে প্রসারিত হতে দেবে না।

হিটলারের মিত্ররা ক্রুদ্ধ হলেন। মুসোলিনি আর ফ্রাঙ্কো খোলাখুলিভাবেই এ চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেন। টোকিওর (অর্থাৎ জাপানী সরকারের) মনে দারুণ চোট লাগল; কারণ, জাপান ইতিমধ্যেই মঙ্গোলিয়ার কিনারায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল; প্রকাশ, জাপান হিটলারকে জানিয়ে রেখেছিল যে, আগস্ট নাগাদ সে (রুশিয়ার উপর) ‘প্রচণ্ড ধাক্কায়’ যোগ দিতে পারবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে সন্ধি করার জন্যে জার্মানির উপর তীব্র আক্রমণের মাঝখানে জাপানের মন্ত্রিসভার পতন হল। সব চেয়ে চটল হিটলারের লণ্ডনস্থ রক্ষণশীল পৃষ্ঠপোষকরা। এই প্রথম তারা হিটলারের রক্তের জন্যে গর্জে উঠল। কিন্তু চেম্বারলেন সরকারের আশা এবং অভ্যাস অত সহজে গেল না। দশ দিন ধরে, হিটলার পোলাণ্ডে প্রবেশ করারও পরে চেম্বারলেন মিউনিকের চতুঃশক্তির—বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি আর ইটালির একটা সম্মেলন বসাবার চেষ্টা করলেন; উদ্দেশ্য, হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে পোলাণ্ডের ভাগ্যের একটা সুরাহা করবেন। সে সম্মেলন যখন প্রত্যাখ্যাত হল, তখন চেম্বারলেন পোলাণ্ডের সঙ্গে বহু বিলম্বিত মৈত্রী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন, পোল্‌দের প্রতিরোধ করতে বললেন।

পোল্‌রা প্রতিরোধ করবে কি করে? বৃটেন সাহায্য পাঠাল না। দু'দিনের মধ্যে পোল্‌দের বিমানবাহিনী নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল; দু' সপ্তাহের মধ্যে তাদের সংগঠিত সৈন্য বাহিনী বলে কিছু রইল না। পোল্ সরকার রোমানিয়ার প্রান্তে কোথায় সরে পড়লেন; ওয়ারশর বীর মেয়র কেবল রইলেন মরিয়া বেসামরিক লোকদের নিয়ে প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করতে। যে একমাত্র সাহায্য যথাকালে

পাওয়া সম্ভব ছিল, যে সাহায্যের কেবল প্রতিশ্রুতির ফলে হিটলারের আক্রমণ নিবারিত হতে পারত, সেটা ছিল রুশদের সাহায্য। হিটলারের চেয়ে বলশেভিকদের বেশী ঘৃণা করত বলে সে সাহায্য পোলাণ্ডের সরকার আগেই বর্জন করে রেখেছিল। বৃটেনের গোঁড়া রক্ষণশীলদলের সংবাদপত্রগুলো তখনো ভাবছিল, পোলাণ্ডকে রক্ষা করার কথা নয়, পূর্ব ইউরোপের ধ্বংসস্তূপের উপর দিয়ে যুদ্ধটাকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দিকে ঠেলে দেওয়ার কথা।

সেই তুর্যোগের সময়ে, পোলাণ্ড যখন ভেঙে পড়ছিল, একজন সোবিয়েৎ কূটনীতিক আমায় বললেন, "আমরা যদি অনাক্রমণ চুক্তিটা না করতাম, আক্রমণটা আসত আমাদের উপর। ইউরোপ এবং এশিয়া—তু'দিক হতে মৈত্রীবদ্ধ জার্মানি, জাপান আর ইটালি আক্রমণ করত। বৃটেন ও ফ্রান্স ম্যাজিনো লাইন (ফ্রান্সের সীমান্তব্যাপী তুর্গশ্রেণী) দখলে রেখে হিটলারকে অর্থ সাহায্য দিত। আমেরিকা হত আমাদের বিরুদ্ধে জাপানের অস্ত্রাগার, যেমন সে এযাবৎ চীনের বিরুদ্ধে হয়ে এসেছে। অনাক্রমণ চুক্তিটা করে আমরা হিটলার, জাপান আর হিটলারের লণ্ডনস্থ পৃষ্ঠপোষকদের জোট ভেঙে এক থেকে অন্যকে পৃথক করে দিয়েছি। পোলাণ্ডে অভিযান নিবারণ করার আর সময় ছিল না। চেম্বারলেন চেষ্টাও করেননি তবে আমরা বিশ্ব-ফাসিজিমের শিবিরে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছি, আমাদের আর সারা তুনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে না।"

এইভাবে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সমবেত বোঝাপড়ার মাধ্যমে শান্তি বজায় রাখার দীর্ঘ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল বটে, কিন্তু সোবিয়েৎ ইউনিয়ন অনাক্রমণ চুক্তি করে তু'বছরের জন্যে নিশ্বাস ফেলার সময় পেল। তার চেয়ে যা বড় কথা, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই চুক্তি করে যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিনের মত হিটলারকে তাঁর পশ্চিমী পৃষ্ঠপোষকদের থেকে দূরে সরিয়ে ফেলল।

যে চুক্তি হিটলারের পথরোধ করল

"পোল্ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে ওয়ারশর আর কোনো অস্তিত্ব নেই। পোল্ সরকার কোথায় আছে কেউ জানে না। পোলাণ্ডে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের পক্ষে আশঙ্কাজনক যে কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে।"—এই কথাগুলো ১৯৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভি. এম. মলোটভ প্রথমে পোলাণ্ডের রাষ্ট্রদূতকে পত্রযোগে এবং পরে পৃথিবীর লোককে রেডিও মারফত জানিয়ে ঘোষণা করলেন যে, সোবিয়েৎ বাহিনী পোলাণ্ডে প্রবেশ করছে।

আমেরিকানদের চেয়ে বৃটিশরা এ অভিযানের অর্থ অনেক ভালো বুঝল। আমেরিকা আজও নির্বিচারে পোলাণ্ড ভাগ করার জন্যে স্তালিনকে 'হিটলারের সহ-অপরাধী' বলে অভিহিত করে। কিন্তু ১লা অক্টোবর তারিখে তাঁর বেতার বক্তৃতায় উইনস্টন চার্চিল বললেন, "পূর্ব পোলাণ্ডে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন নাৎসীদের অগ্রগতি রোধ করেছে ; এটা যদি সে আমাদের মিত্র হিসেবে করত!" লণ্ডনের 'টাইম্‌স্' কাগজে বার্নার্ড শ হিটলারের অগ্রগতি প্রথম থামিয়ে দেওয়ার জন্যে স্তালিনকে বাহবা দিলেন। এমন কি প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনও ২৬শে অক্টোবর তারিখে কমন্সসভায় বিরক্তিভরে স্বীকার করলেন : "জার্মানির বিরুদ্ধে রক্ষণ-ব্যবস্থা হিসেবে, পোলাণ্ডের অংশ দখল করা লাল ফৌজের পক্ষে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল।" পোলাণ্ডের নির্বাসনগত সরকার ঐ অভিযানের সময় রোমানিয়ার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে আসছিল এবং কয়েক সপ্তাহ পরে লণ্ডনে এসে পৌঁছায় ; তারাও সোবিয়েতের এই অভিযানকে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে ঘোষণা করতে কোনোদিন সাহস করেনি।

ঐ অঞ্চলের লোকে রুশ সৈন্যদের কোনো রকম বাধা দেয়নি, বরং উল্লাসের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে নিয়েছিল। ঐ অঞ্চলের লোকদের বেশীর ভাগ ছিল, পোল্ নয়, উক্রানীয় ও বিয়েলো-রুশ। মার্কিন রাষ্ট্রদূত

বিড্‌ল্ জানালেন যে, লোকে রুশদের 'পুলিসী কাজে নিযুক্ত' বলে মেনে নিয়েছে। প্রেরিত সংবাদে জানা গেল যে, রুশ সৈন্যরা পশ্চাৎ-অপসারী পোল্ সৈন্যদের সঙ্গে পাশাপাশি চলছে; উক্রানীয় মেয়েরা রুশদের ট্যাঙ্কের উপর মালা দোলাচ্ছে। ল্বভ্-ঘাঁটির পোল্ সেনানায়ক কয়েক দিন ধরে তিন দিক হতে জার্মানদের আক্রমণ রোধ করেছিলেন, চতুর্থ দিকে লাল ফৌজ আসা মাত্র তিনি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন; বললেন, "আমাকে আদেশ দেওয়ার জন্যে কোনো পোল্ সরকার আজ নেই; বলশেভিকদের সঙ্গে লড়াই করার কোনো আদেশ আমি পাইনি।" লাল ফৌজ কিছুটা বাধা পেয়েছিল, তবে তা কয়েকটা ছোটখাট দলের কাছ থেকে; লাল ফৌজ কর্তৃক প্রকাশিত হতাহতের সংখ্যা থেকে একথা বোঝা যায়: ৭৩৭ জন সৈন্য মৃত, ১,৮৬২ জন আহত। একটা ছোট মোটর-বাহিত সৈন্যদলকে ৭০ মাইল দূর থেকে মধ্যরাত্রের মধ্যে ভিল্‌না দখল করার আদেশ দেওয়া হয়; তাদের ভিল্‌না দখলের সময় এই সব সৈন্যদের অধিকাংশ হতাহত হয়েছিল।

মার্কিন মতে স্তালিন আর হিটলার আগে থেকেই পোলাণ্ড ভাগা-ভাগি করে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। যে ভাবে এই ভাগাভাগি হল, তা থেকে কিন্তু এ মতের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে একটা মন্ত্রণাসভায় নির্ধারিত হবার আগে, জার্মান আর রুশদের মধ্যে তিনবার সীমানা বদল হয়। রুশদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যেই জার্মানরা ল্বভ্ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, কয়েক দিন ধরে শহরটার উপর আক্রমণ চালিয়েছিল—এটা সম্ভব বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, আগে থেকে ভিল্‌না শহরটা তাদের অংশে পেয়ে থাকলে, রুশরা তাড়াতাড়ি ভিল্‌না পৌঁছতে গিয়ে সৈন্যক্ষয় করবে—এটাও সম্ভব নয়। মনে হয়, পোলাণ্ডের অপোলীয় অঞ্চলগুলোতে রুশদের স্বার্থ সম্পর্কে কোনো রকম বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অভিযান যে ভাবে ঘটেছিল, সে সম্পর্কে আগে থেকে কোনো চুক্তি করা হয়নি।

পূর্ব ইউরোপের মতে, হিটলার শুধু পোলাণ্ড দখল করার মতলব করেননি; তিনি চেয়েছিলেন, দ্রুতগতিতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে

বল্কান রাজ্যগুলোতে ঢুকে পড়া, এবং সম্ভবতঃ ল্বভ্‌কে নাৎসী-উক্রাইনের রাজধানী হিসেবে ব্যবহার করে উত্তর-পূর্বদিকে বাল্টিক রাজ্যগুলোর মধ্যে যতখানি যেতে পারেন চলে যাওয়া। জার্মানির রণকৌশল দেখে সেই রকমই বোঝা যাচ্ছিল ; কারণ, পোলাণ্ডের প্রাথমিক বাধা চূর্ণ করার পর জার্মানরা পোলাণ্ডকে শত্রুমুক্ত করার জন্যে অপেক্ষা না করেই দেশটাকে সিধা অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্বে ল্বভ্ ও উত্তর-পূর্বে ভিল্‌নার দিকে এগিয়ে যায়। জার্মান বাহিনীকে অভ্যর্থনা করার জন্যে রোমানিয়ার 'আয়রন গার্ড'রা (লৌহ প্রহরীরা) ব্যাপক বিদ্রোহের আয়োজন করে রেখেছিল বলে জানা যায়। কথাটা যে অমূলক নয়, সেটা বোঝা যায়, জার্মানরা কাছে এসে গেলে প্রধান মন্ত্রী কালিনেস্কুর গুপ্ত হত্যা থেকে, এবং পোলাণ্ডের সীমান্তে রোমানিয়ার একটি শহরে সত্যি সত্যিই বিদ্রোহ ঘটে যাওয়া থেকে। বিদ্রোহীরা যখন দেখল যে নদীর ওপারের সৈন্যরা জার্মান নয়, রুশ, তখন তাদের বিদ্রোহ আপনা থেকেই মিলিয়ে যায়।

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের সংবাদ-দাতা লণ্ডনের মত জানালে ঃ—"সোবিয়েতের কাণ্ডটা হিটলারের রোমানিয়া সংক্রান্ত সকল মতলব ভণ্ডুল করে দিয়েছে।" ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে পূব-ইউরোপ থেকে একটি মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠান তার করল, "রুশদের উপর লোকের শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছে। চাষীরা যে তাদের সীমান্ত বরাবর জার্মানদের চেয়ে রুশদের থাকাটাই পছন্দ করে, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই।"

বোঝা যাচ্ছে, হিটলারের সঙ্গে সাট করে রুশিয়া পূর্ব পোলাণ্ডে অভিযান করেনি ; এ অভিযান করে, অনাক্রমণ চুক্তির বলে তারা হিটলারকে প্রথম বড় রকমের বাধা দিয়েছে। এ অভিযানের সময় স্থির করা হয়েছিল একেবারে মুহূর্ত বিচার করে। এটা অর্ধদিন আগে ঘটলে, পোলাণ্ডের কোথাও না কোথাও একটা পোল্ সরকারের অস্তিত্ব থাকত ; আর রুশিয়ার অভিযানকে 'শত্রুতামূলক যুদ্ধ' বলে, রুশিয়াকে পোলাণ্ডের বন্ধু বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধে ফাঁসিয়ে দেওয়ার মত

সক্রিয়তা দেখা যেত সে সরকারের। অর্ধদিন পরে ঘটলে, রুশরা হয়তো দেখত, জার্মানরা দক্ষিণে রোমানিয়া এবং উত্তরে বাল্টিক রাজ্যগুলোর মধ্যে চুপে চুপে ঢুকে পড়েছে। লাল ফৌজের অভিযান এল ঠিক সেই মাঝামাঝি সময়, যখন পোল্দের সরকার অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গিয়েছে অথচ জার্মানরা ল্বভ্ আর ভিল্না—সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই শহর দু'টো দখল করতে পারেনি।

তারপর থেকে, চুক্তি করার ফলে রুশিয়া যে নিশ্বাস ফেলার সময়টা পেল সেই সময়টার সে সদ্ব্যবহার করল, শুধু প্রতিরক্ষার জন্যে প্রস্তুতি করে নয়, লড়াই ছাড়া সব রকম উপায়ে হিটলারের পূর্ব ইউরোপে অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময় হিটলার নিজেই এ কথা বলেন এবং রুশিয়ার যেসব কাজের ফলে তাঁর পথ বন্ধ হয়েছিল, অতি তিক্ততার সঙ্গে সেগুলোর একটা ফিরিস্তিও দেন।

মস্কোর প্রথম চাল হল, রুশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত বরাবর মৈত্রী-চুক্তির দ্বারা একটি প্রশস্ত নিরপেক্ষ বেষ্টনী খাড়া করা। ভিল্না ছিল লিথুয়ানিয়ার প্রাচীন রাজধানী, বিশ বছর আগে পোল্রা জাতিসঙ্ঘের নিষেধ অমান্য করে সেটা নিজেরা দখল করে নিয়েছিল। লিথুয়ানিয়াকে ভিল্না উপহার দিয়ে মস্কো (অর্থাৎ সোবিয়েৎ সরকার) বন্ধুত্বপূর্ণ লেনদেনের পথ পরিষ্কার করল। তারপর, মৈত্রী সম্পর্কে আলোচনার জন্যে লিথুয়ানিয়া, লাৎভিয়া ও এস্তোনিয়াকে তাদের বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রীদের মস্কোতে পাঠাতে আমন্ত্রণ জানাল। তারা একে একে গিয়ে চিহ্ন-নির্দিষ্ট স্থানে স্বাক্ষর দিল।* ১৯৩৯ সালের ১০ই অক্টোবর নাগাদ, রুশবাহিনীর পোলাণ্ডে ঢোকার এক মাসের মধ্যে রুশিয়া তিনটি বাল্টিক রাজ্যকে সামরিক মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ করল—অতীতে এগুলো ছিল রুশিয়া আক্রমণের বড় রাস্তা। এক-সারি সুদৃঢ় নৌঘাঁটি—সেগুলো আগেই রুশ সম্রাট মহান্ পীটারের

---

* অর্থাৎ নিজ নিজ রাজ্যের এবং রুশ সীমান্তের মধ্যে একটা নিরপেক্ষ বেষ্টনী ছেড়ে রাখাতে মত দিল। —অনুবাদক

দ্বারা তৈরী হয়েছিল, এই ভাবে রুশিয়ার নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। আমেরিকার অধিকাংশ সংবাদ-সমালোচক রুশিয়ার এ কাজের নিন্দা করলেও, ওয়াল্টার নিপ্‌ম্যান আসল ব্যাপারটা ধরতে পারলেন ; তিনি লিখলেন, "এটা দিন দিন পরিষ্কার হয়ে আসছে যে, রুশিয়া বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত একটি বড় রকমের প্রতিরক্ষা এলাকা তৈরি করে নিচ্ছে।" ইঙ্গ-মাকিন সংবাদপত্রে বাল্টিক রাজ্যগুলোকে রুশিয়ার 'তাঁবেদার' বলা হয়েছিল ; ঐ রাজ্যগুলোই তার প্রতিবাদ করল। তারা নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছিল না। সে সময় তাদের আভ্যন্তরীণ সংগঠন কোনো ঘা খায়নি ; তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সাহায্যের বদলে তাকে কয়েকটা ঘাঁটি ছেড়ে দিয়েছিল মাত্র।

এর পরে ঘটল, বাল্টিক রাজ্যগুলো থেকে পাঁচ লক্ষ জার্মানের নাটকীয় বহিষ্কার। তার জন্যে হিটলার কী ভীষণ চটেছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা থেকে। তাতে তিনি বলেছিলেন, কি ভাবে, '৫ লক্ষের বেশী নরনারীকে তাদের নিজেদের জন্মভূমি ছাড়তে বাধ্য করা হল।......এসব সত্ত্বেও আমি চুপ করে থাকলাম, কারণ চুপ না থেকে আমার উপায় ছিল না।" এটা কোনো বিজয়ীর আত্ম-প্রসাদের ভাষা নয়। বাল্টিক রাজ্যগুলোতে বাল্টিক জার্মানরা ছিল উচ্চশ্রেণীর লোক, তাদের কেউ কেউ এসব রাজ্যে কয়েক শতাব্দী ধরে ভূস্বামিত্ব করে আসছিল। রুশ বিপ্লবের সময়, এরাই জার্মান সৈন্য এনে স্থানীয় বিপ্লবী সরকারগুলোকে উচ্ছেদ করে। তাদের বহিষ্কারের ফলে, ইউরোপে রুশিয়ার পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক পঞ্চমবাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হয়ে গেল। দক্ষিণ বাল্টিকের দিক থেকে আকস্মিক আক্রমণের আশঙ্কা দূর করার পর মস্কো ফিনল্যাণ্ডের দ্বারস্থ হন। উত্তর দিক থেকে আক্রমণের ঐটাই ছিল পথ। ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতাটা রুশ বিপ্লবের দ্বারা হলেও, বাল্টিক রাজ্যগুলোর মধ্যে ঐ দেশই রুশিয়ার প্রতি সব চেয়ে বেশী শত্রুভাবাপন্ন বলে জানা ছিল। কাইজারের জার্মান সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে রুশ সম্রাটের প্রাক্তন সেনাপতি ব্যারন্‌

ম্যানারহাইম প্রথম দিকের গণতন্ত্রী ফিনল্যাণ্ডে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মাধ্যমে উৎখাত করেছিলেন। ফিনল্যাণ্ড হয়ে উঠেছিল সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কার্যকলাপের ঘাঁটি। তার 'ম্যানার-হাইম লাইন' তৈরী হয়েছিল বৃটিশের উপদেশ মত। ম্যানারহাইম লাইন হচ্ছে লেনিনগ্রাদের উপর আক্রমণ করার সময়ে বড় গোছের একটা সৈন্যবাহিনীকে আচ্ছাদন দেওয়ার মতো উপযুক্ত করে তৈরী দুর্গশ্রেণী। পরে নাৎসীরা ফিনল্যাণ্ডের বিমানক্ষেত্রগুলো নির্মাণ করে-ছিল। সেগুলোতে দু' হাজার বিমানের উপযুক্ত জায়গা রাখা হয়েছিল, যদিও ফিনল্যাণ্ডের বিমান ছিল মাত্র দেড়শ' খানা। স্পষ্টই বোঝা যায়, ঐ বিমানক্ষেত্রগুলো কোনো বৃহৎ শক্তির ব্যবহারের জন্যেই পরিকল্পিত হয়েছিল।

মস্কো জানত যে, ফিনল্যাণ্ড মৈত্রী প্রস্তাবে রাজী হবে না। তবে তাকে দেওয়ার মত কিছু সোবিয়েতের ছিল। ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধের ফলে বাল্টিক সাগরের মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ফিনল্যাণ্ডের বৈদেশিক বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক মন্দায় বিব্রত হয়ে ফিনল্যাণ্ড সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চাচ্ছিল, আর চাচ্ছিল বহির্জগতে বেরুবার জন্যে লেনিনগ্রাদ-মুরম্যানস্ক রেলওয়েটা ব্যবহার করতে। কাজেই, ১৯৩৯ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে মস্কো যখন ফিনল্যাণ্ডকে 'বকেয়া প্রশ্নগুলো' সম্পর্কে আলোচনা করার জন্যে কোনো পূর্ণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোককে পাঠাতে বলল, সে আমন্ত্রণের ফল দেখা গেল বিস্ময়কর। কোনো জবাব দেওয়ার আগেই ফিন্ সরকার আংশিক সৈন্য সমাবেশ ঘোষণা করল, সীমান্ত প্রদেশে বহু সশস্ত্র সৈন্য পাঠাল, ফট্‌কা বাজার বন্ধ করে দিল, স্ত্রীলোক ও শিশুদের রাজধানী হেলসিঙ্কি ত্যাগ করার আদেশ দিল, আর আমেরিকার কাছে আবেদন করল, 'নৈতিক সমর্থন' চেয়ে। এই 'অনুপ্রাণিত আতঙ্ক' লক্ষ্য করে সোবিয়েৎ সংবাদপত্রগুলো ব্যঙ্গ করে তাদের বিরক্তি প্রকাশ করল।

১১ই অক্টোবর তারিখে ফিনল্যাণ্ডের প্রতিনিধিদল মস্কো এলেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন প্রথমে মৈত্রী প্রস্তাব করে, ফিন্‌রা তাতে অনিচ্ছুক

হওয়ায় সে প্রস্তাব পরিত্যাক্ত হল। তারপর রুশদের তরফ থেকে, লেনিনগ্রাদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছু জমি বিনিময়ের প্রস্তাব করা হল ; রুশরা বলল, লেনিনগ্রাদ যাতে কামানের পাল্লার মধ্যে না পড়ে, তার জন্যে ফিন্-সীমান্তটাকে উপযুক্ত পরিমাণে সরিয়ে নেওয়া হোক ; আর, সাগর পথের উপর যাতে নজর রাখা যায় তার জন্যে কয়েকটা ছোট দ্বীপ রুশিয়াকে দেওয়া হোক। তার পরিবর্তে, রুশিয়া ফিনল্যাণ্ডকে সমান ভালো, কিন্তু যুদ্ধ-কৌশলের দিক থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ দ্বিগুণ জমি দিতে চাইল। তা ছাড়া, রুশিয়া হয় হ্যাঙ্গো, নয়তো ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের প্রবেশ মুখে অন্য কোনো একটা জায়গা নৌঘাঁটির করার জন্যে ৩০ বছরের ইজারা নেওয়ার প্রস্তাব করল— ফিনল্যাণ্ড উপসাগর লেনিনগ্রাদ পর্যন্ত প্রসারিত সরু একফালি জলপথ। ফিনল্যাণ্ডের প্রেসিডেণ্ট কাজাণ্ডার বেতার যোগে বিবৃতি দিলেন যে, রুশিয়ার শর্তাবলী ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় সমগ্রতা ব্যাহত করে না।

একমাস ধরে দরকষাকষি চলল। রুশিয়া আরো বেশী দর দিতে রাজী হল। জমি বিনিময়ের ব্যাপারে ফিনল্যাণ্ডকে তিনগুণ জমি দেওয়ার কথা হল। ঠিক হল, হ্যাঙ্গোর নৌঘাঁটিটা ইজারা দেওয়া হবে ৩০ বছরের জন্যে নয়, যতদিন ইঙ্গ-জার্মানি যুদ্ধ চলবে শুধু ততদিনের জন্যে, আর সেটা ফিনল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দিতে হবে পূর্ণভাবে সুসজ্জিত অবস্থায়। দরাদরিতে তাদের কূটনীতিক বাহাদুরির কথা নিয়ে বহু ফিন্ বড়াই করছিল। তারপর, ফিন্‌রা হঠাৎ আলাপ আলোচনা ভেঙে দিল ; সে সময় তাদের বিবৃতিটা ছিল গূঢ় অর্থপূর্ণ ঃ কোথায় কোন্ পক্ষ এ আলোচনা আবার তুলবে, সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উপর। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রে সংবাদ বেরুল ঃ "ওয়াশিংটনের কূটনীতিক মহলের" ধারণা ফিন্‌রা আমেরিকার কাছে ধার পাওয়ার আশায় প্রভাবিত হয়েছে। যেহেতু ফিনল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট তখনো আহূত পর্যন্ত হয়নি, সেই হেতু মস্কো ধরে নিল যে পশ্চিমের যেসব শক্তি যুদ্ধটাকে রুশিয়ার উপর এনে ফেলতে চায়, তাদেরই গোপন চাপে ফিনল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা এ কাজ করল।

অতএব, নভেম্বরের শেষ দিকে ফিনল্যাণ্ডের কামানশ্রেণী যখন সীমান্ত পার করে গোলা ছুঁড়ে লাল ফৌজের কয়েকজন সৈন্যকে নিহত করল, মস্কো তীব্র প্রতিবাদ জানাল এবং ফিনল্যাণ্ড সে প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করাতে সোবিয়েৎ সৈন্যরা ১৯৩৯ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে ফিনল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ল। ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করে বৈদেশিক সাহায্যের আবেদন জানাল। 'আক্রমণের' অপরাধে সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে জাতিসঙ্ঘ বার করে দিল। সোবিয়েৎ-ফিন্ যুদ্ধে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যত বন্ধু হারাল, খুব কম কাজের জন্যেই সে এত বন্ধু হারিয়েছে। রুশরাও এ যুদ্ধের জন্যে গর্ববোধ করেনি, নিবারণাত্মক যুদ্ধ নিয়ে কোনো দেশই বড়াই করে না। রুশরা সে যুদ্ধকে লেনিনগ্রাদ রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ বলেই মনে করত।

এই সোবিয়েৎ-ফিন্ যুদ্ধটা বুঝতে হলে, এটাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই বিচার করতে হবে ; এ যুদ্ধ ছিল তারই অঙ্গ। ১৯৩৯ সালের শেষভাগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সামগ্রিক আকার ধারণ করেনি। হিটলার তার চেকোস্লোভাকিয়া ও পোলাণ্ডের অধিকারগুলো সংহত করছিলেন। রুশ অগ্রগতির ফলে তাঁর পূর্বদিকে এগোবার আর যা কিছু পরিকল্পনা ছিল সেগুলো রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ পর্যন্ত হিটলার বা পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলো একে অন্যকে ঠিকমত আক্রমণ করেনি। পশ্চিমের রণাঙ্গন তখনো পর্যন্ত 'কথার লড়াই'-এর পর্যায়ে ছিল ;—দুই পক্ষই নিজ নিজ দুর্গে বসেছিল। হিটলার এখনো পশ্চিমের দিকে সর্বাঙ্গীন আক্রমণ চালানোর জন্যে তৈরী হননি ; তার ব্যবস্থা করার জন্যে সময়ের দরকার ছিল। আর হিটলার জানতেন যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে তাঁর বন্ধু আছে ; তাঁরা তাঁর দাবি মেনে নিতে পারেন। সংবাদপত্রের মাধ্যমে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি চাপ দিচ্ছিলেন : ভুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে ; বৃহত্তর শত্রু সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের দরুণই সংবাদপত্রের এ অভিযান আরম্ভ হয়নি। হিটলার যখন পোলাণ্ডের মধ্যে দিয়ে অভিযান চালাচ্ছেন,

তখন থেকেই এ আওয়াজ শুরু হয়েছিল ; এটা ছিল চেম্বারলেনী নীতির জের মাত্র। সুতরাং ফিনল্যাণ্ড যখন আলোচনা ভেঙে দিল, মস্কো ধরে নিল যে, ফিন্‌রা মতলব করেছে, 'সংঘর্ষ' দিয়ে শীতকাল ভোর সীমান্তটাকে গরম রাখবার ; আর তার পরিণতি স্বরূপ বসন্তকালে বড় বড় রাষ্ট্রগুলো মাথা গলাতে আসবে। সুইডেনের বৈদেশিক মন্ত্রী গুয়েন্থার, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর, সুইডেনের নিরপেক্ষ নীতির সমর্থনে বলেন, "ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে আসার ধারণাটা মিত্রশক্তিগুলোর সামনে নতুন সম্ভাবনা খুলে ধরল। 'পশ্চিম রণাঙ্গনে'র অচল অবস্থাটা লোকের ভালো লাগছিল না, আর ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলো নূতন যুদ্ধক্ষেত্রের সন্ধান করার কথা বলছিল।"

শীতকালের বাকি অংশটায় পশ্চিমের লড়াই সম্বন্ধে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় কোনো খবর থাকত না। দুনিয়ায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল ফিনল্যাণ্ডের লড়াইয়ের উপর, সে লড়াইকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমবেত আক্রমণে পরিণত করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর যে চেষ্টা হচ্ছিল তার উপর। মস্কোর লক্ষ্য ছিল বৃহৎ শক্তিগুলো মাথা গলাবার আগেই যুদ্ধ শেষ করা। এ যুদ্ধে রুশরা অনেক সামরিক ও রাজনৈতিক ভুল করেছিল সত্যি ; কিন্তু মার্কিন সংবাদ-সমালোচকরা যত বেশী বলে মনে করল তত নয়।

সামরিক অভিযানটার চারটি পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে লক্ষ্য ছিল, লেনিনগ্রাদ থেকে সীমারেখা দূরে সরানো, আর ফিনল্যাণ্ডের উত্তর-মেরু অঞ্চলীয় বন্দর দখল করা ; যাতে ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বিশ্ব-যুদ্ধটা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের উপর এসে না পড়ে। দু' সপ্তাহের মধ্যে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল ; ভূমি-সীমান্তটা লেনিনগ্রাদ থেকে চল্লিশ মাইল দূরে হটিয়ে দেওয়া হল, আর ফিনল্যাণ্ডের মেরু অঞ্চলীয় বন্দর পেটসামো দখল করা হল। কয়েক দশকের মধ্যে এত বেশী শীত পড়েনি, ফলে অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছুটা নিষ্ক্রিয়তা দেখা গেল। তৃতীয় পর্যায়ে, ফিনল্যাণ্ডের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করা হল ; তার সমর-সংক্রান্ত শিল্প-কারখানা,

রেলপথ, বন্দর, বিমানক্ষেত্র এ সমস্ত তচনচ করা হল। অসামরিক লোকদের মধ্যে হতাহত হল খুব কম; যুদ্ধের সমগ্র কালটার মধ্যে বোমাবর্ষণের ফলে মাত্র ৬৪০ জন অসামরিক লোকের মৃত্যু ঘটেছিল বলে ফিনল্যাণ্ড সংবাদ দেয়।

চতুর্থ পর্যায়ে, ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণী বিদীর্ণ করা হয়। এ দুর্গশ্রেণী ছিল "কোনো কোনো দিক থেকে ফ্রান্সের ম্যাজিনো লাইনের চেয়েও মজবুত।" অভেদ্য বিবেচিত হলেও, একমাসের মধ্যে একটা কুশলী পরিকল্পনার দ্বারা এটাকে খতম করে দেওয়া হল—আক্রমণ করে এত শক্ত দুর্গশ্রেণী এর আগে কখনো দখল করা যায়নি। বড় বড় কামান দিয়ে দুর্গশ্রেণীর নীচের মাটি উড়িয়ে দেওয়া হল; ফলে দুর্গের কামানগুলো বে-লাইনে পড়ে গেল। তারপর দুর্গশ্রেণীর উপর আক্রমণ করা হল। ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণী বিধ্বস্ত হলে, ফিনল্যাণ্ডের প্রতিরোধ ভেঙে পড়ল। ১৯৪০ সালের ১২ই মার্চ তারিখে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হয়ে গেল।

লণ্ডন আর প্যারী (অর্থাৎ বৃটিশ ও ফরাসী সরকার) সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর যাতে না হয়, তার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করল না। বৃটেন ফিনল্যাণ্ডের সন্ধি করার আবেদন (রুশদের) হাতে এগিয়ে দিতে রাজী হল না; কাজেই সুইডেন মধ্যস্থতা করল। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের ফিনল্যাণ্ডকে জানাল যে, একদল ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য তাকে সাহায্য করার জন্যে জাহাজে ওঠার অপেক্ষা করছে, আর ফিনল্যাণ্ড যদি এ সাহায্য না চায়, মিত্রশক্তিরা যুদ্ধের পর তাকে টিকে থাকার সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত ভরসাও দেবে না। চেম্বারলেন আর দালাদিয়ের এই ইঙ্গ-ফরাসী অভিযাত্রী সৈন্যদের সুইডেনের মধ্যে দিয়ে ফিনল্যাণ্ডে যেতে দেওয়ার জন্যে সুইডেনের সরকারের উপর চাপ দিলেন,—যদিও তার ফলে সুইডেন যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ত। ১০ মার্চ তারিখে চেম্বারলেন কমন্সসভায় জানালেন যে, সুইডেনের নিরপেক্ষতা ভাঙবার এবং ফিন্‌দের যুদ্ধটাকে চালিয়ে যেতে বাধ্য করার উপায় চিন্তা করছেন তিনি। ১১ই মার্চ তারিখে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' পত্রের লণ্ডনস্থ

সংবাদ-দাতা তার করলেন, "ব্যাপকতর রণাঙ্গনে এবং রুশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধের গুজবে লণ্ডন গুঞ্জিত হয়ে রয়েছে।"

এ গুঞ্জন তোলা হল বড় বিলম্বে। সুইডেনের নিরপেক্ষ থাকার জিদ, আর সোবিয়েতের শক্তি সম্পর্কে জেনারেল ম্যানারহাইমের অবজ্ঞার ফলে, ইঙ্গ-জার্মান যুদ্ধকে সোবিয়েৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে সারা পৃথিবীর যুদ্ধে পরিণত করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ম্যানারহাইম তাঁর ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রদের জানিয়ে দিলেন, মে মাসের আগে তাঁর কোনো সাহায্যের দরকার হবে না; চেম্বারলেন আশা করেছিলেন, ঐ সময় নাগাদ তিনি সুইডেনকে ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যদের জন্যে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারবেন। ফিন্‌রা বা বৃটিশরা স্বপ্নেও ভাবেনি যে, একটা শীতকালীন আক্রমণে ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণী বিদীর্ণ হয়ে যাবে। যে সময় সৈন্য-সাহায্যের দরকার হবে বলে ম্যানারহাইম মনে করেছিলেন, তার দু'মাস আগেই ফিন্‌দের সন্ধি প্রার্থনা করতে হল, আর সোবিয়েৎ-ফিন্ যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল।

সন্ধি-শর্তে, সোবিয়েৎ রুশিয়া ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণী ও হ্যাঙ্গোর নৌঘাঁটি দখল করল, স্থল ও জল পথে লেনিনগ্রাদে যাওয়ার পথ রক্ষিত হয়ে গেল। রুশিয়া কিন্তু পেটসামো বন্দর আর সেখানকার নিকেল খনিগুলো ফেরৎ দিল, কোনো ক্ষতিপূরণ চাইল না, বরং উপবাসী ফিনল্যাণ্ডকে খাদ্য জোগাতে রাজী হল। সন্ধি-শর্ত হিসেবে রুশিয়া যা নিল তা মোটেই বেশী নয়। ১৯৪০ সালে মস্কোতে বৃটিশ দূত ছিলেন সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্। তাঁর দূতাবাসে চা-পানের আসরে তিনি আমায় বললেন, যখন বেশী নেওয়া চলত, তখন বেশী আদায় না করার জন্যে রুশদের একদিন আপসোস করতে হতে পারে। তিনি পেটসামোর কথা ভাবছিলেন, পেটসামো কিছুদিন পরেই মুরম্যান্‌স্কগামী মিত্রপক্ষীয় জাহাজের বিরুদ্ধে নাৎসীদের একটা ঘাঁটি হয়ে যায়। কিন্তু সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স্-এরই ভুল হচ্ছিল; তাঁর চেয়ে স্তালিনের রাজনৈতিক বুদ্ধি অনেক বেশী ছিল। সন্ধি-শর্ত কড়া না করে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বুদ্ধির কাজই করেছিল। লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার জন্যে যা

স্পষ্টতঃই দরকার, তার চেয়ে বেশী দাবি করা হলে, সুইডেনের নিরপেক্ষতা হয়তো টলে যেত। তা হলে, শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বযুদ্ধ হিটলারের বিরুদ্ধে পরিণতি লাভ না করে, এক বছর আগেই সোবিয়েতের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধরূপে দানা বাঁধতে পারত।

ফিন্‌দের সঙ্গে এ লড়াই-এ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডের বাইরেও লাভবান হল। পোলাণ্ডের অভিযান থেকে ফিন্‌দের সঙ্গে সন্ধি করা পর্যন্ত সোবিয়েতের একটার পর একটা কাজ দেখে পূর্ব ইউরোপের বিশ্বাস হল যে, রুশিয়া শক্তিমান, সে জানে সে কি চায় এবং তা পাওয়ার জন্যে যুদ্ধ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত; কিন্তু তার দাবি যুক্তিসঙ্গত, এবং তার দাবির সীমা আছে। একটা জিনিস সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ১৯৪০ সালে স্পষ্টই চাচ্ছিল; বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত একটা প্রশস্ত নিরপেক্ষ বেষ্টনী।

সুতরাং রোমানিয়া বুঝল, তার বেসারাবিয়া ফেরৎ দেওয়ার সময় হয়েছে। ১৯১৮ সালে শিশু সোবিয়েৎ রাষ্ট্র যখন দুর্বল ছিল, সে সময় রোমানিয়া এ জায়গাটা দখল করে নেয়। এখানকার লোকেরা জাতিতে রোমানিয়ান নয়; ছ' বছরে এরা ১৫৩টা বিদ্রোহ করেছিল। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন রোমানিয়ার এই জবরদস্তি অধিকার কোনো দিন মেনে নেয়নি; তবে তার জন্যে যুদ্ধ করতে যাওয়ার কথাও চিন্তা করেনি। ঠিক মুহূর্তের জন্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বিশ বছর অপেক্ষা করেছিল। হিটলার যখন ফ্রান্স জয় করতে ব্যস্ত, মস্কো রোমানিয়ার কাছে বেসারাবিয়া ফেরৎ চাইল, বিনাযুদ্ধে পেয়েও গেল। দানিয়ুব নদীর উজান বেয়ে আবার সোবিয়েৎ জাহাজ চলতে লাগল, দানিয়ুব নদীর বদ্বীপের একটা শাখা হল সোবিয়েতের সীমান্ত।

এইভাবে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত—বাল্টিক সাগরের উপর হ্যাঙ্গো বন্দর থেকে কৃষ্ণ সাগরে দানিয়ুবের মুখ পর্যন্ত প্রসারিত—দীর্ঘ নিরপেক্ষ বেষ্টনী সম্পূর্ণ হল; এমন সময় পশ্চিম ইউরোপে ধ্বংসরত হিটলার পূর্বাভিমুখী হলেন।

হিটলার বলেছিলেন, রুশিয়া বেসারাবিয়া দখল করার ফলেই বৃটেন জার্মান আক্রমণ থেকে বেঁচে যায়। হিটলার একটু বড়াই করেছিলেন বটে, তাঁর রুশিয়া আক্রমণের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্যে একটা মামলা খাড়া করেছিলেন বটে, তবু তাঁর এ উক্তির তলে একটা সত্য ছিল। সেটা বোঝার জন্যে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে পশ্চিম রণাঙ্গনের যুদ্ধের দিকে।

যতদিন ফিন্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল, হিটলার পশ্চিমের বিরুদ্ধে ঠিকমত আক্রমণ চালাননি ; তার কারণ আগে বলা হয়েছে। কিন্তু ১৯৪০ সালের বসন্তকালে, জার্মানরা পশ্চিমের বিরুদ্ধে একটা দ্রুত এবং সার্থক ঝটিকা-আক্রমণ শুরু করল। তারা ডেনমার্ক আর নরওয়ে দখল করল, হল্যাণ্ড আর বেলজিয়ামকে বিদলিত করে এগারো দিনের মধ্যেই ফরাসী বাহিনীকে একেবারে পর্যুদস্ত করে দিল। তারা ইউরোপের অতলান্তিক উপকূল দখল করে বৃটেন আক্রমণের প্রস্তুতি করে নিল। এর আগেই বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ফরাসী ভূমিতে পরাজয়ের দরুণ বিশৃঙ্খল হয়ে তাদের সবচেয়ে ভালো সমরসজ্জা ডানকার্কের বেলা-ভূমিতেই ফেলে পালিয়েছিল। সেবার গ্রীষ্মকালে আমি বার্লিন হয়ে মস্কো যাচ্ছিলাম ; দেখলাম, জার্মানরা বড়াই করছে, তারা হেমন্তের প্রথমেই লণ্ডন দখল করে ফেলবে। সকল দেশেরই সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই আক্রমণের আশঙ্কা করছিল ; প্রায় সকলেই বলছিল যে বৃটেনের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। বৃটেনের সঞ্চিত স্বর্ণ কানাডায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; সংবাদপত্রের স্তম্ভ-লেখকরা বৃটিশ সরকারের স্থানান্তর যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনাকল্পনা করছিল।

হঠাৎ হিটলার অতলান্তিক উপকূল থেকে তাঁর প্রধান সৈন্যবাহিনী-গুলোকে সরিয়ে, ইউরোপ পার করে তাদিকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে বল্কানে নিয়ে গিয়ে ফেললেন। তিনি উত্তরকালে এর কারণ দেখিয়েছিলেন যে, রুশিয়া যখন পশ্চাৎ ভাগের এলাকা অধিকার করে নিচ্ছিল, তখন বৃটেন আক্রমণ করার জন্যে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন, সেটা তিনি ব্যয় করতে রাজী ছিলেন না। বেসারাবিয়া ছিল শস্য-সমৃদ্ধ

অঞ্চল; এটা সোবিয়েৎ রুশিয়ার হাতে যাওয়ায় হিটলারের আর্থিক ভিত্তিতে ধাক্কা লাগল আর বল্কানের নাৎসীবিরোধী শক্তিগুলো চঞ্চল হয়ে পড়ল। সুতরাং হিটলারের দরকার হল, প্রথমে বল্কানটা সাফ করা।*

বল্কানের লড়াইটা বেশী দিন চলবে বলে হিটলার মনে করেননি। যে অঞ্চলের উপর তাঁকে খাদ্য ও তৈলের জন্যে নির্ভর করতে হচ্ছিল, সেখানে দীর্ঘকাল যুদ্ধ হলে তাঁর সমূহ ক্ষতি। তাঁর স্বার্থ ছিল, অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশের দ্বারা অঞ্চলটাকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা সেখানকার ফসল বা শিল্প-কারখানাগুলো নষ্ট না করে তড়িৎ আক্রমণের দ্বারা দখল করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল, বল্কান উপদ্বীপকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মজবুত করে নেওয়া, গ্রীসে বৃটিশ-গ্রীক সৈন্য-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা, আর, তারপর তুরস্ক ও আফ্রিকার মধ্য দিয়ে যুগপৎ এগিয়ে গিয়ে পূর্ব ভূমধ্যসাগর ও সুয়েজ অধিকার করে বসা। বৃটেনের জন্যে মার্কিন সাহায্য বেড়ে চলছিল, দ্বন্দ্ব শীঘ্র শেষ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না। সুতরাং হিটলারের দরকার হয়ে পড়েছিল 'নিকট প্রাচী'র তৈল।

ফন্ রিবেনট্রপ উত্তরকালে বলেছিলেন, "সেই সময় থেকে রুশিয়ার জার্মানবিরোধী নীতি আরো স্পষ্ট দেখা গেল।" সোবিয়েৎ ইউনিয়ন যে তলে তলে জার্মানদের বল্কান অভিযানের ক্ষতি করেছিল, তার গতি মন্থর করে দিয়েছিল—সেই কথাটাই রিবেনট্রপ এইভাবে বলেন।

* সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষাণায় হিটলার বলেছিলেন: "১৯৪০ সালের ৫ই মে তারিখ থেকে আমাদের সৈন্যরা যখন পশ্চিমে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে ভেঙে ফেলছিল, রুশ সামরিক সৈন্য স্থাপনা তখন ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তাই ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে থেকে আমি ভাবছিলাম যে, আমাদের পূর্বদিকের রাজ্যগুলোকে অরক্ষিত রাখা জার্মান 'রাইখ্' (রাজ্য অর্থাৎ সাম্রাজ্য)-এর স্বার্থের আর অনুকূল নয়।···ফলতঃ, দেখা গেল যে, বৃটিশ-সোবিয়েৎ সহযোগিতা পূর্বদিকে আমাদের এত বেশী শক্তিকে আটকে ফেলছে যে, উচ্চতম জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে পশ্চিমের লড়াইটা পুরোপুরি শেষ করার নিশ্চয়তা দেওয়া সম্ভব ছিল না।"—লেখিকা

সেটা করা হয়েছিল, কূটনৈতিক পত্র দ্বারা ঃ বুলগেরিয়া নতি স্বীকার করায় তার কাছে প্রতিবাদ জানিয়ে, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করে ; জার্মান সৈন্যদের যদি তুরস্কের মধ্য দিয়ে যাওয়াতে বাধা দেওয়া হয়, তা হলে রুশিয়া তুরস্কের সে কাজকে 'সহানুভূতির চোখে দেখবে' বলে জানিয়ে দিয়ে। ফন্ রিবেন্ট্রপ অভিযোগ করেন যে, "সোবিয়েৎ ইউনিয়ন গোপনে যুগোস্লাভিয়াকে অস্ত্রসজ্জিত হতে সাহায্য করেছে।" সেবার গ্রীষ্মকালে মস্কোর সব সংবাদ-দাতাই জানত যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়ায় খাদ্য পাঠাচ্ছিল। অস্ত্র যদি পাঠিয়েও থাকে, নিরপেক্ষ জাতি হিসেবে তার তা করার অধিকার ছিল, জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির শর্তাবলীতেও এতে তার কোনো বাধা ছিল না। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন জার্মানির বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণে অংশ নেবে না—এই ছিল সে চুক্তি ; "হিটলার যাদের আক্রমণ করতে চান তাদের" সাহায্য করা নিশ্চয়ই আক্রমণ বলে গণ্য হতে পারে না।

ইতিমধ্যে, এস্তোনিয়া, লাৎভিয়া ও লিথুয়ানিয়া—এই তিনটি ছোট বাল্টিক রাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে একটা দ্রুত আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলছিল। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সামরিক মৈত্রী-চুক্তি ছিল ; তারা তাকে নৌঘাঁটি দিয়েছিল ; কিন্তু তাদের সরকারগুলো ছিল আধা-ফাসিস্ট একনায়ক-চালিত, কতকটা নাৎসী-ঘেঁসা। হিটলারের পূর্বমুখী অভিযানে এই সব রাজ্যের নাৎসীপক্ষীয় দলগুলো উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। "ইউরোপের বিশৃঙ্খল অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে দেখে" সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ঐ তিনটি দেশে আরো বেশী সংখ্যায় সৈন্য পাঠানোর অধিকার দাবি করল। ১৯৪০ সালের ১৫ই জুন তারিখে মিত্রশক্তি হওয়ার দাবিতে লাল ফৌজের একটা বৃহৎ দল এ তিন রাজ্যে প্রবেশ করল। স্থানীয় জার্মান-ভক্ত সরকারী কর্মচারীরা পালিয়ে গেল।

ভিল্নাস্থ এক সংবাদ-দাতা জানালেন ঃ "প্রায় ২৪ ঘণ্টার দূরত্বে স্তালিন হিটলারকে পরাজিত করে বাল্টিক সাগরে ঠেলে দিয়েছে।"

আমি যে সব লিথুয়ানীয় লোকের সঙ্গে আলাপ করেছি, তারা এ কথায় সায় দিয়েছিল।

সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন বার্লিন হয়ে মস্কো যাচ্ছিলাম। লিথুয়ানিয়ায় কি ঘটেছে শুনে আমি রয়ে গেলাম; দেখলাম—ভেতর হতে রাষ্ট্রশক্তি দখলের একটা বিস্ময়কর চিত্র। সব ব্যাপারটা মজাসে ঘটল, অথচ সংবিধানসম্মতও হল। জার্মান-ঘেঁষা রাষ্ট্রপতি সরে পড়ায় উপ-রাষ্ট্রপতি হলেন রাজ্যের প্রধান। তিনি এক নতুন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করে পদত্যাগ করলেন। ফলে, জাস্টাস্ পালেৎস্কিস্ বলে একজন প্রগতিশীল সাংবাদিকের হাতে ক্ষমতা এল। রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হল; ট্রেড ইউনিয়নগুলো স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে লাগল; সব রকমের সংস্থা সজীব হয়ে উঠল। রাজধানী কৌনাসের রাস্তায় রাস্তায় দিবারাত্র অবিরাম গান চলতে লাগল। 'জনসাধারণের সরকার' গঠনের জন্যে নতুন নির্বাচনের অনুষ্ঠান হল। দলে দলে লোক ভোট দিয়ে গেল। নতুন আইনসভার অধিবেশন বসল; এই সভা ঘোষণা করল যে, অতঃপর লিথুয়ানিয়া একটা সোবিয়েৎ সাধারণতন্ত্র। এই নতুন সাধারণতন্ত্র সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে প্রার্থনা জানাল। এই সমস্ত সময়টিতে চাষীরা, মজুররা নাৎসী-ঘেঁষা একনায়কত্বের পতনে উল্লসিত হয়ে, মনে করছিল যে, সব কিছুতে তারা নিজেদের ইচ্ছাকেই প্রকাশ করছে। লাল ফৌজ রাজনীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েনি, কেবল ভ্রাতৃত্ব-সূচক সমতার ভিত্তিতে লিথুয়ানিয়ার বাহিনীর সঙ্গে মিলে মিশে 'বল নাচ' আর থিয়েটারের ব্যবস্থা করেছিল।

সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে মস্কোর যে কোনো হাত আছে, এ কথা আমি একবার মাত্র বলতে শুনেছি। কৌনাসের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর মনে হল সব কিছু অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। তারা চাচ্ছিল: আরো ধীরে সুস্থে নির্বাচন, নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আর বাগবিতণ্ডা। চাষী মজুরদের এসবের জন্যে মোটেই দুশ্চিন্তা ছিল না; তারা ইউনিয়নে ইউনিয়নে শ্লেট খাড়া করে ভোট দিয়ে যায়। কিন্তু পশ্চিমী

ভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবীদের তাতে মন ওঠেনি, তাদের বোধ হয়েছিল আরো সময়ের দরকার।

একটা মেয়ে অনুযোগ করাতে টেলিগ্রাফ এজেন্সির বড়কর্তা বললেন, "আমাদের অনেকে মনে করেন, জিনিসটা বড় তাড়াতাড়ি ঘটল। আমি শুনেছি, পালেৎস্কিস্ সোবিয়েৎ ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির জন্যে ছ'মাস সময় চেয়েছিলেন; কিন্তু মলোটভ বললেন 'অত সময় নেই।"

যারা শুনছিল তারা বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল। যে মেয়েটি অনুযোগ করেছিল, সে বলল: "আপনি চান আমরা হিটলারের খপ্পরে পড়ে যাই? তা যদি হয়, রুশরা আমাদের তাড়াতাড়ি ভিড়িয়ে নিক।"

১৯৪০ সালের ২১শে জুলাই তারিখে লিথুয়ানিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যে আবেদন করল। আমি লিথুয়ানিয়ার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে একই স্পেশাল ট্রেনে মস্কো গেলাম; সমস্ত পথটায় এই প্রতিনিধিদলকে লোকে মালা পরিয়ে এবং নিজেদের প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে অভ্যর্থনা জানালে। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে, মস্কোর সুপ্রীম সোবিয়েৎ তিনটি নতুন সাধারণতন্ত্রকে স্বাগত জানাল; এস্তোনিয়া, লাৎভিয়া, লিথুয়ানিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। পালেৎস্কিস্ বললেন: "আমাদের সমাজতন্ত্রে যাওয়ার পথ হয়েছে সোজা,—এমনটা আর কখনো হয়নি। আমরা এটা করেছি লিথুয়ানিয়ার জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে, সাংবিধানিক রীতিতে। কৌনাস থেকে ব্লাদিভোস্তক পর্যন্ত; বাল্টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত কোথাও কোনো সীমান্ত রেখা নেই।"

মস্কোর রাজনৈতিক পরিকল্পনার একটা ওস্তাদি দেখা গেল এখানে—লিথুয়ানিয়ার লোকের ইচ্ছেতেই সব কিছু সাধিত হল; মস্কো জানত সে ইচ্ছে কি করে জাগাতে হয়।

সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এখন বাল্টিক উপকূলে শক্ত হয়ে দাঁড়াল—যে কোনো ভবিষ্যৎ পরীক্ষার জন্যে তৈরী হয়ে।

বল্কানে জার্মান অভিযান গড়িয়ে চলল। জার্মান সৈন্যরা গ্রীকদের পর্যুদস্ত করে বৃটিশদের দক্ষিণ গ্রীস থেকে সাগরের জলে নিয়ে ফেলল। ভয় দেখিয়ে তারা রোমানিয়া আর বুলগেরিয়াকে পদানত করল, যুগোস্লাভিয়া প্রতিরোধ করায় সে দেশকে তারা তচনচ করে দিল। তারা তুরস্কের সীমান্তে এসে পৌঁছল। বিশেষজ্ঞরা ভবিষ্যৎ বাণী করলেন, তাদের পরের চাল হবে দার্দানেলেজের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তুরস্কের উপর রুশিয়ার চাপের সঙ্গে বৃটিশদেরও চাপ যুক্ত হওয়ায় কাজ হল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, এবার সুয়েজের পতন হবে; গুজব উঠল, হিটলারের সৈন্যরা সিরিয়ায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু হিটলারের সৈন্যরা তখন অন্য দিকে চলছিল—সোবিয়েৎ সীমান্তের দিকে।

হিটলার দেখলেন, তাঁর বিশ্ব-শাসনের পথে অব্যবহিত বাধা হচ্ছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন। অনাক্রমণ চুক্তি নিয়ে বাইশ মাসের মধ্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তিনবার নাৎসীদের অগ্রগতি রোধ করেছে। সোবিয়েতের পোলাণ্ড অভিযানের ফলে হিটলারের পূর্বাভিমুখী গতি এক বছরের মতো আটকে গিয়েছিল; সোবিয়েৎ বেসারাবিয়ায় ফিরে যাওয়ায়, তাঁকে বৃটেনে অভিযান করা থেকে পিছিয়ে আসতে হয়। আর বল্কান ও বাল্টিক রাজ্যগুলায় মস্কোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে দার্দানেলেজে তাঁকে দেরি করিয়ে দিয়েছে।

হিটলার দেখলেন, পোল্, দিনেমার, নরওয়েজিয়ান্, ওলন্দাজ, বেলজিয়ান্, ফরাসী, গ্রীক, যুগোস্লাভ, বৃটিশ—ইউরোপের সমগ্র সশস্ত্র শক্তি একত্রে মিলে তাঁকে যত বাধা না দিতে পেরেছে, এক নিরপেক্ষ সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তার চেয়ে বেশী বাধা দিচ্ছে। সুতরাং তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে ঘা দিলেন—এত প্রচণ্ড আক্রমণ মানুষের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি

সমগ্র জাতির যুদ্ধ

১৯৪১ সালের ২২শে জুন তারিখে ভোর বেলায় হিটলার সোবিয়েৎ ইউনিয়নের উপর আকস্মিক আক্রমণ করলেন। হাজার হাজার জার্মান বিমান বিমানক্ষেত্রগুলোর উপর বোমাবর্ষণ করল, হাজার হজার ট্যাঙ্ক সীমান্ত বিধ্বস্ত করে এগিয়ে এল, তাদের পিছনে লক্ষ লক্ষ মোটর-বাহিত সৈন্য। হিটলার দাবি করলেন, "তুনিয়ার ইতিহাসে এত বড় সামরিক অভিযান আর কখনো হয়নি।" কথাটা অত্যুক্তি নয়। ঐ আক্রমণের ফলে, পৃথিবীর বৃহত্তম ত্ব'টি বাহিনী, মানবজাতির সবচেয়ে বড় ভাগ্য নির্ণয়ের দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হল।

জার্মানরা সদ্য ইউরোপ জয় করে এসেছিল। এক বছর ধরে তারা এ আক্রমণের জন্যে ভূমি তৈরি করেছিল। পোলাণ্ডে সামরিক লক্ষ্য নিয়ে রাস্তা তৈরি করে, রোমানিয়া অধিকার করে, ফিনল্যাণ্ডে সৈন্য পাঠিয়ে তারা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ১৮০০ মাইলব্যাপী পশ্চিম সীমান্ত বরাবর পৌঁছে গেল—এ সীমান্ত ভ্যাঙ্কুবার থেকে বাফালো পর্যন্ত বিস্তৃত কানাডার সীমান্তের সঙ্গে তুলনীয়। উত্তরে, তারা ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও উত্তর মেরুর বন্দর মুরম্যানস্কের দিকে; মধ্যে, পোলাণ্ড থেকে মস্কোর দিকে; আর দক্ষিণে, রোমানিয়া থেকে কিয়েভ আর ওডেসার দিকে এগিয়ে গেল। হিটলার বড়াই করলেন, ৯০ লক্ষ লোক রণাঙ্গনে নেমেছে, আরো বহু লক্ষ লড়াই করার অপেক্ষায় মজুত আছে।

বার্লিন, লণ্ডন আর ওয়াশিংটনের ধারণা ছিল, রুশদের প্রতিরোধ এক মাসের ঝটিকা-আক্রমণের ফলে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। একপক্ষ কেটে গেল, ওয়াশিংটন সাবধানী হয়ে স্বীকার করল: "জার্মানরা এর আগে কখনো এত প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি।" ছ' সপ্তাহের মধ্যে আমেরিকা আর বৃটেন এ লড়াইটা নতুন করে যাচাই করতে শুরু করল। উইনস্টন চার্চিল ইতিমধ্যে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী

হয়েছিলেন ; তিনি বেতারে রুশদের 'চমৎকার নিষ্ঠার' প্রশংসা করলেন, তাদের সামরিক সংগঠনের নৈপুণ্য লক্ষ্য করলেন। ২০শে আগস্ট তারিখে ('ওয়ার্ল্ড-টেলিগ্রাম') রেমণ্ড ক্ল্যাপার লণ্ডন থেকে তার করলেন : "রুশিয়া বিজয়ের একটা নতুন ছক খুলে ধরেছে। জয়ের উদ্দেশ্যে এমন পর্যাপ্ত ও স্বতঃপ্রবৃত্ত জনবল এর আগে কখনো হিটলারের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি।"

খ্রুশ্চেভ স্তালিনের উপর তাঁর ১৯৫৬ সালের আক্রমণে বলেছেন যে, জার্মানদের অতর্কিত আক্রমণ স্তালিনকে বিস্মিত করেছিল, তিনি তার জন্যে ঠিকমত সমরায়োজন করেননি। খ্রুশ্চেভ বলেছেন, জার্মানরা সোবিয়েৎ ভূমি আক্রমণ করার পরও স্তালিন সেটাকে 'উত্তেজক, অনিয়ন্ত্রিত কাজ' বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, লড়াই করে তাদের তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেননি। সে কথা খ্রুশ্চেভই জানেন। এটা নিশ্চিত যে জার্মানরা ভূমির উপরই অনেক সোবিয়েৎ বিমান ধ্বংস করে দিয়েছিল, আমেরিকানদের সম্পর্কে পার্ল হারবারে যেমন করেছিল জাপানীরা ; প্রথম আক্রমণকারীর এ সুযোগটা থাকেই। কিন্তু লাল ফৌজ ২২শে জুনের সে আক্রমণ সম্বন্ধে অনবহিত ছিল না ; তার প্রতিরক্ষা-চেষ্টা দেখে পৃথিবীর লোক বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল। তার আগেকার সীমান্তের ঘটনাবলী সম্বন্ধে স্তালিন যদি উদাসীন থেকেও থাকেন, তাঁর উদাসীন থাকার কারণ ছিল ; মনে হয়, সে কারণটা খ্রুশ্চেভ ধরতে পারেননি। **শুধু অস্ত্রবলের উপর এই যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করছিল না ; নির্ভর করছিল পৃথিবীর লোক কোন পক্ষে যোগ দেবে, তারই উপর।**

তাঁর যুদ্ধকালীন প্রথম বেতার-বক্তৃতায়, স্তালিন এই ইঙ্গিতটা করেন। এই বক্তৃতায়, জার্মানদের আক্রমণ শুরু হবার দু' সপ্তাহ পরে, তিনি সোবিয়েতের লোকদের জানান যে, শত্রু অনেকখানি এলাকা দখল করেছে ; তিনি আভাস দেন, শত্রু আরো জমি দখল করবে। তিনি বল্লেন, কিন্তু তাতে আতঙ্কগ্রস্ত হবার কারণ নেই। "অজেয়-বাহিনী বলে কোনো বাহিনী আজ পর্যন্ত হয়নি, হবে না।" আকস্মিক-

ভাবে আক্রমণ করে জার্মানি সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা লাভ করলেও "রক্তপিপাসু আক্রমণকারী হিসেবে নিজের রূপ খুলে ধরে রাজনীতির দিক থেকে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে"। সোবিয়েতের পাল্টা রণনীতি হবে **সমগ্র জাতির যুদ্ধ**। সৈন্যবাহিনীকে "লড়তে হবে প্রতি ইঞ্চি সোবিয়েৎ মাটির জন্যে," তবে "পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হলে," যা কিছু মূল্যবান সবই সরিয়ে কিংবা নষ্ট করে ফেলতে হবে। তিনি আশ্বাস দিলেন, "ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে আমাদের বিশ্বাসী মিত্র আছে।" দেশের স্বাধীনতার জন্যে আমাদের এই যুদ্ধ, "ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলোর গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্যে লড়াইএর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে।" তিনি তাদের ডাক দিলেন শুধু প্রতিরোধের জন্য নয়, "বিজয়ের পথে" অগ্রসর হওয়ার জন্যে।

বিশ বছরের উপর সোবিয়েতের জনসাধারণ এই আক্রমণের জন্যে তৈরী হচ্ছিল, কিন্তু এ যুদ্ধ তারা সব চেয়ে যেটা বেশী ভয় করত তা থেকে অন্য আকার নিল। তারা ভয় করত, সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশের সমবেত আক্রমণ ; তারা ভয় করত, সমস্ত দুনিয়া সোবিয়েৎ ইউনিয়নের বিপক্ষে দাঁড়াবে। এটা হতে পারত, দু'বছর আগে, রুশিয়া যদি পোলাণ্ডে গিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, যখন চেম্বারলেন প্রধান মন্ত্রী। এটা নিশ্চিত ঘটতে পারত, ফিন্‌দের সঙ্গে যুদ্ধটা যদি ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্যরা এসে যাওয়া পর্যন্ত গড়াত ; এটা হলেও হতে পারত, হিটলারের বল্কান অভিযানের সময় রুশরা যদি তাঁকে আক্রমণ করত —যেমন একজন বৃটিশ কূটনীতিক আমাকে বলেছিলেন, "হিটলার নানা জয়ের দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করে তোলার আগেই," রুশদের উচিত ছিল তাকে আক্রমণ করা।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্তালিন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে স্তালিন দেখেছিলেন, অনাক্রমণ চুক্তির বাইশটি মাস হিটলার ইউরোপের ধনদৌলত ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করতে কাজে লাগিয়েছেন ; কিন্তু এই ক'মাসে ইউরোপ ও দুনিয়ার

লোকে নাৎসী শাসনের আসল রূপটা বুঝে নিয়েছিল। হিটলার যখন জয়ের পর জয় করছিলেন, ইউরোপের উচ্চতর শ্রেণীর কোনো কোনো অংশ তাঁকে সমর্থন করত। এমনকি সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকে জার্মানদের 'নব বিধানে'র সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল; তাদের আশা ছিল, এই নব বিধানে ইউরোপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। দু'বছরের মধ্যে দেখা গেল, নাৎসীরা 'ইউরোপের যুক্তরাষ্ট্র' পত্তন করেনি, বিজয়ী জার্মান জাতি ছাড়া আর সকলের জন্যে তারা নিয়ে এসেছে নিছক দাসত্ব আর বুভুক্ষা। লক্ষ লক্ষ ইহুদী আর স্লাভ জাতীয় লোক বন্দী নিবাসে মারা যাচ্ছিল। হিটলারের বিরুদ্ধে দুনিয়ার শক্তি সমাবেশ গড়ে তুলতে ইউরোপের ঘনায়মান ঘৃণা কাজ করেছে; হিটলারের বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার হিসেবে আমেরিকার গভীর প্রতিশ্রুতিও এ ব্যাপারে কাজ করেছে; স্তালিন যেমনটি বলেছিলেন, দুনিয়ার শক্তি-সমাবেশ গড়ে তুলতে নাৎসীদের আকস্মিক নির্লজ্জ আক্রমণের ব্যাপারটাও কাজ করেছিল।

হিটলার ডাক দিয়েছিলেন, "বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে পবিত্র ধর্মযুদ্ধে"র জন্যে; সে ডাকে যখন কেউ সাড়া দিল না, দুনিয়ার নূতন শক্তি-সমাবেশের প্রথম লক্ষণ তখনই প্রকাশ পেল। অনেকেই আশা করেছিল, পোপ্ দ্বাদশ পিয়াস্ হয়তো বলশেভিকদের ঈশ্বরদ্রোহী বলে ঘোষণা করবেন। তিনি তা করলেন না। অনেকে ভেবেছিল, বলশেভিকদের পুরানো শত্রু চার্চিল হয়তো নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করবেন। কিন্তু চার্চিল উদাত্তকণ্ঠে রুশিয়াকে সমর্থন করলেন, "যে কেউ নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে লড়বে, সেই আমাদের সাহায্য পাবে। রুশদের বিপদ, আমাদেরও বিপদ।" চতুর্থ সপ্তাহে, বৃটেন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করল। ইউরোপের যেসব নির্বাসিত সরকার লণ্ডনে আশ্রয় নিয়েছিল তারা এ ব্যাপারে বৃটেনকে অনুসরণ করতে তৎপর হল;—একদিন দেশে ফিরতে পারার সম্ভাবনা, এই প্রথম তারা দেখতে পেল।

আনে উ'হেয়ার ম্যাক্‌কর্‌মিক 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে' লিখলেন, "রুশিয়ার ছয় সপ্তাহের প্রতিরোধ দেখে লণ্ডন, ওয়াশিংটন এবং নির্বাসনগত ইউরোপীয় সরকারদের মত বদলে গেছে।' তা দেখে 'কারারুদ্ধ ইউরোপে'রও মত বদলে ছিল। ইউরোপে গুপ্ত প্রতিরোধের আন্দোলন দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠল। ১৯৪১ সালের হেমন্তকাল নাগাদ ইউরোপের গুপ্ত প্রতিরোধীদের লড়াই বেশ গুরুত্ব লাভ করল। হিটলারের বিরুদ্ধে রুশদের প্রতিরোধ ও বিভিন্ন নির্বাসিত সরকারের সঙ্গে তাদের মৈত্রী-চুক্তির ফলে ইউরোপের নাৎসীবিরোধীরা ঐক্যবদ্ধ হল—কমিউনিস্ট থেকে রাজতন্ত্রী পর্যন্ত, সমস্ত নাৎসাবিরোধী লোকেই প্রতিরোধে যোগ দিল। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম দিককার দিনগুলোতে, আমেরিকা, বৃটেন ও ইউরোপে সোবিয়েৎ-বিরোধিতা কত প্রবল ছিল সে কথা স্মরণ করলে, সিনেটর হ্যারি ট্রুম্যান যখন বলেছিলেন, "জার্মানরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত রুশদের সাহায্য করা, আর রুশরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত জার্মানদের সাহায্য করা, এই ভাবে ওরা যত পারে লোক খুন করুক" * —সে সময়ের কথা স্মরণ করলে, স্তালিন যে হিটলারের আকস্মিক আক্রমণ রুশিয়ার অনেকটা ভিতরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করেছিলেন, বোধ হয় সেটাকে তাঁর নির্বুদ্ধিতা বা অবহেলার পরিচায়ক মনে করা যায় না।

লাল ফৌজের প্রস্তুত না থাকার সম্বন্ধে ১৯৫৬ সালে খ্রুশ্চেভ যে মত প্রকাশ করেছেন, দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা সে মত পোষণ করতেন না। তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করেছিলেন। ১৯৪১ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে জর্জ ফিল্‌ডিং এলিয়ট লিখেছিলেন, "জার্মানদের এই প্রথম সম্মুখীন হতে হয়েছে এমন একটা বাহিনীর, যা ১৯১৮ সালের যুদ্ধের জন্যে শিক্ষিত হয়নি, যা শিক্ষিত হয়েছে ১৯৪১ সালেরই যুদ্ধের জন্যে।" তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন খুব বেশী গভীরতা-বিশিষ্ট রক্ষাব্যূহ ব্যবহার

* নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌, ২৪শে জুন, ১৯৪১

করেছে, এবং তার প্রতিটি স্থান সাহসের সঙ্গে লড়াই করে দখলে রেখেছে, বিমান-আক্রমণ থেকে তাদের কামান-শ্রেণীকে রক্ষা করার জন্যে চমৎকার চাতুর্যপূর্ণ ছদ্মরূপায়ণের ব্যবস্থা করেছে, জার্মান পান্‌ৎসার (সাঁজোয়া) বাহিনীর বিরুদ্ধে সচল প্রতি-আক্রমণকারী সৈন্যদল নিয়োগ করেছে, ভূমিস্থ সৈন্যদের সাহায্য করার জন্যে বিমান-শক্তির যথোপযোগী ব্যবস্থা রেখেছে।" ১১ই আগস্ট তারিখে ম্যাক্স ওয়ার্নার 'নিউ রিপাব্‌লিক' পত্রে লিখেছিলেন, "এ বাহিনী হচ্ছে গঠনে আধুনিক, রণকৌশলের দিক থেকে দক্ষ, রণনীতির দিক থেকে বাস্তবপন্থী।"

সামরিক বিশেষজ্ঞরা বিশেষভাবে বিস্মিত হয়েছিল, লাল ফৌজের অতি আধুনিক সমরসজ্জা দেখে। বড় বড় ট্যাঙ্ক-যুদ্ধের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল। দেখা গেল যে, রুশদের খুব শক্ত-শক্ত ট্যাঙ্ক আছে;—সেগুলো অনেক সময় ঢুঁ মেরে জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলোকে ভেঙে বা উল্‌টিয়ে দিচ্ছিল। নিউ ইয়র্কের একজন সংবাদপত্র সম্পাদক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "যে রুশ চাষীদের ট্র্যাক্টর দিলে চালাতে পারত না, মাঠে ফেলে মর্‌চে ধরিয়ে দিত, তারাই, দেখা যাচ্ছে, এখন হাজার হাজার ট্যাঙ্ক খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। এটা কি করে সম্ভব হল!" আমি বললাম, "এ হল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফল।" কিন্তু ন' সপ্তাহ যুদ্ধের পর মস্কো যখন তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করল, জানাল যে, তাদের ৭,৫০০ কামান, ৪,৫০০ বিমান আর ৫,০০০ ট্যাঙ্ক খোয়া গিয়েছে, তখন পৃথিবীর লোক চমকে উঠল। এত ক্ষতির পরও যে বাহিনী লড়ে যেতে পারে, তার নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বা ঠিক তার পরবর্তী বৃহত্তম সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

লড়াই কিছু কাল চলার পর সামরিক পর্যবেক্ষকরা ঘোষণা করলেন যে, রুশরা হিটলার যে যুদ্ধ কৌশলের উপর নির্ভর করতেন, সেই 'ঝটিকা-আক্রমণে'র সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। জার্মানদের কৌশল ছিল ট্যাঙ্ক আর বিমানের প্রচণ্ড আঘাতে শত্রু-

পক্ষের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া, পিছু পিছু রণাঙ্গনের অসামরিক 'নরম' পশ্চাৎ ভাগে সাঁজোয়া সৈন্যদের অর্ধাবৃত্তাকারে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে রণাঙ্গনস্থিত শত্রুপক্ষ পশ্চাৎ ভূমি থেকে কোনো রকম সাহায্য না পায়। জার্মানরা যে দেশেই এ কায়দা অবলম্বন করেছিল, সে দেশই তারা অতি দ্রুত জিতে নিয়েছিল। বার্লিনে থাকতে একজন মার্কিন সংবাদ-দাতা আমাকে বলেছিলেন, "রক্তমাংসের মানুষ এ আক্রমণ সহ্য করতে পারে না।" রুশরা জার্মানদের এ কৌশল ব্যর্থ করে দিল দু'টি উপায়ে—এবং সে দু'টি উপায়েই সৈন্যদের দৃঢ় মনোবলের দরকার। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করামাত্র রুশরা আবার তাদের ব্যূহ এমন ভাবে ঠিক করে নিত, যার ফলে জার্মান ট্যাঙ্কচালকদের থেকে তাদের সাহায্যকারী পদাতিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ঘটত তার মধ্যে জার্মান ও রুশ—দু'পক্ষই সব দিকে লড়তে থাকত। রুশরা স্থানীয় লোকেদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারত। জার্মানরা রুশিয়ায় কোনো 'নরম বেসামরিক পশ্চাৎ ভাগ' পেল না। তারা পেল যৌথ খামারের চাষীদের, যারা গরিলা-সৈন্যদলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে, রুশ বাহিনীর সঙ্গে সুশৃঙ্খল সহযোগিতা করে যেত।

দ্রুত জয়লাভের জন্যে যে ঝটিকা-আক্রমণের উপর হিটলার ভরসা রাখতেন, সেটা রুশদের পঙ্গু করতে পারল না। হিটলারকে দীর্ঘকাল-স্থায়ী যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হতে হল। জার্মানদের অর্থনীতির পক্ষে তার ভার সওয়া সহজ হল না। নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হল: "এই প্রথমবার হিটলার একটা নতুন পরিসরের মধ্যে লড়ছেন।" লেখক অবশ্য ভূগোলের কথা বলেছিলেন, কিন্তু ঐ 'নতুন পরিসর' শুধু ভূগোলের ব্যাপার ছিল না। হিটলারকে এই প্রথম সামগ্রিক প্রতিরক্ষার জন্যে সংগঠিত একটা সমগ্র জাতির সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছিল। সোবিয়েৎ রণ-কৌশলে, সৈন্যবাহিনীর কাজের সঙ্গে জনসাধারণের কাজও সুসমঞ্জস ভাবে গ্রথিত ছিল। সোবিয়েতের রণধ্বনি ছিল: "যেখানে কামান গর্জাচ্ছে সেখানেই শুধু আমাদের

রণাঙ্গন নয়; আমাদের রণাঙ্গন হচ্ছে প্রত্যেকটি কারখানা, প্রত্যেকটি খামার।"

রুশিয়ার প্রচণ্ড জনবলের কথা সকলেই স্বীকার করত। কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানত, এই জনবলের গুণ কতখানি বদলে ছিল। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা, জন্মসময়ে শিশু ও মায়ের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকার ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছিল। সৈন্য বিভাগীয় হিসেবে দেখা গিয়েছিল যে, সৈন্যদের দেহের উচ্চতা ও ওজন, তাদের বুকের বহর ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। রংরুটদের শিক্ষা আর সামরিক জ্ঞান প্রতি বছর বাড়ছিল। লক্ষ লক্ষ কাজ-জানা মেয়ে দেশের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল; সৈন্য বাহিনীর চিকিৎসা বিভাগ তো মেয়েতেই ভর্তি ছিল; যানবাহন, সরবরাহ আর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও মেয়েরাই কাজ করত। অসামরিক লোকেরা সৈন্যদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে শরীরের দিক থেকেও তৈরী হয়ে উঠেছিল। যাট লক্ষ লোক 'জি. টি. ও.' শক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, অর্থাৎ, 'প্রতিরক্ষা ও শ্রমের জন্য প্রস্তুত' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল; এ পরীক্ষার জন্যে হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতরানো, লাফানো, নৌকা চালানো, বরফের উপর দিয়ে বরফ জুতো পায়ে হড়্‌কে চলা—এই সমস্ত ব্যাপারে পাকা হতে হত। অনেকেই প্যারাস্যুটের সাহায্যে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়া ও গ্লাইডার চালানোর পাঠ নিয়েছিল; বিনা বেতনে এ পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের 'কৃষ্টি ও বিশ্রাম'-বাগিচায় গিয়ে প্যারাস্যুট-গম্বুজ থেকে লাফাতে ভালবাসত।

প্রতিরক্ষার জন্যে যেমনটি প্রয়োজন যৌথ খামারগুলোর গড়নটিও ছিল তেমনি। প্রত্যেক খামারে কয়েকটা করে কর্মীদল থাকত, প্রত্যেক দলের একজন করে নেতা ছিল। এরা সৈন্য বাহিনীর অঙ্গীভূত শ্রমিক-দল হিসেবে কাজ করতে পারত, সে সময় এমনকি তাদের নিজেদের রাঁধুনি, এবং রান্নার সাজসরঞ্জামও নিয়ে আসত।

প্রত্যেক খামারের নিজস্ব গ্রীষ্মকালীন শিশুমহল ছিল, বেশী বয়সী মা-রা শিক্ষিতা ধাত্রীদের সাহায্যে এগুলো চালাতেন ; যুদ্ধের সময় এই সংস্থাটা শিশুদের ভার নিয়ে রণক্ষেত্র থেকে দূরে নিরাপদ জায়গায় তাদের পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারত, পাঠানোর ব্যবস্থা হত সেই গাড়িগুলোয় করে যেসব গাড়িতে করে সৈন্যদের নিয়ে আসা হত। প্রত্যেক খামারের একটা করে বেসামরিক প্রতিরক্ষী দল ছিল ; তারা ভালো ভা েই গুলি চালাতে শিখত ; তাদের নিজেদের অস্ত্রও ছিল ; চোরাগুপ্তি লড়ুয়ে গরিলাযোদ্ধার দল এইভাবে আগে থেকে গঠিত হয়েই ছিল।

জার্মানরা উক্রাইনে প্রবেশ করার পর, শস্য কেটে নেওয়ার তাড়া লাগল। চাষীদের প্রথম কাজ হল শস্য বাঁচানো। শিক্ষক, ছাত্র, অফিসের কেরানী, সকলেই দৌড়ল চাষীদের সাহায্য করতে ; এমন কি সৈন্যরা পর্যন্ত লড়াই একটু ঝিমিয়ে পড়লে ফসল কাটতে লাগত। ১০ই সেপ্টেম্বর নাগাদ, জার্মানরা যখন উক্রাইনের মাঝখানে এসে পড়ল, ফসলের শতকরা ষাট ভাগ তখন পূর্বদিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঐ সময় লক্ষ লক্ষ চাষীও নিজেদের খামারের মোটর ট্রাক ও ট্র্যাক্টরগুলো চালিয়ে সেগুলোকে নিয়ে পূর্বদিকে সরে যায় ; অনেকে সৈন্যবাহী ফিরতি গাড়িতে করেও চলে যায়। ইউরোপের আশ্রয়প্রার্থীদের মত তাদের বেকার থাকতে হয়নি। তারা নিজেদের হাতিয়ার সঙ্গে করে আর কোথাও গিয়ে খাদ্য জন্মাতে কাজে লেগে যায়। বহু চাষী, মন করেই হোক বা বাধ্য হয়েই হোক, জার্মান অধিকৃত এলাকায় থেকে যায় ; অনিয়মিত সৈন্য হয়ে যায় তারা ; পিছন থেকে জার্মানদের উপর আঘাত হানতে থাকে।

রুশরা নীপার বাঁধ উড়িয়ে দিলে দুনিয়ার লোক চমকে উঠল, বুঝল, অন্য সব জাতির মত যুদ্ধ করার ব্যাপারে ওদের কোনো ফাঁকি নেই। এ ঘটনা এবং এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা রুশদের রণনীতি অনুসারেই ঘটেছিল। পশ্চিমের সংবাদপত্রগুলো এ নীতির নাম দিয়ে ছিল 'পোড়ামাটির নীতি', রুশরা কিন্তু ভাগ্যবাদীদের ঐ কথাগুলো

ব্যবহার করেনি। কোনো কিছু পুড়িয়ে দিয়ে যাওয়ার আগ্রহ তাদের ছিল না, বরং তারা চাচ্ছিল সব কিছু নিজেদের জন্যে বাঁচাতে, শত্রুর নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে। শত্রুরা এসে পড়েছে বুঝলে, প্রত্যেকটি শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি খুলে ফেলত, তারপর যন্ত্রাংশগুলোকে গ্রীজ্ মাখিয়ে, প্যাক্ করে পূর্বদিকে চালান দিত; নিজেরা পূর্বমুখী হত। শ্রমিকরা নিজেদের যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে পূর্বদিকে, সাইবেরিয়া বা উরল অঞ্চলে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আবার কারখানা খাড়া করত।

জার্মানরা যখন খারকভ শহর অধিকার করে ফেলেছে, 'খারকভ ট্র্যাক্টর কারখানা' তখনো একদিনের জন্যেও কাজ বন্ধ না রেখে হিটলারের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক তৈরি করে গিয়েছে—সে কারখানার শ্রমিকরা এ নিয়ে গর্ববোধ করে। কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই যন্ত্রপাতি নিয়ে পূর্বদিকে চলে যায়; কিন্তু পর্যাপ্ত শ্রমিক থেকে যায় আগেকার তৈরী যন্ত্রাংশগুলো সমাবেশ করে শেষ ট্যাঙ্কগুলো শত্রুর বিরুদ্ধে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। খারকভে তাদের উৎপাদন এই ভাবে শেষ হওয়ার আগেই পূর্বদিকে তাদের নতুন তৈরী প্রধান কারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

সোবিয়েতের এ রণকৌশলের ফলে জার্মানরা কি রকম রিক্ত হয়ে পড়ে, সে কথা হাওয়ার্ড কে. স্মিথের 'বার্লিন থেকে শেষ ট্রেন' বইয়ে বলা হয়েছে। জার্মানির সমরযন্ত্র তথা জার্মান জাতি ইউরোপের লুটের মালে ফেঁপে উঠেছিল; হিটলার রুশিয়ায় প্রবেশ করলে তাদের অনাহার শুরু হল। তাদের সৈন্যরা নীপার নদীর ধারে এসে, বিধ্বস্ত বাঁধের ওপারে বৃহৎ নীপার শিল্প-কারখানাগুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দালান দেখে আনন্দে নেচে উঠল। স্মিথ বলেছেন, সোবিয়েৎ ইউনিয়নে পা দেওয়ার পর থেকে তারা আর কোনো কারখানা বাড়িকে গোটা অবস্থায় পায়নি। ঐ দালানগুলোয় ঢোকার পর তারা আবিষ্কার করল, মায় নাট বল্টু পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি পূর্বদিকে চলে গিয়েছে। স্মিথ মন্তব্য করেছেন; "এই হল সত্যিকারের প্রতিরক্ষা।"

বন্দী হওয়ার পর, একজন জার্মান বিমানচালক মস্কোতে বলেছিল, "ঐ লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের আকাশ থেকে দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।" এতকাল সে পলায়মান জনতার মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতেই অভ্যস্ত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ আত্মবিশ্বাসী শ্রমিককে তাদের সৈন্য বাহিনীর চারপাশে সংগঠিত অবস্থায় দেখে, স্বদেশের জন্যে রক্ষাব্যবস্থা খুঁড়তে দেখে তার নিজেরই ভয় ধরে গেল।

অনেক বছর আগে, বৃটিশ আর ফরাসী সামরিক বিশেষজ্ঞরা যখন ১৯১৮-১৯ সালের পরিখা-যুদ্ধের ভিত্তিতে যুদ্ধের কথা চিন্তা করত, লাল ফৌজের পত্রিকায় তখন তড়িৎ-আক্রমণ ধরনের যুদ্ধের কথা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল; বলা হয়েছিল, সে ধরনের যুদ্ধে শত্রু দুর্বল হলে সে পরাভূত হবে অতি দ্রুত, আর বিজেতার ক্ষতি হবে অতি সামান্য। যুদ্ধরত দু'পক্ষই যদি সমান বলশালী হয়, আর ঝটিকা-আক্রমণ যদি তখনি তখনি সফল না হয়, তা হলে যুদ্ধ চলবে অনেক কাল আর তার ফলাফল নির্ণীত হবে আপেক্ষিক আর্থিক সম্বল, মজুত সমর উপকরণ, আর জাতির মনোবলের দ্বারা। রুশ আর জার্মানদের এখন সেই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হল।

১৯৪১ সালের নভেম্বর নাগাদ, জার্মানরা উর্বর উক্রাইন প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল, কিয়েভ লুট করেছিল; তারা উত্তরের দুর্গ লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করেছিল; তারা তিনদিক থেকে মস্কো শহরকে ঘিরে ফেলেছিল,—মস্কোর সুউচ্চ গম্বুজগুলো দেখতে পাচ্ছিল তারা। বড় বড় শহর দখলের জন্যে যুদ্ধ শুরু হল।

কোনো আধুনিক শহর নিজেকে রক্ষা করবে, এটা কেউ আশা করে না। অধিকাংশ দেশেই বেসামরিক লোকে যুদ্ধ করার কথা চিন্তাই করে না। জার্মানরা যখন ফরাসী সৈন্য বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে এল, প্যারি নিজেকে 'উন্মুক্ত নগরী' বলে ঘোষণা করল—জার্মানরা বিনা বাধায় প্যারিতে ঢুকে পড়ল। পোল্ সরকার ও সেনাপতিরা পালিয়ে যাওয়ার পরও ওয়ারশর বীর মেয়র যখন যুদ্ধ করলেন, দুনিয়ার লোক অবাক হয়ে গেল। মধ্যযুগের শহরগুলো প্রতিরক্ষার ব্যাপারে

কত শক্তিমান, সে কথা আমরা ভুলে গিয়েছিলাম। স্তালিন কিন্তু ভোলেননি। তিনি লেনিনগ্রাদকে প্রতিরক্ষা-ক্ষম দুর্গ করে তোলার জন্যে ফিন্‌দের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মস্কোতে বাড়িঘর ওঠানোর সময় তিনি কোনোরকম হৈচৈ না করেই পৃথিবীর মধ্যে সুদৃঢ়তম দুর্গনগরী গড়ে তুলেছিলেন।

মধ্যযুগে মস্কো একটা সুরক্ষিত দুর্গনগরীই ছিল। প্রাচীর ঘেরা ক্রেমলিন ছিল এর কেন্দ্র ; এর এক মাইল দূরে ছিল বৃত্তাকারে একটা পাথরের প্রাচীর আর দু' মাইল দূরে ছিল বৃত্তাকার মাটির বাঁধ। অনেক বছর আগে ঐ প্রাচীর আর বাঁধকে দু' পাশে গাছ দেওয়া বেড়াবার প্রশস্ত পথে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চাকার পাখির মত দশটা বড় রাস্তা মস্কো থেকে বেরিয়ে ঐ বেড়াবার বৃত্তাকার পথের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। মস্কো থেকে এগারোটা রেললাইনও বেরিয়েছে, এই লাইনগুলোও মস্কোকে বেষ্টনকারী একটা রেললাইনের দ্বারা যুক্ত। পঞ্চবার্ষিক প[illegible]িকল্পনাগুলোর সময় এই স[illegible] বড় রাস্তা ও বেড়ানোর রাস্তার দু' পাশে চারতলা কংক্রীটের বাড়ি তৈরি করা হয়—সে সব বাড়ির দেওয়াল, রুশিয়ার শীত প্রতিরোধ করার জন্যে খুব পুরু করে তোলা হয়েছিল। বৃত্তাকার বেড়ানোর রাস্তার দু'ধারেব গাছগুলোকে বাড়ির পিছনে বা পার্কে সরিয়ে নিয়ে রাস্তাগুলোকে [illegible]রো প্রশস্ত করা হয়েছিল। তাতে সৌন্দর্যপ্রেমীরা অবশ্য হতাশ হয়েছিল। কিন্তু লড়াই বাধলে দেখা গেল যে, মস্কো শহরের মধ্যে যে কোনো রাস্তায় ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত সৈন্যরা পাশাপাশি ছয়টি সারিতে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে কুচকাওয়াজ করতে পারে, যে কোনো দিকে বিদ্যুৎবেগে বে[illegible]িয়ে পড়তে পারে,—তার জন্যে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় না ; আবার রাস্তার দু' পাশের ঘনসন্নিবদ্ধ কংক্রীটের চারতলা বাড়ির সারি দুর্গপ্রাচীরের মত তাদের রক্ষা করে। এ যুগের দুর্গ শুধু দেওয়াল খাড়া করেই গড়া যায় না ; ফ্রান্সের ম্যাজিনো আর ফিনল্যাণ্ডের ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণীর পতন থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক দুর্গে রক্ষা-ব্যবস্থার আওতায় একটা বৃহৎ সৈন্য-

দলের সচ্ছন্দ গতিবিধির ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। মস্কোতে তা ছিল। লড়াইএর সমস্ত উপকরণ শহরের মধ্যেই তৈরী হত, বিদ্যুৎ-উৎপাদনের কারখানাটা চলত শহরের পিছনে যে অপক্ক কয়লার খনি ছিল তার দ্বারাই। শহররক্ষার বিমানগুলোর জায়গা ছিল শহরের ভিতরেই এবং পূর্বদিকে।

সোবিয়েৎ সরকার বৈদেশিক দূতাবাসগুলোকে নিয়ে, রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে ভল্‌গা নদীর তীরবর্তী কুইবিশেভ শহরে সরে যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে উরল অঞ্চলের মত দূর জায়গায় চলে যায়, সেখানেই তারা দু'বছর থাকে। যেসব অসামরিক লোকের যুদ্ধের কাজে মস্কোয় থাকা কোনো দরকার নেই, তাদেরও পূর্বদিকে পাঠানো হয়। মস্কো রণাঙ্গন হয়ে গেল ; মস্কোর লোকের জন্য ১৬০০ ক্যালরি খাদ্যের ব্যবস্থা থাকল। বসত বাড়ি বা বিদ্যালয়ের জন্য কয়লা পাওয়া যেত না ; শুধু সমর-শিল্পের জন্যে কয়লার ব্যবহার হত। শীতকালে বিকাল ৪টায় রাত্রি লাগত, শীতের সেই দীর্ঘ রাত্রে কোনো বাড়িতে বিজলী বাতি জ্বলত না ; বিদ্যুৎশক্তি ছিল শুধু সামরিক ভাণ্ডারের জন্য। বারো ঘণ্টা কাজের পর লোকে অন্ধকারের মধ্যেই বিছানায় ঢলে পড়ত, পরা জামাকাপড়ের ওপরই লেপ টেনে দিত। সব চেয়ে বিপদের সপ্তাহগুলোয় আমার এক মহিলা বন্ধু—মস্কো রেডিওতে তিনি কাজ করতেন—তাঁর বিছানাপত্র নিয়ে তাঁর অফিসে গিয়ে ওঠেন ; তাঁর দু'জন সহকর্মী শহরের বাইরে পরিখা কাটতে যাওয়ায় তাঁকে তাদের স্থান পূরণ করার জন্যে ২৪ ঘণ্টাই কাজ করতে হত।

স্তালিন মস্কোতে থেকে যান। ১৯৪১ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে, জার্মানদের কামানগুলো যখন মস্কোর উপকণ্ঠে বজ্রনাদ করছিল, হিটলার যখন মস্কো অধিকৃত হয়েছে বলে বড়াই করছিলেন, স্তালিন তখন মস্কোর রেড স্কোয়ারে সৈন্য পরিদর্শন করছিলেন। সেদিন, মস্কোর লোকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হল ; তারা বুঝল, তাদের প্রধান সেনাপতিসহ তারাই সমস্ত জাতির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে।

সেবার শীতকালে মস্কোর লোকেরা জার্মানদের ৬০ মাইল দূরে হটিয়ে দিল, আর তাদের ফিরে এগোতে দিল না।

এই যুদ্ধে লেনিনগ্রাদকে আরো বেশী কষ্ট পেতে হয়েছিল, আড়াই বছর ধরে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় কামানের জ্বলন্ত গোলার মুখে থাকতে হয়েছিল। তার মধ্যে কিছু দিন সেখানকার লোক দৈনিক পাঁচ ফালি রুটি আর দু' গেলাস গরম জল খেয়ে কাটিয়েছে। তাই খেয়েই তারা যুদ্ধোপকরণ তৈরি করত, জার্মানদের সঙ্গে লড়াইও করত। জার্মানদের কামানের গোলায় যত লোক মরল, তার চেয়ে বেশী মরল খাদ্যাভাবে। প্রোটিনের অভাবে তাদের মৃত্যু হল; মধ্যযুগের অবরুদ্ধ শহরে মহামারীরূপে যে 'স্কার্ভি' রোগ দেখা যেত, সে রোগে নয়। সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীরা লোককে শিখিয়ে দিয়েছিল, তারা শহরের পার্কের পাইন গাছগুলোর কাঁটা থেকে 'খাদ্যপ্রাণ গ' সংগ্রহ করেতে পারে। সশ্তাকোভিচ্ বলে একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধে সান্ত্রীর কাজ করতেন। জার্মানরা আগুনে বোমা ফেললে সেগুলো বাড়ির ছাদ থেকে সরিয়ে ফেলতেন। করতেন। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'সপ্তম সিম্ফনি' রচনা করেন—সে সঙ্গীতটার বিষয়বস্তু ছিল যুদ্ধ ও জয়। এই অবরোধের পরও যারা বেঁচে ছিল তাদের সকলকে একটা করে পদক দেওয়া হয়েছিল—সেগুলোর উপর খোদাই করা ছিল 'লেলিনগ্রাদ-প্রতিরক্ষা'।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে জার্মানরা সব চেয়ে বেশীদূর এগিয়ে ছিল। তাদের গতিরোধ হয়েছিল: উত্তরে, লেলিনগ্রাদে; মধ্যে, মস্কোতে; কিন্তু দক্ষিণে তারা শুষ্ক, অবাধ সমতলের উপর দিয়ে উত্তর ককেশাসের শস্যভূমি ও স্তালিনগ্রাদ শহর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। শহরটা সমতল-ভূমিতে, কোনো স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ছিল না তার। ভল্‌গা নদীর ধারে ত্রিশ মাইল ব্যেপে কারখানার পর কারখানা—এই ছিল শহর। স্তালিনগ্রাদ হয়েছিল সোবিয়েৎ-প্রতিরক্ষার দক্ষিণের নোঙর, লেনিদগ্রাদ যেমন ছিল উত্তরের।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার হুকুম পাঠালেন, "যত ক্ষয়-ক্ষতি হোক, স্তালিনগ্রাদ দখল করো।" স্তালিনগ্রাদের পতন হলে, দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোকে ঘিরে ফেলার রাস্তা পাওয়া যাবে, বাকুর তৈলখনিতে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে, ইরান ও ভারতে পৌঁছবার পথ খুলে যাবে, চীনা-তুর্কীস্থানে জাপানীদের সঙ্গে যোগস্থাপন করার পথ খুলে যাবে। এই একটা শহরের উপর দিনের পর দিন জার্মানদের হাজারটা বিমান আর হাজারটা ট্যাঙ্ক আঘাত হানতে লাগল। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দু' হাজার ট্যাঙ্ক আর দু' হাজার বিমান লাগানো হল। জার্মানরা স্তালিনগ্রাদকে দু' ভাগে ভাগ করল, খণ্ড খণ্ড করে ফেলল। একাধিকবার হিটলার ঘোষণা করলেন. স্তালিনগ্রাদ তিনি দখল করে ফেলেছেন। সত্যিই তিনি স্তালিনগ্রাদের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছিলেন—শুধু সেখানকার লোকগুলোকে জয় করতে পারেননি।

* * *

'ভল্‌গার ওপারে আর দেশ নেই'—স্তালিনগ্রাদে এই কথাটা চালু হয়ে গেল। স্তালিনগ্রাদের লোকে রাস্তার পর রাস্তায়, বাড়ির পর বাড়িতে, ঘরের পরে ঘরে লড়াই করে চলল। রাইফেল, হাত বোমা থেকে ছুরি, রান্না ঘরের চেয়ার বা গরম জলটা পর্যন্ত হল তাদের অস্ত্র। ট্যাঙ্ক কারখানায় ট্যাঙ্ক তৈরী হয়ে কারখানা প্রাঙ্গণ থেকে সোজা জার্মানদের ঘাড়ে গিয়ে পড়তে লাগল। জার্মানদের সংবাদে দেখা গেল, "একটা বাড়িও গোটা নেই।" তারপরেও স্তালিনগ্রাদবাসীরা মাটির নীচের কুঠরি থেকে, গুহা থেকে লড়ে চলল। লোকে বলতে লাগল, "সাহস থাকলে যে কোনো ইটের ঢিপিকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।" স্তালিন তার করে তাদের জানালেন, "একটা ছোট পাহাড় পুনর্দখল করতে পারলেও কিছু সময় পাওয়া যায়।" স্তালিনগ্রাদের লোকেরা এইভাবে ১৮২ দিন যুদ্ধ করল। তারপর ; সাইবেরিয়ার সুদূর প্রান্তে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত নতুন 'মজুত' সৈন্যদল সমতলভূমির উপর দিয়ে এসে স্তালিনগ্রাদকে সাঁড়াশির মত আঁকড়ে ধরল। ৩ লক্ষের

উপর জার্মান এই ফাঁদে ধরা পড়ল। ১৯৪৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে জার্মানরা আত্মসমর্পণ করল।

এখান থেকে যুদ্ধের দীর্ঘ রণাঙ্গনে স্রোত ফিরে গেল। ভল্‌গার তীরবর্তী একটিমাত্র শহরের বীর নরনারীর প্রত্যাঘাতে জার্মানদের বিশ্বজয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

এর পরেও যুদ্ধের বিভীষিকাময় আরও দু'টো বছর কেটে গেল। কিন্তু স্তালিনগ্রাদ থেকে জার্মানদের ক্রমেই পিছু হটিয়ে দেওয়া হল। ১৯৪৩ সালে তাদের উক্রাইন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল, ১৯৪৪ সালের গ্রীষ্মকালের প্রথম দিকে তাদের তাড়িয়ে সোবিয়েৎ সীমান্তের বাইরে নিয়ে ফেলা হল। ঐ বছর, জুলাই মাসের শেষদিকে, সোবিয়েৎ বাহিনী তাদের ওয়ারশ থেকে দূর করে দিল। ১৯৪৫ সালের এপ্রিলে সোবিয়েৎ বাহিনী বার্লিন শহরে গিয়ে পৌঁছল। জুন মাসে, আমেরিকার সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ছক স্থির করার জন্যে 'ইউ. এন. ও.-র'—সম্মিলিত জাতি সংস্থার প্রতিষ্ঠা হল।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নে লোকে নিজের নিজের জায়গায় ফিরতে লাগল। জার্মানরা সব ধ্বংস করে দিয়েছিল। চেঙ্গিজ খাঁর পর এমন সামগ্রিক ধ্বংস কেউ দেখেনি। রুশরা তাদের বিশ্বজয়ের পথ বন্ধ করে দেওয়ায় জার্মানরা রুশিয়ায় অসামরিক লোকদেরও ঢালাও হত্যা করে। লক্ষ লক্ষ লোককে তারা তীব্র যন্ত্রণা দিয়ে মারে, ঘরে ভরে গ্যাস্ দিয়ে মারে, রুশরা যেসব খনিতে জল ঢুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল সে সব খনির জলে ডুবিয়ে মারে, দালানে আগুন জ্বালিয়ে মারে। ঘোড়া, আর ভেড়া—সব রকম পালিত পশু হয় নিজেরা নিয়ে যায়, নয়তো হত্যা করে। ত্রিশ লক্ষ লোককে গোলাম বানিয়ে নিয়ে যায়। দক্ষিণ রুশিয়া ও উক্রাইনের মাঠে দু' কোটি পঞ্চাশ লক্ষ লোককে গৃহহীন অবস্থায় ফেলে রেখে যায়।

ঐ সময়কার একটা ঘটনা লক্ষণীয়,—এ ঘটনার কোনো পুরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। যুদ্ধের সময়, সাতটা ছোট উপজাতিকে সমগ্র ভাবে পূর্ব দিকে চালান দেওয়া হয়েছিল। এ সংবাদ সাধারণের মধ্যে

প্রচার করা হয়নি। আমরা, মস্কোস্থ সংবাদ-দাতারা, একটা গুজব শুনেছিলাম ; খোঁজ নিতে গেলে আমাদের বলা হয়েছিল যে, জার্মানি আর তুরস্কের দালালরা ভল্‌গা তীরের জার্মানদের আর ক্রিমিয়া ও ককেশাসের মুস্‌লিম উপজাতিদের মন বিষিয়ে দিচ্ছিল ; এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ হচ্ছে সামরিক গোপন তথ্য। ১৯৫৬ সালে খ্রুশ্চেভের স্তালিনকে আক্রমণ কালে পৃথিবীর লোক প্রথম সরকারী ভাবে জানতে পারল, ১৯৪৩ সালে কাল্‌মাইক আর কারাচাইদের, ১৯৪৪ সালে প্রথম ভাগে চেচেন, ইংগাশ্‌ আর বাল্‌কারদের পূর্ব দিকে সরানো হয়েছিল। ১৯৪২ সালে যে ভল্‌গা তীরের জার্মানদের আর ক্রিমিয়ার তাতারদের সরানো হয়েছিল, সে কথার উল্লেখ খ্রুশ্চেভ করেননি। এ সব অপসারণের কোনো ব্যাখ্যা খ্রুশ্চেভ দেননি। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়ে, ১৯৪৪ সালের প্রথম ভাগে, স্তালিন সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ষোলটি অঙ্গরাজ্যকে নিজের নিজের সৈন্য বাহিনী ও বৈদেশিক দপ্তর রাখতে দেওয়া হবে ; তারা মিলেমিশে ভালো ভাবে যুদ্ধ করে জাতিত্বের এই চরম সম্মান-চিহ্ন অর্জন করেছে। যুদ্ধ চলার মধ্যেই জাতীয় ভূগোলের কিছু হেরফের করা হচ্ছিল, এটা বোঝা যায়। এটা করা হয়েছিল শাস্তি হিসেবে, না আগে থেকে হুঁসিয়ার হওয়ার প্রয়োজনে, না দেশের লোককে যুদ্ধের অছিলায় যুক্তিযুক্তভাবে স্থাপিত করার জন্যে, সে কথা এপর্যন্ত প্রকাশ পায়নি।

* * *

আমি সোবিয়েৎ বাহিনীকে পোলাণ্ডের মধ্যে দিয়ে বার্লিনের দিকে ধাওয়া করতে দেখেছি, তার কথা না বলে আমি এ পরিচ্ছেদ শেষ করতে পারছি না। ওয়ারশ আর লোদ্‌জ রণক্ষেত্রের পশ্চাৎ ভাগের শহরগুলো থেকে আমি তাদের লক্ষ্য করেছি। ওরা ছিল পৃথিবীর মধ্যে সবলতম বাহিনী,—জার্মানদের ওরা হটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, যে জার্মানরা তিন বছর আগে ছিল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে সবল বাহিনী। তিনটি নিষ্করুণ বৎসর রুশদের পিটিয়ে গড়েছিল।

তার অনেক আগে থেকে, এই 'নতুন মানুষের' দল সমবেত শক্তির মধ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত একটা বিরাট ব্যক্তিগত কর্ম-প্রেরণা অর্জন করেছিল; জার্মানদের এ গুণ ছিল না। আমি যুদ্ধের পক্ষপাতী নই, তবু রুশ সৈন্যরা যে নিখুঁৎ ছন্দে চলছিল, তাকে আমি একটা মহান্ সিম্ফনের সঙ্গে তুলনা না করে পারছি না।

১৯৪৪ সালের হেমন্তকালের শেষ দিকে, রুশ সৈন্যরা ওয়ারশর দিকে মুখ করে ভিশ্চুলা নদীর ধারে এসে দাঁড়ায়। নদীর পশ্চিমে বিস্তৃত জলাভূমি—সেদিকে তখনো ট্যাঙ্ক চালানো যায় না। শীতে জল জমার অপেক্ষায় বড় আক্রমণ স্থগিত ছিল। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে আশ্রয়প্রার্থী পোল্‌দের নিয়ে গড়া 'প্রথম পোল্ সৈন্যদল' ঠিক মাঝখানে তাদের বিধ্বস্ত রাজধানীর দিকে মুখ করে তৈরী থাকল। জার্মানরা তখনও বোমা মেরে তাদের শহরের মহল্লার পর মহল্লা উড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছিল। একজন পোল্ অফিসার আমাকে বললেন যে, তাঁদের সঙ্গে প্রত্যেক সাতফুট অন্তর একটা করে বড় কামান রয়েছে আক্রমণের প্রস্তুতি হিসেবে জর্মান দুর্গগুলোকে ধ্বংস করার জন্যে।

১২ই জানুয়ারী, শুক্রবার, মার্শাল কোনেভের প্রথম উক্রাইনীয় বাহিনী দক্ষিণ পোলাণ্ড থেকে আক্রমণ শুরু করে নয় সারি দুর্গ চূর্ণ করে দু' দিনে ২৫ মাইল এগিয়ে গেল। রবিবারে, দু'টো নতুন বাহিনী পশ্চিম মুখে এগিয়ে আক্রমণে যোগ দিল। প্রথম পোল্ বাহিনী নিয়ে মার্শাল ঝুকভের প্রথম বাইলো-রুশ বাহিনী মধ্য ভাগে আক্রমণ করল; দু'দিনে ১২০০ জনপদ অধিকৃত হল। উত্তরে, নারু নদী যেখানে ভিশ্চুলায় এসে মিশেছে, সেখানকার জমে-যাওয়া জলাভূমির উপর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্শাল রকোস্‌সোভ্স্কির দ্বিতীয় বাইলো-রুশ বাহিনী। জার্মান ব্যূহ ভেদ করা হয়ে গেলে, অগ্রগামী সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। ঝুকভের ট্যাঙ্কগুলো একদিনে সত্তর মাইল এগিয়ে গেল—সে একটা দেখার মত জিনিস! সৈন্যদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়েকর্মীরা পূর্ব-পশ্চিম রেলওয়ে-

গুলোর 'গজ্' (রেলপথের দু'টো পাটির মধ্যেকার দূরত্ব) বদলাতে লাগল; ফলে যুদ্ধের যোগান আসতে লাগল সরাসরি উরল অঞ্চল থেকে, দু' হাজার মাইল দূর থেকে একেবারে রণাঙ্গনে। দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গেলেন, কামানের গোলা আর পেট্রলের এই অবিচ্ছিন্ন জোগান দেখে।

যে দিক থেকে জার্মানরা প্রত্যাশা করেনি ঠিক সে দিক থেকেই এগিয়ে, পরস্পরের কাছে ঠিক যতটুকু সাহায্যের দরকার সেটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে, ঐ বড় বড় বাহিনীগুলো কী ভাবে শহরের পর শহর ঘেরাও করল, একজন অসামরিক লোক হয়েও আমি মানচিত্রের সাহায্যে সেটা বুঝতে গিয়ে, তার অপূর্ব ছন্দ ধরতে পারলাম। ঝুকভ ওয়ারশ দখল করলেন উত্তর, দক্ষিণ আর পশ্চিম থেকে ত্রিমুখী আক্রমণ চালিয়ে, জার্মানরা যে দিক থেকে প্রত্যাশা করছিল শুধু সেই পূর্ব দিকটা বাদ দিয়ে; কোনেভের বাহিনী অবাধে দক্ষিণ পোলাণ্ড অতিক্রম করে গিয়ে জার্মান সীমান্তের একটা দুর্গনগরকে পাশে ফেলে বার্লিনের দিক থেকে পোলাণ্ডে প্রবেশ করল। সেখানে গিয়ে তারা দেখল, ইহুদী-অধ্যুষিত অঞ্চলের কারখানাগুলো তখনো চলছে। তারা এসে যাওয়ায় ৮ হাজার ইহুদীর প্রাণ রক্ষা হল; সারা পোলাণ্ডে একসঙ্গে এতোগুলো লোককে কোথাও বাঁচানো যায়নি; কারণ, জার্মানদের রীতি ছিল পালাবার আগে ইহুদী আর স্লাভ জাতির সমস্ত লোককে মেরে ফেলা। কোনেভের বাহিনীর একটা মুখ পিছনের দিকে ধাওয়া করে ক্রাকাউ শহরটাকে দখল করে নিল। রুশরা এ শহরটি এমন অতর্কিতে এবং এত অক্ষত অবস্থায় হস্তগত করল যে, মনে হচ্ছিল যেন, এ শহরটা কখনো যুদ্ধ দেখেনি। ঝুকভও অমনি একচোটে, অপ্রত্যাশিত দিক থেকে লোদ্জ্ শহরটাকে অক্ষত অবস্থাতে অধিকার করলেন। তার পরেই পোল্ সরকারের সঙ্গে আমি যখন লোদ্জ্ গেলাম, হোটেলের যে ঘরে আমি ছিলাম সে ঘরে একজন জার্মান অফিসারের কতকগুলো সুটকেস দেখলাম। বেচারা সেগুলো নিয়ে যাওয়ার সময়ও পায়নি।

রুশদের দ্রুত অগ্রগতির ফলে যেসব মার্কিন বন্দী মুক্তি পেয়ে পোলাণ্ড অতিক্রম করছিল, তারা আমাকে লোদ্জে বলল, রুশদের এ অভিযানের কোন্ কোন্ জিনিস বিশেষ করে তাদের মনে দাগ কেটেছে। তারা মুগ্ধ হয়েছিল রুশদের উপায়-উদ্ভাবন দেখে; রুশরা সাধারণ উপায় ছাড়া অন্য নানা উপায়ে কার্যসিদ্ধি করছিল; পেট্রল চালান দেওয়ার জন্যে তারা সাধারণ তৈলবাহী গাড়ি তো ব্যবহার করতই, উপরন্তু ধাতু নির্মিত আস্ত বড় বড় চৌবাচ্চাগুলোকে মাটি থেকে তুলে ফ্ল্যাট-কারে (অর্থাৎ আবরণহীন গাড়িতে) চড়িয়ে চালান দিত। সাঁজোয়া অগ্রগামী সৈন্যদের জন্যে রেলপথের প্রয়োজন হচ্ছিল বলে পদাতিক সৈন্যরা বহু ঘোড়া ব্যবহার করছিল। আমেরিকানরা দেখেছে রুশ পদাতিক সৈন্যরা চাষীদের ছোট ছোট গাড়িতে চেপে দল বেঁধে যাচ্ছে; দু'জন করে ঘুমোচ্ছিল, বাকি সকলে গাড়ি হাঁকাচ্ছিল, কাজেই চব্বিশ ঘণ্টাই তারা এগিয়ে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো শ্রান্ত হয়ে পড়লে কোনো চাষীর বাড়িতে সেগুলোকে জমা দিয়ে তারা নতুন ঘোড়া নিয়ে যাচ্ছিল। এর ফলে, পোলাণ্ডের পশ্চিম প্রদেশগুলোতে দেশ-শুদ্ধ ঘোড়া এসে জমেছিল; পোল্ সরকারের প্রথম কাজ হয়েছিল, মধ্য পোলাণ্ডে বসন্তকালীন বীজ বোনার কাজের জন্যে এই ঘোড়াগুলো ফেরৎ পাঠানো। আমেরিকানরা বলল, "যুদ্ধের সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু শিখল।"

প্রথম পোল্ বাহিনীকে যেসব কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল, তা থেকে সোবিয়েতের সামরিক কর্তাদের রাজনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ারশ দখলের সম্মান পেল পোল্রা। সে কাজ করার পক্ষে তাদের সংখ্যা অপ্রচুর হওয়ায়, শহরের বিশ মাইল বাইরে, ঝুকভের রুশবাহিনী শহরটাকে ঘিরে রাখল এবং জার্মান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, আর প্রথম পোল বাহিনী শহরটা আক্রমণ করল। যে বাহিনী পোমেরানিয়া প্রবেশ করল এবং কোলবার্গের নৌঘাঁটি দখল করল, তাদের অগ্রণী ছিল পোল্রা। পোল্রা ও রুশরা ডানজিগ দখল করল; পোল্রা শহরের কেন্দ্রস্থল দখল করল এবং পৌরসভার

বাড়ির উপর পোল্‌দের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিল। পোল্‌দের কাছে এই সব বিজয়ের একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল, কারণ হাজার বছর ধরে পোল্‌ আর জার্মানদের মধ্যে এই সমুদ্রতীর নিয়ে বিবাদ চলে আসছিল। ইতিমধ্যে, পোলাণ্ডের মুক্ত এলাকাগুলো থেকে লোক সংগ্রহ করে যে দ্বিতীয় পোল্‌ বাহিনী তৈরী হয়েছিল, তাদের শিক্ষা-শিবির থেকে সোজা পোলাণ্ডের সমস্ত বড় বড় শহরে ঘাঁটি আগলাতে পাঠানো হল ; —সে সব শহরই জার্মানদের কবল থেকে মুক্ত করে পোল্‌দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দু'মাস পরে, এই দ্বিতীয় পোল্‌ বাহিনী নীস্‌ দখলের সময় সাহায্য করে ; বার্লিন দখলের সময় ঝুকভের বাহিনীর প্রথম দলের মধ্যে ছিল এরা। অধিকারও ছিল তাদের থাকবার ; কারণ, হিটলার তাদের দেশ আক্রমণ করার ফলেই এই মহাযুদ্ধটা বেধেছিল।

এই মহা আক্রমণ এত দ্রুতভাবে এবং এমন রীতিতে পশ্চিম পোলাণ্ডকে মুক্ত করল যে, জার্মানরা বিশেষ কিছু ধ্বংস করার সময় পায়নি। ওয়ারশর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র ; সেখানে, আগের বছর গ্রীষ্মকালে, রুশদের অগ্রগতির সঙ্গে কোনো যোগ স্থাপন না করেই জেনারেল বোর অকালে বিদ্রোহ করায় আমরা যে রুশ-অগ্রগতির কথা বলছি, তার আগেই পোলাণ্ডের এই রাজধানীর সম্পূর্ণ ধ্বংস ডেকে আনা হয়েছিল। ওয়ারশ মুক্ত হলে, চারদিক থেকে লোকে সেখানে ফিরে আসতে লাগল। তারা এসে দেখল, শহরটা ইট-পাথরের একটা স্তূপ ; বাড়িঘর পড়ে সব রাস্তাগুলো বন্ধ হয়ে আছে ; তাদের পৌরসভার বাড়ি, অপেরা-বাড়ির ভাঙা-চোরা দেওয়াল মাত্র খাড়া আছে ; তাদের সুন্দর সুন্দর গির্জা, প্রাসাদ, চোপিন্‌ ও কোপার্নিকাসের স্মৃতিস্তম্ভের দু'চার টুক্‌রো, আর স্মৃতিটা মাত্র বাকি রয়েছে। জল নেই, বিদ্যুৎ-শক্তি নেই, গ্যাস্‌ নেই ; মাটির নীচের ঘরগুলো, নর্দামাগুলো মৃতদেহে একেবারে গাদা হয়ে আছে। ওয়ারশর মুক্তির দু'দিন বাদে, ১৯শে জানুয়ারী তারিখে, রাষ্ট্রপতি বেইরুট্‌ এই ধ্বংসের মধ্যেই পোল্‌ বাহিনী পরিদর্শন করলেন ; তিনি

রাজধানীটিকে নতুন করে গড়ে তোলার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন এবং সে কাজে সমস্ত পোলাণ্ডবাসীদের সাহায্য চাইলেন। এর আগেই কয়েক হাজার লোক মাটির তলার ঘরগুলোতেই বাসা বেঁধেছিল; বক্তৃতা-মঞ্চের চারপাশে দাঁড়িয়ে তারা উল্লাস প্রকাশ করল। সেই বিধ্বস্ত শহরের মধ্যেই, সেই শীতকালে, কোথায় কতকগুলো ফুল ফুটেছিল; সেগুলো নিয়ে এসে একটি ছোট মেয়ে বেইরুটের হাতে দিল।

যে অভিযানের ফলে পোলাণ্ড মুক্ত হতে দেখেছিলাম, সে অভিযান ওডার নদীর ধারে এসে থামল। নদী-পার হওয়া সৈন্যদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করল, বার্লিন আক্রমণের জন্যে সবরকম সমরোপকরণ জোগাড় করে নিল। ১৮ই এপ্রিল তারিখে আক্রমণ শুরু হল।

সোবিয়েৎ ক্যামেরা-সাংবাদিক কারমেন 'ইজ্‌ভেস্তিয়া'য় লিখলেন, "যে সেটা দেখেছে, সে ওডারের তীরে সেদিনের ভোরবেলাটা কখনো ভুলবে না। হাজার হাজার কামান দাগতে দাগতে সারা সোবিয়েৎ-দেশটাই যেন বিশটার বেশী রাস্তা ধরে শত্রুপক্ষের রাজধানীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল"। অন্য সাংবাদিকরা লক্ষ্য করেছিলেন, রাস্তার দু' পাশে চেরীগাছে ফুল ফুটেছিল, বার্চগাছগুলো মাথা দোলাচ্ছিল, পোল্‌রা ওডার নদীর জল দিয়েই পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল। ছ'দিন পরে, লাল ফৌজের কামানশ্রেণী ফ্রিড্‌রিক্‌স্ট্রাস্‌ (অর্থাৎ ফ্রিড্‌[illegible]ক রাস্তা)-এর উপর গোলাবর্ষণ করল। কারমেন সময়টাও লক্ষ্য করেছিলেন: সকাল আটটা ত্রিশ মিনিট; ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৫ সাল।

জার্মান কারখানাগুলো থেকে যে সব রুশ, পোল্‌ আর যুগোস্লাভ গোলাম বেরিয়ে এসেছিল, সমস্ত সোবিয়েৎ লেখকই তাদেরই সংখ্যা উল্লেখ করেছেন। অনেক সময়, নিজেদের লোককে মেরে-ফেলার ভয়ে রুশদের অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে, কারখানা থেকে জার্মান-গুলোকে তাড়াতে হয়েছে। একটা [illegible]মুনা দেওয়া হল: প্যারাসুট-এর জন্যে রেশম তৈরীর একটা প্রকাণ্ড কারখানার ছাদ থেকে জার্মানরা গুলি চালাচ্ছিল। হঠাৎ এক দঙ্গল রুশ মেয়ে হুড়মুড় করে কারখানা থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের সৈন্যদের জড়িয়ে ধরল।

এক বুড়ি সকলকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "বাপধনরা, ওরেল যাওয়ায় রাস্তা কোনটা ?"

সৈন্যরা মুচকি হাসল, বলল, "ঠাক্‌মা, আমরা তোমাকে ঠিকই পাঠিয়ে দেব। তারা তাকে একটা ট্রাকে চড়িয়ে রণাঙ্গণের বাইরে পাঠিয়ে দিল।

দ্বিতীয়বারের পুনর্গঠন

এপ্রিলের সেই শেষ সপ্তাহে, মস্কোতে থাকতে কেবলই একটা জনপ্রিয় গানের কথা মনে পড়ে যেত,—"যখন সারা দুনিয়ায় আলো ফের জ্বলে ওঠে……"। গানটা আমার কাছে চিরকাল একটু বেশী-রকম আবেগভরা মনে হত। বাস্তব সত্য, গানকেও ছাড়িয়ে গেল। মে-দিবসের প্রস্তুতির জন্যে ৩০শে এপ্রিল তারিখে 'সাঁঝ-বাতি'র আইন তুলে নেওয়া হল। লোকে রাস্তায় বেরিয়ে, এক স্কোয়ার থেকে আর এক স্কোয়ারে গিয়ে চার বছর ধরে যে বড় বড় উজ্জ্বল বিজলী বাতির মুখ দেখেনি, সেদিকে চেয়ে মুগ্ধ হল। 'সাঁঝ-বাতি'র আইন যে আর নেই, এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই যেন লোকে সারা রাত রাস্তায় রাস্তায় টহল দিল। সকলেই বাড়িতে জানালার কাচ খুলে ফেলল, লোকে যে তাদের খাওয়া, পোশাক-পরা দেখতে পাবে, সেদিকে খেয়াল করল না।

মে-দিবসের শোভাযাত্রায় লোকের মুখে এক কথাই শোনা গেল—১৯৪১ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে রেড স্কোয়ারে শেষ কুচকাওয়াজের কথা : জার্মানদের কামান তখন মস্কোর উপকণ্ঠে গর্জন শুরু করেছে ; স্তালিন রেড স্কোয়ারে এসে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করলেন ; লোকের মনে ভরসা জাগালেন। আর, এদিন, লাল ফৌজ বার্লিনে গিয়ে যুদ্ধ করছিল আর মস্কো লড়াইএর সজ্জা ছেড়ে ধারণ করেছিল মে-দিবসের উৎসব সজ্জা !—লাল ঝাণ্ডা, বড় বড় লাল নিশান, আর নেতাদের ছবি !

ক্রেমলিনের মাথায় আবার প্রকাণ্ড লাল তারা জ্বল জ্বল করছিল; রাস্তার দু' পাশে, মস্কো নদীর সেতুগুলোর দু' পাশে আবার আলোর মালা দুলছিল।

২রা মে তারিখে বিকাল ৩টায়, বার্লিনে যুদ্ধক্ষান্তি হল; মস্কোতে তার সংবাদ এল সন্ধ্যের দিকে; দু'দিনের ছুটির উৎসব চরমে উঠল। নাৎসী ফাসিজিমের প্রধান ঘাঁটির পতন হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বাহিনীগুলো—রুশ, মার্কিন, বৃটিশ সৈন্যরা, জার্মানদের দেশটাকে ছেয়ে ফেলেছে। মস্কোর আকাশে রঙীন হাউই উড়ল; রাস্তায় রাস্তায় তুবড়ি বাজি পুড়ল। পরিশ্রান্ত হয়ে, আনন্দিত মনে সে রাত্রে লোকে ঘুমোতে গেল; তারা জানত, কাল হতে তাদের নতুন যুগের সমস্যা নিয়ে পড়তে হবে—যা বিধ্বস্ত হয়েছে তা আবার ফিরে গড়ার সমস্যা, শান্তির সমস্যা।

ধ্বংস হয়েছিল প্রচণ্ড। ২কোটি ৫০ লক্ষ লোকের ঘরবাড়ি ছিল না; ১৭শ'র উপর নগর আর ২৭ হাজার গ্রাম সম্পূর্ণভাবে বা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ৩৮ হাজার ৫শ' মাইল রেলপথ নষ্ট হয়েছিল—তা দিয়ে বিষুবরেখা বরাবর পৃথিবীটা বেষ্টন করেও অনেকখানি বাড়তি থাকত। ডনবাসে শতকরা নব্বইটা খনি বিধ্বস্ত হয়েছিল, জল দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছিল। নীপার-বাঁধ আর সেখানকার জলবিদ্যুৎ নিয়ে যেসব কারখানা চলত সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল; নদীটায় আবার খরস্রোত দেখা দিয়েছিল, নৌচালনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৭০ লক্ষ ঘোড়া, ১৭০ লক্ষ গরু বলদ প্রভৃতি, ২ কোটি শুয়োর জার্মানরা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, নয় মেরেছিল। ৩ হাজারের বেশী শিল্প-কারখানা আবার নতুন করে গড়ার দরকার হয়েছিল।

সব চেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছিল জনবলের। মৃতের সংখ্যা সম্বন্ধে নানা জনে নানা মত দিয়েছেন, কেউ বলেছেন ৭০ লক্ষ কেউ বা দু' কোটি। অসামরিক লোকদের নিয়ে মৃতের সংখ্যা ধরলে দু' কোটির বেশী হতে পারে। প্রত্যেক পরিবারে লোক মারা গিয়েছিল। আমার স্বামী আর তাঁর ভাইবোনদের পরিবারে আটজন পুরুষ মানুষ

ছিলেন। তাঁদের মধ্যে আমার স্বামীসহ তিনজন গত হয়েছিলেন। অসামরিক লোক বলে তাঁদের কাউকে যুদ্ধে নিহতদের মধ্যে ধরা হয়নি, কিন্তু তাদের তিনজনই যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলে মারা গিয়েছিলেন। একত্র মিলিয়ে অন্য মিত্রশক্তিগুলোর হতাহতের সংখ্যার তুলনায় সোবিয়েৎ ইউনিয়নের হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশী। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের তুলনায় সোবিয়েতের হতাহতের সংখ্যা একশ' গুণ বেশী হয়েছিল। দক্ষিণ-রুশিয়ায় অনেক গ্রাম ছিল, যেখানে যুবতীরা বিয়ে করবে—এমন পুরুষ ছিল না, যেখানে জার্মান অধিকারের সময় থেকেই অনেক পিতৃহীন ছেলে ছিল এবং পিতৃহীন ছেলেছোকরারা একেবারে জঙলী হয়ে পড়েছিল।

বিজয়ের আগে থেকেই পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়েছিল। আগের পরিচ্ছেদে আমরা দেখেছি জার্মানদের কামানের আওয়াজ দূরে সরার সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক্টরকেন্দ্রগুলো আবার ফিরে আসতে থাকে। স্তালিনগ্রাদের ট্র্যাক্টরকারখানা ভেঙেচুরে গিয়েছিল, কিন্তু স্তালিনগ্রাদ থেকে জার্মানদের তাড়িয়ে দেওয়ার তিন মাসের মধ্যে সেখানে ট্যাঙ্ক তৈরী হতে লাগে। ১৯৪৪ সালে নীপার-বাঁধ ও তার চারপাশের শিল্প-কারখানাগুলো নতুন করে তৈরি শুরু হয়; রুশ সীমান্তে তখনো সৈন্যেরা যুদ্ধ করছে।

জয়লাভের পর, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সুপরিকল্পিত অর্থনীতি শান্তিকালীন উৎপাদনে ফিরে এল অতি মোলায়েম ভাবে। নতুন একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা করা হল। স্থির হল, সেটা শত্রুমুক্ত এলাকাগুলোকে ১৯৪৯ সালের মধ্যে তাদের পূর্বাবস্থায় নিয়ে যাবে এবং ১৯৫০ সালের মধ্যে শিল্পোৎপাদন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি করবে যুদ্ধের আগেকার উৎপাদনের চেয়ে। এর অর্থ হল, বিপ্লবের পর যেমন তাদের করতে হয়েছিল তেমনি ভাবে অনেক জায়গাতেই সব কিছু আবার নতুন করে গড়া। তবে, ১৯২১ সালে তাদের গড়তে হয়েছিল একটা সামন্ততান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির ধ্বংসস্তূপের উপর, এবার তারা গড়বে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তির উপর—

যে অর্থনীতি ক্ষতবিক্ষত হলেও যুদ্ধটাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছে। এখন, উরলে এবং সাইবেরিয়ায় শিল্প ও কৃষির একটা বড় ভিত্তি রচিত হয়েছিল; তাদের অদ্ভুত যুদ্ধকালীন বিকাশের কথা আমরা এই নতুন পরিকল্পনার সময় প্রথম জানলাম। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে উরল অঞ্চলে বিদ্যুৎ-শক্তি বেড়েছিল দ্বিগুণ; লৌহ-উৎপাদন বেড়েছিল দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। তা ছাড়া, এই দ্বিতীয়বারের পুনর্গঠনের কাজে প্রথম থেকেই এমন কাজ-জানা লোকদের পাওয়া গেল, যাদের আগে থেকেই এ অর্থনীতির সঙ্গে পরিচয় আছে।

সোবিয়েৎ সরকার চট করে যুদ্ধোত্তর গঠনের কাজে লেগে গেল। উচ্চতম সোবিয়েতের বিজয়-অধিবেশনের প্রতিনিধিরা রাস্তায় বেরুলেন। নভেম্বর মাসের ছুটির দিনগুলো যাপন করা হল কে কত উৎপাদন করতে পারে, তার প্রতিযোগিতায়। স্তালিনগ্রাদ ট্র্যাক্টর কারখানাটা শান্তিকালীন উৎপাদনে ফিরে এসে, ছুটির দান হিসেবে ঘোষণা করল, ৩০০০ নং ট্র্যাক্টরের কথা। সেবাস্তপোল প্রায় মাটির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে ঘোষণা করা হল যে, সেখানকার বৈদ্যুতিক কারখানা আর বৃহত্তম জাহাজ তৈরির কারখানাটা আবার কাজ শুরু করেছে। লেলিনগ্রাদ তার জাহাজ তৈরির সব চেয়ে বড় বড় কারখানাগুলো চালু করে উৎসব করল। ইতিমধ্যে আসন্ন নির্বাচনের ভূমিকা হিসেবে,—১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল,—সর্বত্র প্রতিনিধিরা তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে ১৯৩৯ সালের পর এই প্রথম জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার মতো কোন কোন কাজ যুদ্ধের সময় তাঁরা করেছেন তার হিসেব দিলেন।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গঠন অত সহজে হল না। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে জেনারেল ডোয়াইট ডি. আইসেনহাওয়ার মার্কিন কংগ্রেসের হাউস কমিটিতে বললেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিতে থাকার ইচ্ছার দ্বারা রুশিয়ার বৈদেশিক নীতি যতখানি পরিচালিত হয়, ততখানি আর কোনো কিছুর দ্বারা নয়।" তাঁর কথা ঠিক।

আমি তা নিজে জানি ; কারণ, আমি তখন রুশিয়ায় ছিলাম। আমি দেখেছি, বিজয়-উৎসবে রুশিয়ার জনতা মার্কিন আর বৃটিশ নাগরিকদের শূন্যে লোফালুফি করছে—রুশদের আদর করার রীতিই ঐরকম। আমি জানি সমস্ত রুশিয়াই আগ্রহের সঙ্গে আশা করত যে, হিটলারের পরাজয়ের পর যুদ্ধকালীন মিত্ররা আরো অনেক বছর শান্তির মধ্যে তাদের বন্ধুত্ব বজায় রাখবে।

তারা অবশ্য জানত—যুদ্ধের সময়ও বরাবরই জানত যে, আমেরিকায় এমন বহু লোক আছে যারা তলে তলে বন্ধুত্ব নষ্ট করার চেষ্টা করে এসেছে, যারা—বেশী কি!—হিটলারের জয় পর্যন্ত কামনা করত। রুশরা যখন লাখে লাখে প্রাণ দিচ্ছিল তখন তাদের মিত্রশক্তিরা পশ্চিমে 'দ্বিতীয় রণাঙ্গন' খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েও দেরি করেছে, ছু'বছর ধরে তারা এটা লক্ষ্য করেছিল। ১৯৪২ সালের মে মাসে মলোটভ ওয়াশিংটনে এই দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্বন্ধে রুজভেল্টের সঙ্গে আলোচনা করেন। মার্কিন কাগজের শিরোনামায় বড় বড় হরফে ঘোষিত হয়েছিল যে, ঐ বছর হেমন্তকালেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। চার্চিল কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়ে মলোটভকে একটা স্মারক-পত্র দিয়েছিলেন ; তাতে লেখা ছিল : "আমরা ১৯৪২ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপ মহাদেশে সৈন্য নামানোর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি।" রুশরা যুদ্ধের সমস্ত তীব্রতা একা সহ্য করে মাসের পর মাস অপেক্ষা করেছে। ১৯৪৪ সালের ৬ই জুনের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে নামানো হয়নি, রুশবাহিনী তখন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রায় সমস্তটা পুনরুদ্ধার করে পোলাণ্ডের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেক রুশ তিক্ততা নিয়ে বিস্মিত হয়ে ভেবেছে : মিত্রশক্তিরা কি যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যা হবার রুশদের হোক এই চেয়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলতে দেরি করছিল? শেষ পর্যন্ত তারা নরম্যাণ্ডিতে যে সৈন্য নামাল, সে কি রুশদের একলা বার্লিন দখল করতে দিতে পারে না বলে?

তারপর যখন একসঙ্গে রণকৌশল স্থির করা হল, রুজভেল্ট আর চার্চিল যখন যুদ্ধের অবসান ও যুদ্ধোত্তর জগৎ সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্যে, তেহেরানে এবং পরে ইয়ালটায় গিয়ে স্তালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তখন সে সন্দেহের অবসান ঘটল। স্তালিন যে অকপট ভাষায় 'ত্রিশক্তির মৈত্রীর দৃঢ়তা কামনা করে' আনুষ্ঠানিকভাবে মদ্য পান করেন, চার্চিল তাঁর লেখা যুদ্ধের ইতিহাসে তার উল্লেখ করেছেন। স্তালিন তখন বলেছিলেন, "এটা যেন দৃঢ় ও স্থায়ী হয়। আমরা যেন যথাসম্ভব খোলামন নিয়ে চলি।······মিত্রশক্তিদের উচিত নয় পরস্পরকে বঞ্চনা করা।··· এই মৈত্রীর মতো তিনটি বৃহৎ শক্তির নিবিড় মৈত্রী-বন্ধনের ঘটনা কূটনীতির ইতিহাসে ঘটেছে বলে আমি জানি না।"

পাকা সাম্রাজ্যবাদী চার্চিল স্তালিনের এই উক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "তিনি যে এতখানি দরাজ হতে পারেন, আমি তা কখনো ভাবতেও পারিনি"। এই কথাগুলো দ্বারা স্তালিন তাঁর সমগ্র জাতির ঐকান্তিক কামনাই প্রকাশ করেছিলেন। জয়ের মুখে রুশরা সত্যিই আশা করেছিল যে, তাদের দীর্ঘকালের একঘরে হয়ে থাকার বুঝি শেষ হবে; রুশরা ভেবেছিল, ভয়াবহ যুদ্ধ-ক্ষতির মূল্য দিয়ে বুঝি তারা আমেরিকা ও বৃটেনের বন্ধুত্ব কিনতে পেরেছে এখন বহুকাল ধরে পুরুষানুক্রমে বুঝি তারা শান্তিতে বাস করতে পারবে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহে আমি তাদের মুখে সে আশার আলো নিভতে দেখেছি। হিরোশিমায় আমাদের আণবিক বোমা ফেলার পর থেকে তাদের আশা মিলিয়ে যেতে শুরু করল। তারা তখনো শান্তির মুখ ঠিক মতো দেখেনি, তাদের চোখে আবার ভয় দেখা দিল। ভয়ের পর এল চিন্তা: জাপান তো শান্তির জন্যে আবেদন করছিলই, তবে আমেরিকা দু'টি জাপানী শহরের আড়াই লক্ষ লোককে খুন করল কেন? ওয়াশিংটন কি বিজয়ের ফলটা একলাই ভোগ করতে চায়? সুদূর-প্রাচীর বিলি-ব্যবস্থার সময় রুশিয়াকে দূরে রাখতে চায়? পরে, পূর্বে এবং পশ্চিমে আমেরিকার দু'টো চাল দেখে রুশদের ভুল

ভেঙে গেল ; তারা বলতে লাগল : আণবিক বোমাকে কেন্দ্র করে নূতন কূটনীতির আরম্ভ হল।"

পূর্বে, ওয়াশিংটন রুশিয়া ও চীনকে একেবারে বাদ দিয়ে জাপানের সঙ্গে অস্ত্র-বিরতির ব্যবস্থাটা শুধু যে এককভাবেই সারল, তা নয় ; জাপানী সেনাপতিদের সঙ্গে উপরি শর্তও করল, যার ফলে মার্কিনরা ৩০ কোটি ডলার খরচে বিমানযোগে চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যদের যতক্ষণ উত্তর চীনে এনে না ফেলল, ততক্ষণ জাপানীরা চীনা কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করে গেল, আর শেষ পর্যন্ত চিয়াং কাই-শেকের সৈন্যদের হাতে আত্মসমর্পণ করল। পশ্চিমে, ওয়াশিংটন বুলগেরিয়াকে জানাল, বুলগেরিয়া যদি স্বীকৃতি পেতে চায়, তা হলে তাকে তার মন্ত্রিসভায় আমেরিকার পছন্দ মতো কয়েক ব্যক্তিকে নিতে হবে। রুশরা অবাক হয়ে গেল ; তারা বলল, "আমরা তো কই ফ্রান্স, হল্যাণ্ড বা বেলজিয়ামকে তাদের মন্ত্রিসভা বদলাতে বলি না। বুলগেরিয়া প্রভাবের ক্ষেত্র আমাদের।"

তারপর রুশিয়ার নিজেরই পুনর্গঠনের উপর চোট এল। যুদ্ধের সময় রুশদের ভরসা হয়েছিল, সম্মিলিত যুদ্ধে তাদের যেসব ধ্বংস হয়েছে, সেটা নতুন করে গড়ে নেবার জন্যে আমেরিকা থেকে তারা একটা বড় গোছের 'গঠন কাজের জন্যে ঋণ' পাবে। ১৯৪৩ সালে ডোনাল্ড নেলসন, রুজভেল্টের বিশেষ দূত হিসেবে যখন মস্কো যান, তখন তিনি বলেছিলেন, ছয়শ' কোটি ডলার ঋণ দিলেই ঠিক হয়। তার পরের কয়েক বছর, মার্কিন প্রতিনিধিরা এ কথার সমর্থন জানান। রুশরা সত্যিসত্যিই এ কথায় বিশ্বাস করেছিল ; তখন তারা খাদ্যাভাবে, শীতে কষ্ট পাচ্ছিল। তারপর রুজভেল্টের মৃত্যু হল ; আর ট্রুম্যান এত আকস্মিকভাবে রুশিয়াকে 'ঋণ-ইজারা'-ভিত্তিতে সাহায্য দেওয়াও বন্ধ করল যে, নিউ ইয়র্ক বন্দরে রুশিয়ায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত জাহাজ থেকেও মাল নামিয়ে নেওয়া হল। রুশিয়া যখন তার ক্ষয়ক্ষতির একটা তালিকা দিয়ে ঋণের প্রথম দফার একশ' কোটি ডলারের জন্যে প্রার্থনা জানালে, আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তর রুশিয়ার চিঠিটাই প্রায় এক

বছরের জন্যে 'হারিয়ে ফেলল'। ঐ ঋণ না পাওয়াতে, অনেক রুশকেই সেই বিজয়ের বৎসরেই অনাহারেই মরতে হল।

অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পছন্দ মতো তাদের সরকার না গড়লে, পূর্ব ইউরোপের কোনো জাতিই ওয়াশিংটনের কাছ থেকে পুনর্গঠনের জন্যে ঋণ পাবে না। তারা তা করতে কিছুটা রাজী ছিল। ওয়াশিংটনের আদেশে বুলগেরিয়া তার মন্ত্রিসভা বদলেছিল; নির্বাচনের আকার সম্বন্ধে আমেরিকা আপত্তি জানানোতে বুলগেরিয়া তার নির্বাচনও স্থগিত রেখেছিল। পূর্ব ইউরোপের সব দেশগুলোই আমেরিকার কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার আশা করত, তার জন্যে তারা আমেরিকার সঙ্গে বনিয়ে চলতেও রাজী ছিল। তারা তাদের কারখানা-শিল্পে বৈদেশিক মূলধনকে সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল; তারা সমাজতন্ত্র স্থগিত রাখতেও গররাজী ছিল না—'নতুন আর্থিক নীতি (নেপ্—NEP)' প্রবর্তন করে লেনিন যেমনটা করেছিলেন। মস্কোও তাতে আপত্তি করেনি। কারণ, মস্কোর নিজের অর্থনৈতিক সমস্যার উপর আবার পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক সমস্যা ঘাড়ে করার তার কোনো আগ্রহ ছিল না। এ সব দেশ যদি পুঁজিতন্ত্রকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে মার্কিন ঋণ পায় তো পাক; তার মধ্যে মাথা গলাবার প্রবৃত্তি মস্কোর ছিল না।

বিজয়ের পর প্রথম কয়েক বছর মস্কো পূর্ব ইউরোপের ব্যাপারে ঢিলা দিয়ে চলেছিল। আমেরিকানরা ভেবেছিল, লাল ফৌজ এসব দেশে পা দিয়েই তাদের সোবিয়েৎ বানিয়ে ফেলবে, তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করবে, তাদের খামার-গুলো যৌথ সম্পত্তি করে দেবে। মার্কিন সংবাদ-দাতারা অবাক হয়ে গেল যে, রাজা মাইকেল কমিউনিস্টদের জেলে পাঠাচ্ছেন দেখেও লাল ফৌজ তাঁকে কোনো বাধা দিল না; সেটা রোমানিয়ার ঘরোয়া ব্যাপার বলে ছেড়ে দিল। আমি ১৯৪৫ সালে যখন পোলাণ্ডে ছিলাম, তখন দেখেছি, সেখানে চাষীদের যৌথ খামার খাড়া করতে বলা ছিল 'রাষ্ট্রদ্রোহ'; ভয়, পাছে চাষীরা বিরূপ হয়ে যায়। মস্কো

চাচ্ছিল, তার সীমান্তের প্রতিবেশী জাতিগুলো মৈত্রীভাবাপন্ন হোক। কিন্তু ১৯৪৫-৪৬ সালে সোবিয়েৎ সরকারের কার্যাবলী থেকে বোঝা যায় যে, বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধকালীন বন্ধুত্ব বজায় রাখার জন্যে স্তালিন পূর্ব ইউরোপে তাদের অনেক কিছু সুযোগ-সুবিধা ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন। ঐ সময় রুশরা রোমানিয়ার রাজা মাইকেলের বর্বর প্রতিক্রিয়াশীল রাজত্ব দীর্ঘকাল সহ্য করে গিয়েছিল; গ্রীসের যে কমিউনিস্টরা যুদ্ধ করছিল তাদের সাহায্য করতে যায়নি; বুলগেরিয়া আমেরিকার কথায় নির্বাচন স্থগিত রাখলে তার প্রতিবাদ করেনি; ওয়ারশর মন্ত্রিসভায় 'লণ্ডন' থেকে আসা (অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিনপক্ষীয়) তিনজনকে ঢোকানো হলে আপত্তি জানায়নি।

এটা 'একদেশে সমাজতন্ত্রে'র নীতির ন্যায্য পরিণতি। বিশ বছর ধরে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন নিজেকে গড়ে তুলতে এত বেশী ব্যস্ত ছিল যে, রুশিয়ার বাইরে বিপ্লব করার সম্পর্কে তার আগ্রহ ক্রমেই কমে এসেছিল। প্রথম দিকের যে তমসাচ্ছন্ন রুশিয়া মুক্তির জন্যে জার্মানির শ্রমিকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী ছিল, সেটা এখন একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছিল। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেখে অন্য দেশ শিখবে, দৃষ্টান্ত স্থাপন করেই যে তারা কাজ করছে—এই ছিল তার মত। বৈদেশিক ব্যাপারে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের প্রধান লক্ষ্য ছিল, অন্য দেশের বিপ্লবী শক্তিকে পুষ্ট করা নয়, নিজের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোকে যুদ্ধে জোট বাঁধতে না দেওয়া। সেটা যখন এড়ানো গেল, স্তালিন যখন দেখলেন যে চার্চিল ও রুজভেল্টের সঙ্গে তাঁর মৈত্রী-বন্ধন হয়েছে, তখন তিনি 'কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের' ভেঙে-যাওয়ার সহায়তা করলেন। তেহেরান সম্মেলনে 'এক দেশে সমাজতন্ত্রের' সেই পুরাতন নীতি বিকশিত হয়ে উঠল "ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতিরূপে।" ইয়ালটা সম্মেলনে স্তালিন আরো এগিয়ে স্বপ্ন দেখলেন যে, তিনটি বৃহৎ মিত্রশক্তি তাদের 'প্রাণ-খোলা বন্ধুত্ব' বজায় রেখে একযোগে বিশ্বশান্তিকে দৃঢ় করবে।

পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম দু'টি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সহযোগিতার উপর বিশ্বশান্তি গড়ে উঠতে পারে, এরকম স্বপ্ন দেখা একজন পাকা বলশেভিকের পক্ষে বিস্ময়কর বটে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এই স্বপ্নের উপরই গড়া হয়েছিল। যুদ্ধের পর প্রথম কয়েক বছর মস্কোর পূর্ব ইউরোপ সংক্রান্ত নীতির ভিত্তি ছিল এইটাই।

মস্কো যতই সুযোগ-সুবিধা দিয়ে চলুক, আমেরিকার কাছে তা পর্যাপ্ত মনে হয়নি। রুজভেল্ট হয়তো বুঝতেন, কারণ তিনি ছিলেন বিশ্বরাজনীতিক, তাঁর ইতিহাস জানা ছিল। কিন্তু ট্রুম্যান প্রেসিডেণ্ট হওয়ার পরই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে যত কিছু সঙ্কীর্ণতা, যত কিছু লোভ, [illegible]দের যন্ত্র পেল এই গেঁয়ো রাজনীতিকের মধ্যে—যার হাতে ছিল একচেটিয়া আণবিক বোমা, আর যার মাথায় ছিল ঐতিহাসিক বোধের একান্ত অভাব। ট্রুম্যান ভুলে গেলেন—হয়তো আদৌ জানতেনই না—যে, রোমানিয়া, সারবিয়া আর বুলগেরিয়া একশ' বছর ধরে রুশদের প্রভাবের ক্ষেত্রে থেকেছে; যে একশ' বছর আগে রুশিয়া তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধ করার ফলেই এ তিনটি দেশের রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মাঝের সময়টাতে এ তিন দেশের শাসকরা স্বৈরাচারী রাজা হওয়ার দরুণ সোভিয়েৎ-বিরোধী হলেও তাদের চাষীরা কোনোদিন তাদের রুশপ্রীতি হারায়নি। সুতরাং লাল ফৌজ যখন জার্মানদের তাড়িয়ে দিল, এ তিন দেশের নাৎসীপক্ষীয় সরকারী লোকেরা পালিয়ে গেল; নতুন শাসক-শক্তির উদ্ভব হল; তিনটি দেশেই লোকে রুশদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। ট্রুম্যানের চোখে ওয়াশিংটন এই ঘটনার মধ্যে দেখল শুধু ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

ওয়াশিংটন কোনোদিন যুদ্ধটার 'ফাসিস্ত-বিরোধী' প্রকৃতি স্বীকার করে নেয়নি; সুতরাং ফাসিস্ত কবলমুক্ত দেশগুলোতে সে ফাসিস্ত-বিরোধী মোর্চার সঙ্গে লড়াই করল। পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকার চাপে এ মোর্চা ভেঙে গেল; ভোটের জোরে কমিউনিস্টরা যেখানে

শাসন-কর্তৃত্বে অংশ নেওয়ার অধিকারী, সেখানে তারা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। পূর্ব ইউরোপে আমেরিকার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। এই সব জাতি তাদের যুদ্ধের সময়কার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা সাধারণ ছক ধরে চলল। সকল দেশেই বড় বড় জমিদার ছিল, নাৎসীদের সঙ্গে তারা সহযোগিতা করেছিল, জার্মান বাহিনীর সঙ্গে তারা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল; তার ফলে চাষীদের মধ্যে জমি বিলির ব্যবস্থা, বহু আগেই যা হওয়ার দরকার ছিল, সেটা সহজ হয়ে গিয়েছিল। এই সমস্ত দেশেই বড় বড় শিল্প-কারখানাগুলোর উপর জার্মানরা দৃঢ় মুষ্টি রেখেছিল; জার্মানরা পালানোতে সেগুলো মালিকহীন, তথা বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়েছিল। দেশের শিল্পগুলোকে জাতীয় সম্পত্তি করে নেওয়া শুধু সহজ নয়, অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল; আমেরিকা সুযোগ-সুবিধা করে দিলে সেটা এড়ানো যেত; কিন্তু আমেরিকা তা করল না। এ সব দেশেই লড়াইয়ের ফলে আগেকার রাজনৈতিক নেতারা নেতৃত্ব হারিয়েছিল, নিন্দিত হয়েছিল; এ সব দেশই রাজনীতির ব্যাপারে দু'টো মূল ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল; —যারা নাৎসীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, আর যারা নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়েছিল। এই কারণে এই সব দেশে প্রথম যে সরকারগুলো গঠিত হয়েছিল, তাতে ছিল ছোট ছোট অনেক ফ্যাকড়া দল; যে দলই জার্মানদের সঙ্গে লড়েছিল, সে দলই শাসন কর্তৃত্বে অংশ পেয়েছিল। মার্কিন দূতাবাসগুলো অসন্তুষ্ট প্রাক্তন নেতাদের শিখিয়ে পড়িয়ে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকারের মধ্যে তাদের ঢোকাবার দাবি করল। পূর্ব ইউরোপীয় জাতিগুলোও আমেরিকার অনুগ্রহ লাভের আশায় মাঝে মাঝে আমেরিকানদের কথামত কাজ যে করেনি, এমন না। কিন্তু ওয়াশিংটনের মতে, ওরা কখনো ঠিকমত তার কথা শুনে চলেনি।

সমস্ত পূর্ব ইউরোপ যে মার্কিন ঋণের আশায় বসেছিল, সে ঋণ পাওয়া গেল না; যুদ্ধে-অবসন্ন রুশিয়ার উপর পূর্ব ইউরোপকে আর্থিক সাহায্যের জন্যে নির্ভর করতে হল। তার ফলে, মাল আর দাম নিয়ে

মন কষাকষি চলতে লাগল; কারণ, কোনো কিছুই পর্যাপ্ত ছিল না। মস্কো শক্ত হয়ে, হিসেব করে মাল বিলি করতে লাগল। ওয়াশিংটনের 'ঠাণ্ডা লড়াই' নীতি গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব ইউরোপে মস্কোর নীতি পরিবর্তিত হল।

এই পরিবর্তন দেখা গেল, অকস্মাৎ যুগোস্লাভিয়াকে কমিউনিস্ট সাহচর্য থেকে রূঢ়ভাবে বঞ্চিত করার মধ্যে; মাত্র দু'বছর আগে যে ধরনের 'জাতীয় স্বাধীনতা' স্বতঃসিদ্ধ ছিল, সেই 'জাতীয় স্বাধীনতা' দাবি করায় যুগোস্লাভিয়াকে এই শাস্তি দেওয়া হল। টিটোর প্রতি স্তালিনের বিরূপ মনোভাব এবং মস্কো যতখানা জোগাতে পারে তার চেয়ে বেশী শিল্পায়নের জন্যে যুগোস্লাভিয়ার হৈ চৈএর জন্যে কিছুটা দায়ী হলেও, এই পরিবর্তনের আসল কারণটি যুগোস্লাভিয়া ছিল না, ছিল হ্যারি এস. ট্রুম্যানের মধ্যে। অবিরত রুশদের সূঁচ ফোটানোর পর ট্রুম্যান ঘোষণা করেছিলেন তাঁর 'ট্রুম্যান নীতি'; 'সাম্যবাদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্যে' তিনি গ্রীসে আর তুরস্কে সৈন্য পাঠাচ্ছেন। ক্রমেই বেশী শত্রুভাবাপন্ন আমেরিকার পূর্ব ইউরোপের উপর এই মুরুব্বিয়ানার স্বাভাবিক ফল ফলল। মস্কো পূর্ব ইউরোপের উপর তার নিয়ন্ত্রণ শক্ত করল, পূর্ব ইউরোপকে একটা দৃঢ়বদ্ধ সামরিক জোটে পরিণত করতে চাইল, যুগোস্লাভিয়া তাতে আপত্তি করায় তাকে 'পার্জ' করে দিল।

যেসব 'কড়া হওয়ার' নীতি প্রয়োগ করে ওয়াশিংটন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা স্থায়ী বন্ধুত্ব সম্পর্ক—স্তালিনের তথা রুজভেল্টের যা ছিল স্বপ্ন, তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করল, সেগুলোর দীর্ঘ ফিরিস্তি আলোচনা করার এখানে স্থান নেই। মলোটভ যখন সান্ ফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম কংগ্রেসে যাচ্ছিলেন, ট্রুম্যান তাঁকে অপমান করলেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রথম সম্মেলনে আমেরিকা সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে 'আক্রমণে'র দায়ে খাটো করল; অপরাধ, সোবিয়েৎ সৈন্যরা ইরান ত্যাগ করে যেতে দেরি করছিল। মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা কিন্তু তখনো পৃথিবীর নানা জায়গায় নিন্দে না কুড়িয়ে দিব্যি আরামে বসেছিল। মস্কো

'বার্লিন বেষ্টনী' রচনা করেছিল একটা সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে। মার্কিন এলাকা থেকে নতুন নোট ছাপা হয়ে হু হু করে রুশ এলাকায় আসছিল ; পূর্ব জার্মানির অর্থনীতিকে তার কুফল থেকে বাঁচাবার জন্যে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা সেই ছুতোয় বেশ কিছুদিন দেখিয়ে নিল, তার কত বাড়তি বিমান আছে ; মাল-পত্তর আছে। ওয়াশিংটন শান্তির ইঙ্গিত হিসেবে আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে 'বারুচ্‌ পরিকল্পনা' হাজির করেছিল, প্রত্যেকটি রুশ তার মধ্যে দেখল জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বের মাধ্যমে সোবিয়েতের প্রাকৃতিক সম্পদ দখল করার চেষ্টা, আর ওয়াশিংটন হল সে কর্তৃত্বের নিয়ন্তা।

আমেরিকার সংবাদ-সমালোচকরা যখন, ক্রমেই বেশী বেশী করে, রুশরা "লড়াইএ একটা বৃহৎ ভূখণ্ড দখল করে নিয়েছে" বলে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, ক্ষতির সঙ্গে তখন যেন অপমানও যুক্ত হল। রুশদের কাছে এ সব ছিল তাদের নিজেদের জমি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তারা এগুলো হারিয়েছিল, এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আংশিকভাবে উদ্ধার করেছে। রুশরা প্রথম মহাযুদ্ধে ৩,৩০,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড হয় হারিয়েছিল, নয় ছেড়ে দিয়েছিল ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তারা ২,৫০,০০০ বর্গমাইল আবার উদ্ধার করেছে। ৮০,০০০ বর্গমাইল তাদের মোট লোকসান যাচ্ছে। ফিনল্যাণ্ড ও পোলাণ্ডকে তারা মোটামুটি এই পরিমাণ জমি ছেড়ে দিয়েছে। মহাযুদ্ধের দরুণ অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগর যখন 'মার্কিন দরিয়া'য় পরিণত হল, রুশরা তখন কোনো আপত্তি করেনি, অথচ যে আমেরিকানরা সব মহাসাগর-গুলোকে দখল করে সেগুলোর দ্বীপে দ্বীপে এবং উপকূলে উপকূলে ঘাঁটি বানাচ্ছিল, তারাই যখন নিজেদের হাতছাড়া জমি উদ্ধার করায় রুশদের লোভী বলল ; তখন রুশদের তো চটবারই কথা।

ট্রুম্যানের 'সঙ্কোচনমূলক' নীতি, আর যে আমেরিকার বন্ধুত্ব তারা কামনা করছিল তাদের অবিশ্রান্ত খোঁচার ফলে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের *মধ্যে একটা রগ-চটা*, বাড়াবাড়ি রকমের *দেশপ্রীতি দেখা দিল*।

রুশিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশ যে কোনোকালে কোনো ভালো জিনিস আবিষ্কার করেছে এরকম বিশ্বাসকেও রুশরা 'বিশ্বনাগরিকতা'—প্রায় দেশদ্রোহ—মনে করতে লাগল। যে সমবেত বিজয়ের জন্যে, অন্য মিত্র-শক্তিরা সমবেতভাবে যত মূল্য দিয়েছে, রুশরা তার চেয়ে বেশী মূল্য দিয়েছে, সে বিজয়ের ফলে তারা বিশ্বশান্তি গঠনের কাজে অংশীদার হওয়া দূরে থাক, আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিগুলো দিয়ে তৈরী একটা নতুন শত্রুতামূলক বেষ্টনীর মধ্যে পড়ে গিয়েছে, আর সে আমেরিকা তখনো আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার নিয়ে নিজের ছাড়া আর সকলের যে কোনো প্রসারের চেষ্টাকে 'আক্রমণ' বলে বিদ্রূপ করছে—এই তিক্ত জ্ঞানের প্রতিরোধক হিসেবে উদ্ভব হয়েছিল এই রুগ্ন জাতীয়তার।

ঐ সময় রুশিয়ায় একটা ইহুদী-বিদ্বেষও গজিয়েছিল, আমি সেটা পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে পারব না। এতে সরকারী সমর্থন ছিল না; যে আইনের দ্বারা ইহুদী-বিদ্বেষকে অপরাধ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেটা কোনোদিন বাতিল করা হয়নি। তবু, শুধু ব্যক্তির দ্বারা নয়, সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বারাও, অনেক ইহুদী এবং তাদের সংস্কৃতির হানিকর অনেক কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বে-আইনী বিধায়, এ সব কাজ করা হয়েছিল আড়ে-আবডালে। সে সব কাজের স্বপক্ষে যে সব কারণ দেখানো হত, সেগুলো সত্যি কিনা বোঝা শক্ত ছিল। ১৯৪৮ সালে ইহুদীদের সংবাদপত্র ও থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হল; কারণ দেখানো হল ঃ "এগুলোর তেমন চাহিদা নেই।" যেহেতু ইহুদী জাতীয় লোকদের জার্মান অধিকৃত এলাকা থেকে সরিয়ে সাইবেরিয়ার নানা স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর তাদের অনেকেই কখনো ফেরেনি—সেহেতু এই 'কারণ'টা আংশিক ভাবে সত্যি হতেও পারে। তবে এই ইহুদী-বিদ্বেষের ব্যাপারে রুশদের ঐ সময়কার বাড়াবাড়ি রকমের দেশপ্রেমের যে একটা প্রভাব ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৪৯ সালে ইংরেজি ভাষায় লেখা 'মস্কো নিউজ' কাগজটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর ঐ কাগজের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ইহুদী-বিদ্বেষের অনেকগুলোই কারণ ছিল। হিটলার কর্তৃক আক্রান্ত এলাকাগুলো থেকে যখন নাগরিকদের সরানো হয়েছিল, ইহুদীদের তখন সুচিন্তিতভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তার সঙ্গত কারণ ছিল ; জার্মানরা ইহুদীদের নিশ্চয়ই মেরে ফেলত ; রুশদের তবু রেহাই পাওয়ার কিছু সম্ভাবনা ছিল। সোবিয়েৎ সরকারের এই নীতির ফলে বিশ লক্ষ ইহুদী প্রাণে বাঁচল বটে, কিন্তু যে রুশদের সরানো হল না তাদের কাছে তারা অপ্রিয় হয়ে গেল। তা ছাড়া, এই নীতির ফলে রুশিয়ার পূর্বাঞ্চলে সর্বত্র শরণার্থীদের মধ্যে ইহুদীদের অনুপাত বেড়ে গেল ; শরণার্থীরা স্থানীয় লোকের পক্ষে বোঝা হয়ই,—তাদের তারা ভালো চোখে দেখে না। তা ছাড়া, আগে যে এলাকার নাম ছিল পূর্ব পোলাণ্ড, তা সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে যে লোকগুলো এসেছিল, তাদের মধ্যে আগে থেকেই ইহুদী-বিদ্বেষ প্রবল ছিল। সরকারী কর্মচারীরা ইহুদী-বিদ্বেষে প্ররোচিত হয়েছিল বোধ হয় এই কারণে যে, ইস্রায়েলে ইহুদীদের একটা জাতীয় রাষ্ট্র হয়েছিল, আর সেই রাষ্ট্রের দূত সোবিয়েৎ ইউনিয়নে এলে, ইহুদীরা তার অভ্যর্থনায় প্রচণ্ড আড়ম্বর দেখিয়েছিল। তার দ্বারা, অন্ততঃ ভাসা-ভাসা ভাবেও, ইহুদীদের দ্বৈত নাগরিকতা সূচিত হচ্ছিল বলে মনে হয়েছিল।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইহুদীদের বিরুদ্ধে কতখানা বাদ-বিচার ছিল, সেটা বলা শক্ত। কোনোদিন তা সাধারণ ব্যাপার ছিল না, তবে কিছুটা যে তা ছিল, এটা ঠিক। বাদ-বিচার করা হত গোপনে ; তা নিয়ে ঝগড়াও বাধত। আমার ঘনিষ্ট বান্ধবীর একবার মনে হয়েছিল, বিশ্ববিদ্যালয়-শাখার পার্টি-সম্পাদক ইহুদী-বিদ্বেষে উস্কানি দিচ্ছেন, আর তাতে তিনি সায় দেননা বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীতে তাঁর যথাযোগ্য সুবিধা হচ্ছিল না। একদিন তিনি উল্লসিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। তিনি বললেন, "এখন বুঝলাম, পার্টি ইহুদী-বিদ্বেষের পক্ষপাতী নয়। ওরা এ.-কে সরিয়েছে।···কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভার ছিল তার উপর। এই

সব ইহুদী-বিদ্বেষের অনেকগুলোর পিছনে ছিলেন সেই।” এই কাহিনী থেকে বোঝা যায়, কি রকম গোলমেলে অবস্থা চলছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী লোকেরাও কখনো কখনো ইহুদী-বিদ্বেষ উস্কিয়েছে, তবে সব সময়েই চোখ এড়িয়ে। যে মৌলিক আইনে এটা অপরাধ বলে গণ্য ছিল, সে আইনের বিরুদ্ধে কোনোদিন কেউ আপত্তি জানায়নি; সে আইন কোনোদিন বাতিল হয়নি।

বিশ্বনাগরিকতার বিরুদ্ধতা করা একটা রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেটা সারার সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী-বিদ্বেষও চলে গেল। গেল, কোনো আইনের বলে নয়, কোনো সরকারী আদেশেও নয়, সেটা কেটে গেল তিনটি কারণে। ১৯৫০ সালে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে যত উৎপাদন হল, তত আর কখনো হয়নি; সব কিছুরই প্রাচুর্য দেখা দিল, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন আণবিক বোমার রহস্য ধরে ফেলল; তার উপর আমেরিকার একাধিপত্যের ভয় ঘুচল। তা ছাড়া, ১৯৫০ সালে পিকিং-এ চীনের লোকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েই সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হল। ঠাণ্ডা লড়াইএর ফলে যে রুগ্ন, বাড়াবাড়ি রকমের দেশপ্রেম গজিয়ে উঠেছিল, সেটা টিকতে পারল না একটা প্রাচ্য সম-মর্যাদাসম্পন্ন মিত্রের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসে—সে মিত্র দেশটি রুশিয়ার হাজার বছর আগেও বহু কিছু আবিষ্কার করেছিল, আর তার বর্তমান বুদ্ধিশক্তি ও সিদ্ধিকেও সব চেয়ে কৃতী রুশদেরও প্রশংসা না করে উপায় ছিল না।

প্রত্যেক দেশেরই যে সমাজতন্ত্রে পৌঁছবার জন্যে নিজের নিজের পথ আছে—এই নীতি যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরে পূর্ব ইউরোপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল। তারপর, ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আমলে জাতীয়তার নীচে সেটা চাপা পড়ে যায়; এখন আবার সেই নীতি বেরিয়ে এল,—এবার স্থায়ী হবার জন্য। ‘ধনিকতন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ার’ ত্রিশ বছরের দুঃস্বপ্ন—রুজভেল্ট আর চার্চিলের সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধন করে স্তালিন যা কাটিয়ে ওঠার আশা করেছিলেন পিকিং-এর সঙ্গে মৈত্রী-বন্ধনে তার অন্ত হল। এখনো মার্কিন বিমান

ঘাঁটিগুলো সোবিয়েৎ ভূমির পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে থাকল—কিন্তু সে একটা সুদূর চক্রের বাইরে থেকে। এখন তারা আর রুশিয়াকে 'ঠেকিয়ে রাখতে' পারে না। সোবিয়েৎ ইউনিয়নের দৃঢ়ীভূত অর্থনীতি এবং আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার রহস্য ভেদ, এরি মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে এমন একটি সামরিক নিষ্ক্রিয় অবস্থার সূচনা করছে, যেখানে পূর্বপশ্চিমের দ্বন্দ্বের মীমাংসায় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সাহায্যই হবে চরম অস্ত্র।

১৯৫০ সালের আর একটা ঘটনা দ্বারা পরিণতিটা নিকটতর হল। ওয়াশিংটন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে কোরিয়ায় এমন একটা যুদ্ধে নামাল, যে যুদ্ধ সমগ্র এশিয়ার চোখে ধরা পড়ল, নয়া চীনের ব্যাপারে মাথা গলানোর একটা অপচেষ্টা বলে। এই যুদ্ধ থেকে আমেরিকার বিশ্ব-নেতৃত্ব ক্রমেই হ্রাস পেতে লাগল—প্রথমে এশিয়ায়, পরে ইউরোপেও। শেষ পর্যন্ত সোবিয়েতের লোকে শুধু সমৃদ্ধির নয়, শান্তির পথ দেখতে পেল—সে শান্তির স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখতে পেল। সে শান্তির ভিত্তি ওয়াশিংটন আর লণ্ডনের সঙ্গে মৈত্রীর উপর নয়, নূতন স্বাধীনতা পাওয়া পৃথিবীর প্রাক্তন ঔপনিবেশিক জাতিগুলোর উদগ্র শান্তি ও সমৃদ্ধিকামনার উপর।

চাকা পুরোপুরি ঘুরে এল। যে জাতি ১৯২৭ সালে বিশ্ববিপ্লবের কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছিল, একক দাঁড়িয়ে শত্রু-পরিবেষ্টিত অবস্থায় একটি মাত্র দেশে সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে লেগেছিল, সেই জাতিই আবার বিশ্বজোড়া জেহাদে নামল। এবার কিন্তু বিশ্ববিপ্লবের জন্যে নয়, বিশ্বশান্তির জন্যে। ডালেসের মতো সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে 'গায়ের জোরে' যে শান্তি বজায় রাখার কথা শোনা যায়, সে শান্তির জন্যে এ জেহাদ নয়; এ জেহাদ সেই শান্তির জন্যে যা পৃথিবীর সমস্ত জাতি, তাদের সরকারের মাধ্যমে হোক বা সরকারকে ডিঙিয়ে হোক, তাদের সক্রিয় চাপের দ্বারা বজায় রাখতে পারে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তার 'শান্তি অভিযানে'র জন্যে বিখ্যাত হয়ে উঠল। ১৯৫২ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' লিখল: "ক্রেমলিনের (অর্থাৎ

সোবিয়েৎ সরকারের) 'শান্তি অভিযান' পশ্চিমকে একটা শক্ত সমস্যায় ফেলেছে।" "সহ-অবস্থান সম্ভব"—এই কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে স্তালিন ১৯৫২ সালে তিন তিনবার ফট্‌কা বাজারকে নাড়া দিলেন। সোবিয়েৎ দেশ আণবিক বোমা নিষিদ্ধ করার দাবি সহ শান্তি আবেদনের উৎসাহদাতা হয়ে উঠল ; সোবিয়েৎ ইউনিয়ন তার জন্যে কূটনৈতিক প্রণালীতে চেষ্টা করতে লাগল। সোবিয়েৎ নাগরিকরা আবার অন্য দেশের লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে স্টকহোম্ শান্তি সম্মেলন, পঞ্চশক্তি শান্তি চুক্তি, শান্তিকামী সঙ্ঘ প্রভৃতির মাধ্যমে শান্তির জন্যে সক্রিয় হল। এই শান্তির আবেদনে তারা পৃথিবীর সমস্ত বয়স্ক লোকদের প্রায় অর্ধেকের সহি সংগ্রহ করল।

স্তালিনের জীবনের শেষ কয় বছর, এই নীতি সমর্থিত হল শুধু কূটনীতি আর প্রচারের দ্বারা নয়, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ক্রমবর্ধমান আর্থিক শক্তির দ্বারাও। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে, মস্কোতে একটা 'বিশ্ব-আর্থিক সম্মেলন' ডাকা হল। সেটা ডাকা হল—সোবিয়েৎ-গোষ্ঠীর সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করে আমেরিকানরা যে অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তার পাল্টা চাল হিসেবে। কথা ছিল, ঐ সম্মেলনে মতবাদের সম্পর্কে কোনো আলোচনা না করে ; নিছক বিশ্ব-বাণিজ্যের বিষয়েই আলোচনা করা হবে। এই নিয়মটা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। চার শতাধিক প্রতিনিধির মধ্যে যে একমাত্র লোক এ নিয়ম লঙ্ঘন করেছিলেন তিনি এসেছিলেন সান ফ্রান্সিস্‌কো থেকে ; তিনি চাইলেন, সম্মেলন ঘোষণা করুক যে, "স্বাধীন (অর্থাৎ ব্যক্তিগত) কর্মপ্রচেষ্টাই সব চেয়ে ভাল।" রুশরা হয়তো মুখ টিপে হেসেছিল ; হাসবার অধিকার ছিল তাদের। সেই বছর হাওয়ার্ড কে. স্মিথ লক্ষ্য করেছিলেন যে, "মস্কোতে জীবনযাত্রার মান এত বেড়ে গিয়েছে যে, তাকে আর চেনা যায় না।"

সোবিয়েৎ প্রতিনিধিরা পাকা ব্যবসায়ীদের মত মোলায়েম ভাবে তাঁদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গেলেন। 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস' লক্ষ্য করেছিল যে, "রুশ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিঃ নেস্টেরভ অন্যান্য

জাতির অর্থনীতির দুর্বলতাগুলো বেছে বেছে তুলে ধরে দেখালেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে বাণিজ্য করলে সেগুলো দূর করা যেতে পারে।" ১৫ই এপ্রিল তারিখে 'ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল' বলল: যেসব বৃটিশ আর জাপানী মালের বাজারে চাহিদা নেই, তারা সেগুলো কিনে নেওয়ার প্রস্তাব দিল। তারা পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপকে তাদের যেসব জিনিসের একান্ত অভাব, সেই মোটা শস্য, কাঠ আর কাঁচামাল জোগান দেওয়ার কথা বলল; ভারতকে তারা গৃহ নির্মাণের ইস্পাত দিতে চাইল।...তারা বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য নিতে চাইল।...দ্রব্য-বিনিময় করার কথা বলল।...তাদের এ সব প্রস্তাবই শুনতে লোভনীয়।" ২০শে এপ্রিল তারিখে 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' লিখল, "এটা পশ্চিমকে তার দুর্বলতম জায়গায় ঘা দিয়েছে; কারণ, মালের বাজার না থাকায় ইউরোপে বেকারি বেড়ে গিয়েছে।"

একটু ঘুরিয়ে বললে বলা যায়, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক জগৎকে আরো কিছুকাল তার পায়ের উপর খাড়া থাকবার জন্যে সাহায্য করতে চাইল। কেন? দুনিয়ার লোকে যতদিন কোনো একটা অর্থনৈতিক পদ্ধতি ধীরে সুস্থে বেছে নিতে না পারছে, ততদিন পর্যন্ত উত্তেজনা প্রশমিত রাখার জন্যে, পৃথিবী-নৌকার আলোড়ন বন্ধ রাখার জন্যে। এতদিনে রুশরা অপেক্ষা করার মতো অবস্থায় এসেছে।

স্তালিনের শেষ সরকারী কাজ হচ্ছে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে পার্টির ১৯তম কংগ্রেসের জন্যে ৫০ পাতার রিপোর্ট লেখা। ১৯৩৯ সালের ১৩ বছর পরে এই কংগ্রেস বসেছিল; এর মধ্যে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন ধ্বংসের মুখে এসেও সে নিজেকে নতুন করে গড়ে নিয়েছিল। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে' হ্যারিসন স্যালিস্‌বারি লিখলেন: "কংগ্রেসের মেজাজে ফুটে উঠল এই দৃঢ়তম বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে যে রকম পরীক্ষাই আসুক না, সোবিয়েৎ-গোষ্ঠী তার সম্মুখীন হতে পারবে, তাতে উত্তীর্ণ হতে পারবে।" এই কংগ্রেসে মূলগায়েন হলেন স্তালিনের বদলে ম্যালেনকভ। সোবিয়েতের লোকে এটা থেকে ধরে নিল যে, স্তালিন

ম্যালেনকভকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে গড়ে তুলছেন, নিজের কাজ হস্তান্তরের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

স্তালিন নিজে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা বলে একখানা রিপোর্ট বার করলেন—তা'তে পৃথিবীর তৎকালীন পরিস্থিতি এবং সে পরিস্থিতি কি ভাবে গড়াবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। তিনি বললেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ফল হয়েছে এই যে, "ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব-বাজার ধ্বসে গিয়েছে ;" তার বদলে, "দু'টো সমান্তরাল এবং পরস্পরবিরোধী বাজারের" সৃষ্টি হয়েছে। সোবিয়েৎ-গোষ্ঠী পশ্চিম-আরোপিত অবরোধের ফলে তার অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে বাধ্য হয়েছে, তার ত্রুটির ফাঁকগুলো পূরণ করে নিয়েছে : এখন তার 'একটা নিজস্ব বাজার হয়েছে'। ধনতান্ত্রিক জগতের বাজার, সোবিয়েতের সঙ্গে বাণিজ্য নিষিদ্ধ করার ফলে নিজেই গণ্ডীবদ্ধ হয়েছে এবং আরো হবে ; আর তার ফলে, ধনতান্ত্রিক জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেড়ে যাবে। তিনি বললেন, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন "ধনতন্ত্রীদের আক্রমণ করবে না ; তারা তা জানেও"। এ কথা তিনি আগেও বলেছিলেন, এবার এর সঙ্গে এই ভবিষ্যদ্‌বাণী জুড়ে দিলেন যে, ধনতান্ত্রিক জাতিরা "সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে আক্রমণ করতে ভয় পাবে, পাছে তার ফলে ধনতন্ত্রই ধ্বংস হয়ে যায়।" এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, সোবিয়েৎ-গোষ্ঠীর সঙ্গে ধনতন্ত্রী জাতিগুলোর যুদ্ধ হওয়ার চেয়ে ধনতান্ত্রিক জাতিগুলোর নিজেদের মধ্যেই যুদ্ধ হওয়া বেশী সম্ভব।

এই ভবিষ্যৎ বাণী অনেকের কাছে উদ্ভট বলে মনে হল ; কারণ, তখন ওয়াশিংটনে ম্যাকার্থী-মার্কা ঠাণ্ডা লড়াই চরমে উঠেছিল। কিন্তু স্তালিন তা সত্ত্বেও সেই সামরিক অচল অবস্থার লক্ষণ দেখতে পেলেন, যার ফলে উত্তরকালে জেনেভায় উচ্চতম পর্যায়ের সম্মেলনটা ঘটল। তিনি তখনই এশিয়ায় নিরপেক্ষ-গোষ্ঠীর উদ্ভব এবং তার উপর চীনের প্রভাব দেখে ভবিষ্যতের বান্দুং সম্মেলনের আঁচ করেছিলেন।

লেনিনের শেষ দলিলে বিভিন্ন পার্টি-নেতার চরিত্র-বিশ্লেষণ ছিল ; স্তালিন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মতি গতি বিশ্লেষণ করে দেখালেন তাঁর শেষ রচনায়।

যে ত্রিশ বছর তিনি নেতৃত্ব করেছিলেন, তার মধ্যে দেশ এত দূর এগিয়ে গিয়েছিল।

স্তালিন ও স্তালিনের পরে

[১] —"নেতারা আসেন, যান ; মানুষ থেকে যায়। জন-সমাজই শুধু মৃত্যুহীন।"

—১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে, সোবিয়েতের ধাতুশিল্প-শ্রমিক-দের কাছে বক্তৃতা করতে গিয়ে স্তালিন এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিলেন। ১৯৫৩ সাল, ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ দিকে স্তালিন চলে গেলেন, জনসাধারণ রয়ে গেল। ইতিহাসে তাঁর স্থান স্থির করার দায়িত্ব তাদের হাতে।

মস্কোতে, মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে লাউড্-স্পীকার ঘিরে বরফের উপর দাঁড়িয়ে রইল। 'এসোসিয়েটেড্ প্রেস' একটা মেয়ের একটি মন্তব্যের খবর দিল।

> "বিস্তার বাদ দিয়ে স্তেপেস্ তৃণভূমির কল্পনা করতে পারে কেউ?
> জল বাদ দিয়ে ভল্‌গা নদীর কল্পনা করতে পারে কেউ ?
> স্তালিনকে বাদ দিয়ে রুশিয়ার ?"

এসোসিয়েটেড্ প্রেসের সংবাদ-দাতাটি তাঁর মোটরে বসে খবরটা শুনলেন, তাঁর মোটর চালকের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। সে বলল, "কিছু মনে করবেন না। উনি একজন মানুষের মত মানুষ ছিলেন··· সে বার তিনি রণাঙ্গনের কাছেই একটা কুঁড়েঘর থেকে মস্কোর যুদ্ধ চালনা করেছিলেন।" কিছুকাল পরে, সংবাদ এল যে পূর্বাঞ্চলের কোনো কয়েদী শিবিরে কয়েদীরা খুব ফুর্তি করেছে, চীৎকার করেছে যে 'বুড়োটা' মারা গিয়েছে, তাদের মুক্তি আসন্ন। স্তালিন রুশিয়ার

সমগ্র জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে নিয়েছিলেন, প্রায় ত্রিশবছর ধরে তার সকল কীর্তির এবং সকল অমঙ্গলের তিনি ছিলেন একটা অচ্ছেদ্য অংশ।

সারা দুনিয়ায়, বিভিন্ন জাতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি স্তালিনের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করে নিজেদের এক একটা বিশেষ শ্রেণীতে ফেলল। পিকিং-এর সংবাদপত্র স্তালিনের মৃত্যুর খবর ছাপল কাগজের চারপাশে কালো রেখা টেনে। প্রতিরক্ষা দপ্তরের আদেশে ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত হল; হেরিয়ৎ যখন 'যে নেতা নাৎসীদের কবল থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন' তাঁকে অভিবাদন করলেন, ফ্রান্সের জাতীয় সম্মেলনের সদস্যরা তখন দাঁড়িয়ে উঠে মৃতের প্রতি সম্মান জানালেন। ওয়াল স্ট্রীটে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যত ব্যাঙ্কের সদর দপ্তর আছে সেখানে) ফট্‌কা বাজারে 'ভাও' পড়ে গেল এক'শ কোটি ডলার; দু'দিন পরেই দর আবার উঠল। "পরিচিত লোকের মৃত্যুর সংবাদে আমি সব সময়েই দুঃখ পেয়ে থাকি"—এই কথা বলায় হ্যারি ট্রুম্যান নিজেই ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম তুললেন।

বহু আমেরিকানের মন্তব্যই এর চেয়েও অভব্য হয়েছিল। 'লস্ এঞ্জেলস্ টাইম্‌স্' বলে একটা কাগজে ধর্মের আতিশয্যে মন্তব্য করল, "স্তালিনের নরক যাওয়ার টিকিট ঠিকই আছে। ... জোর আমরা আশা করতে পারি, তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে ওদের নিজেদের মধ্যে একটা মারামারি।" মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার এই বর্বর সদিচ্ছাটাকে পূর্ণ রূপ দিলেন। সরকারীভাবে শোক প্রকাশ হল,—কাগজের মাথার দিকে ভাল করেই বলে দেওয়া হল যে শোক প্রকাশটা 'একান্তই রেওয়াজ-মাফিক' করা হয়েছে। তার পরেই খবর দেওয়া হল যে, সরকার "সোবিয়েতের পরিস্থিতিটার সুযোগ নেওয়ার জন্যে আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে প্রচারের সমস্ত যন্ত্রই ব্যবহার করা হবে; অধিকন্তু, রুশিয়ার মধ্যে বিবাদের উস্কানি দেওয়া হবে এবং সোবিয়েতকে তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলো* হতে

* ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, ৫ই মার্চ, ১৯৫৩

বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হবে।" সমস্ত কমিউনিস্ট দুনিয়া যখন স্তালিনের সম্মানে পাঁচ মিনিটের জন্যে মৌনব্রত অবলম্বন করছিল, কোরিয়ায় মার্কিন সৈন্যরা তখন তাদের কামানশ্রেণী থেকে একযোগে প্রচণ্ড গোলাবৃষ্টি শুরু করল।"

আমেরিকার প্রতিক্রিয়া দেখে পশ্চিম ইউরোপ মর্মাহত হল। ইউরোপকে নাৎসীদের উপর বিজয়ী করতে যাঁর অবদান সর্বাধিক, তাঁর জন্যে একটা মহান্ জাতির শোককে ইউরোপীয়রা, তাদের রাজনীতি যাই হোক না কেন, শ্রদ্ধার চোখে দেখল। আমেরিকার এই মনোভাবের সঙ্গে স্বতঃই ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের মৃত্যুতে মস্কোর মনোভাবের পার্থক্যটা মনে পড়ে। মলোটভ কালবিলম্ব না করে রাত দু'টোর সময় মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে, খোলাখুলিভাবে তাঁর শোক প্রকাশ করে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ওয়াল্টার বেডেল্ স্মিথকে অবাক করে দেন। এমনকি হোটেলের ওয়েটাররা আমিরিকানদের কাছে তাদের শোক-বিকল সমবেদনা দেখায়; যে ব্যক্তি, স্তালিনের মতন একটা বিশ্বদৃষ্টি নিয়ে স্থায়ী বিশ্বশান্তির সন্ধান করেছিলেন, সকলেই তাঁর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে। স্তালিনের মৃত্যু আমেরিকাকে একটা সুযোগ দিয়েছিল, ভদ্রতা দেখিয়ে পুরানো ক্ষত সারিয়ে দেবার। কিন্তু ওয়াশিংটনের আচরণে রুশিয়ার প্রতি তার অশুভ ইচ্ছাই প্রকাশ পেল।

যারা তাঁর জন্যে শোক করল এবং যারা তাঁকে অপমান করল— সকলকেই মানতে হল যে স্তালিনের একটা গুরুত্ব ছিল। 'লস্ এঞ্জেলস্ টাইম্‌স্' পত্রিকাও প্রয়োজনের তাগিদে কয়েকদিনই পাঁচপাতা ভরে স্তালিনের অসুখ এবং মৃত্যুর সম্পর্কে যত খুঁটিনাটি তথ্য প্রকাশ করল। ১৯২৪ সালে ওরা পাঁচ লাইনও লিখত না। আমি তা জানি, কারণ ১৯২৪ সালের এপ্রিলে, আমিই মার্কিন কাগজে স্তালিন সম্বন্ধে প্রথম প্রবন্ধ লিখি—'হার্স্‌ট্‌স্ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাগাজিনে'। সে প্রবন্ধে আমি লিখেছিলাম, "স্তালিনের কোনো সরকারী পদ নেই, তবে লেনিনের যদি কেউ উত্তরাধিকারী থাকেন তো তিনি স্তালিন।"

রুশ কমিউনিস্টরা এ কথা আমাকে বলেছিলেন। কথাগুলো আমেরিকায় কারো কানে যায়নি। এখন, ২৯ বছর পরে হাওয়ার্ড কে. স্মিথ ইউরোপ থেকে জানাচ্ছেন : "এ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্তালিন পৃথিবীর যত পরিবর্তন সাধন করেছেন, এমন আর কেউ নয়।" পৃথিবীর লোকের কাছে এইটাই তাঁর স্মৃতিলিপি হয়ে থাক।

রুশিয়াকে তিনি একটা বৃহৎ শক্তি হিসেবে, পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসেবে গড়েছিলেন। তা করতে গিয়ে, তিনি এশিয়ার উদীয়মান জাতীয় আন্দোলনগুলোকে, বিশেষতঃ চীনের আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে দেন, তাদের একটা আকার-লাভে সাহায্য করেন, পশ্চিমে 'কল্যাণ-রাষ্ট্রের' জন্যে আন্দোলনকেও ত্বরান্বিত করেন, রূপদান করেন। এইচ. কে. স্মিথ বলেছেন, "শ্রমিকের প্রতি পশ্চিমের সমস্ত মনোভাব বদলে দিয়েছেন তিনি।" কারণ, সরকারী পরিকল্পনার সর্বপ্রকার ধারণার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ ডীল' আর বৃটেনের 'কল্যাণ-রাষ্ট্রের' ধারণার উদ্ভব হয়েছিল, বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংকট যাতে বিপ্লবে পরিণত না হয় তার ব্যবস্থা করার জন্যে, রুশিয়ার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে।

দেখা যাচ্ছে, তাঁর স্বপক্ষে হোক বা বিপক্ষে হোক, সর্বদেশেই স্তালিন ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন।

এর পরে, স্তালিনের মৃত্যুতে তাদের শোকের কথা মনে করে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের লোকে ভাবল, তাদের মনে হচ্ছে ঐ শোকের সঙ্গে তাদের অন্তরে আর একটা বোধও জড়িত ছিল ; সে বোধ হচ্ছে এই যে, রুশিয়া তার জীবনের একটা যুগ শেষ করল, একটা নতুন যুগে প্রবেশ করল, যে যুগ হবে আগের থেকে অনেকখানি আলাদা ধরনের, বিশেষতঃ যে যুগে জীবন হবে 'বুড়ো কর্তা'র আমলের জীবনের তুলনায় বেশী মুক্ত। রুশদের সত্যিই এ বোধ মনে পড়ুক বা এখনকার চিন্তা অতীতের উপর আরোপিত হোক, যুগ-পরিবর্তনটা সত্য। একটা যুগের শেষ হয়েছিল ; স্তালিনকে সেই যুগের সঙ্গে যেতে হল। কাজ শেষ হলে ব্যক্তিরা চলে যান, তাঁদের মৃত্যুর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে লোক-

জীবন। মুসা তাঁর দিব্যচক্ষে 'প্রতিশ্রুত দেশ' দেখতে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে প্রবেশের অধিকার পাননি। স্তালিন ভবিষ্যৎ দেখলেন, কিন্তু সে ভবিষ্যৎকে চালনা করার শক্তি তাঁর হত না। তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তার বোঝা অতি ভারী হয়েই তাঁর উপর চেপেছিল।

আমার মনে হয় না, তাঁর শেষগ্রন্থ, 'সোবিয়েৎ ইউনিয়নে সমাজ-তন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা' পড়ে কেউ ভাবতে পারে যে, স্তালিনের বুদ্ধির মধ্যে এতটুকু বার্ধক্য দেখা দিয়েছিল। তাঁর বিশ্লেষণের খুঁটি-নাটির সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, এটা এমন এক-জনের ভবিষ্যৎ বাণী, যিনি সমস্ত পৃথিবীটাকে পরিষ্কার করে এবং সমগ্রভাবে দেখেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, তিনি যে যুগে 'এক দেশে সমাজতন্ত্র' গড়ে তুলেছেন, সে যুগের অন্ত হয়েছে ; সমাজতন্ত্র হয়ে উঠেছে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের মন্ত্র, এবং তার ফলে, সমস্ত প্রশ্ন ও উত্তরের রূপ বদলে গিয়েছে।

তাঁর বুদ্ধি এটা গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তাঁর বাকিটা এটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি। বার্ধক্যের জড়তা সকলকেই পঙ্গু করে, তাঁকেও করেছিল। তাঁর প্রখর বুদ্ধি দিয়ে তিনি আর এক ধরনের ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সংস্কার এবং অভ্যাসগুলো রয়ে গিয়েছিল 'ধনতন্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত' থাকার যুগে—যে যুগে আলাদা থাকা আর সন্দেহ করা ছিল তাঁর প্রথম রক্ষাকবচ। এ অভ্যাসগুলো পাকা হয়ে গিয়েছিল ; বয়স আর শক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্রমেই বেশী সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন, বেশী করে একনায়কত্বকামী হন, বেশী রকম বিশ্বাস করতে থাকেন যে, তাঁর কথার অনুমাত্র বিরোধিতা হচ্ছে প্রতিবিপ্লব। কেউ কেউ এটাকে হয়তো 'পারানিয়া'* নামক মানসিক রোগের লক্ষণ বলবেন। আমি মনে করি না, স্তালিনের এ বাতিককে 'পারানিয়া' বলা চলে। আমি বরং বলব, "হাতে শক্তি পেলে মানুষ

* নিজের মত সম্বন্ধে একরোখা বদ্ধ ধারণা, সন্দেহ বাতিক ইত্যাদির নাম 'পারানিয়া' (Paranoia)।—অনুবাদক

বিগড়ে যায় ; আমাদের সময়ে, সম্ভবতঃ যে কোনো কালে স্তালিনের মতো কেউ এত দীর্ঘকাল ধরে এত বেশী শক্তির অধিকারী হননি।” বুদ্ধি তীক্ষ্ণ থাকতে থাকতে, জাতির অগ্রগতি দেখতে দেখতে, যে চরিত্রের নমনীয়তা চলে গিয়েছে তার উপর নূতন যুগের নূতন কর্তব্যের ভার চাপার আগেই তাঁর যাবায় সময় এসে গিয়েছিল। লক্ষণগুলো ছিল ভীতিপ্রদ ;—ডাক্তারদের ষড়যন্ত্রের মত একটা উদ্ভট মামলা, আর স্তালিনের তাতে বিশ্বাস করার ব্যাপারটা দেখে মনে হয় ১৯৩৭ সালের পাগলামি যেন ফিরে আসছিল !

এই সমস্ত কারণে সোবিয়েতের লোকে তাদের নেতার জন্যে শোক করার সময়েও বুঝেছিল যে, এই নেতাকে ছাড়িয়ে একটা নূতন যুগে প্রবেশ করার সময় এসে গিয়েছে।

*　　　*　　　*

স্তালিন মারা যাওয়ার পর এক মাস পুরো হতে না হতে, যে শান্তি অভিযানকে দুনিয়ার লোকে মস্কোর বাঁধা-ধরা কাজ বলে মনে করতে শিখেছিল, সেটা এত বেশী বেড়ে গেল যে একাধিক মার্কিন সংবাদপত্রে তাকে ‘শান্তির ঝটিকা-অভিযান’ নাম দিল। মনে হল, যেন মস্কো আর পিকিং পশ্চিমের সঙ্গে তাদের ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে। ২২শে মার্চ তারিখে মস্কো বেতার কয়েকবারই বলল, “যেসব বিষয়ে এখনো মতবিরোধ আছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেগুলোর মীমাংসা হতে পারে।” ২৮শে মার্চ তারিখে মস্কো থেকে সোবিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র ব্যাপক বন্দী-মুক্তির কথা ঘোষণা করল। ২৯শে মার্চ তারিখে পিকিং সরকার বস্তুতঃ আমেরিকার শর্তেই কোরিয়ার রুগ্ন ও আহত বন্দীদের বিনিময় করার প্রস্তাব করল। তার দু’দিন পরে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত ভারতীয় পরিকল্পনার কাছাকাছি শর্তে চীন সমগ্র যুদ্ধ-বন্দী বিনিময় সমস্যার সমাধান করতে চাইল। তিন দিনের মধ্যে মার্কিন সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় তিনটি সংবাদ বেরুল—সে তিনটিতেই সোবিয়েতের সুর নরম হওয়ার পরিচয় পাওয়া গেল : “রুশরা নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে নরম

হচ্ছে", "মলোটভ কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতিতে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন," আর "জার্মানির প্রতি রুশিয়া শুভ ইচ্ছা জানাচ্ছে"—এই শেষের শিরোনাম (পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির মধ্যে) যাতায়াতের ব্যাপার নিয়ে যে মনকষাকষি দেখা দিয়েছিল, তার প্রশমনের খবর দিল। এই নরম সুরের চরম দেখা গেল ৪ঠা এপ্রিল তারিখের এক সংবাদে, "মস্কো ডাক্তার ন'জনকে মুক্তি দিয়েছে ; তাদের নিরপরাধ বলে ঘোষণা করেছে।"

ঐ সময় নাগাদ অন্ধ, কালা ও বোবা যারা, তারাও বুঝতে পারছিল যে মস্কোতে কিছু একটা ঘটছে। নইলে, কোন সরকার কবে মেনে নিয়েছে যে, "কয়েক মাস আগে আমরা অপরাধীদের স্বীকারোক্তি বলে যা ঘোষণা করেছিলাম, সেগুলো বানানো"? 'নিউজ-উইক' কাগজে মন্তব্য বেরুল : "ওয়াশিংটনের কেমন যেন মনে হচ্ছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সব চেয়ে অর্থপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে রুশদের শান্তি-অভিযান।"

১৯৫৩ সালের ৮ই আগস্ট তারিখে মস্কো ঘোষণা করল যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের হাইড্রোজেন বোমা আছে। আমেরিকার রেডিওগুলো ক্ষেপে উঠল ; ঘণ্টার পর ঘণ্টা বর্ণনা চলল রুশরা কিভাবে 'সম্ভবতঃ মেরুর উপর দিয়ে এসে', 'হয়তো কালই ভোরবেলা'য় আমাদের শহরগুলোকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক কর্তারা নিবর্তনমূলক যুদ্ধের কথা বললেন : "রুশিয়াকে আমরা হাইড্রোজেন বোমা জমা করতে দিতে পারি না", আর "রুশিয়ার অস্ত্রসজ্জা থামাবার জন্যে এই বছরের মধ্যেই আমাদের ব্যবস্থা করতে হবে।" মস্কো কিন্তু কোনো উত্তেজনা না দেখিয়ে ট্যাঙ্ক-কারখানাগুলোকে ট্র্যাক্টর কারখানায় পরিণত করল, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করল, আর ষষ্ঠ বারের মত লোকের ব্যবহার্য জিনিসপত্তরের দাম কমিয়ে দিল। ধনতান্ত্রিক জগতের কাছে রুশিয়ার এই প্রশান্ত ভাবটা হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও ভয়াবহ হল ; কারণ, রুশিয়ার প্রশান্তিটার মূলে ছিল

এই সত্য যে, মাথাপিছু ব্যবহার্য মাল উৎপাদনের ব্যাপারে রুশিয়া ইতালিকে ছাড়িয়ে গিয়ে ফ্রান্সের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল।*

১৯৫৪ সালেও শান্তি বিজয়ী হয়ে চলল; জেনেভা সম্মেলনে ইন্দোচীনের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল; সে সম্মেলনে চীন প্রতিনিধি হয়ে গেল; ডালেস সম্মেলন যাতে না বসে তার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। ঐ বছরের শেষ দিকে ওয়াশিংটনের যুদ্ধবাজ দল কয়েক ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করল; দুনিয়ার লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। আমেরিকার চাপে পড়ে ফরাসী ও ইতালিয় পার্লামেণ্ট জার্মানির পুনরস্ত্রসজ্জায় রাজী হল, যদিচ ইউরোপের অধিকাংশ লোক জার্মানির অস্ত্রধারণের সম্পর্কে ভয় পোষণ করত। 'ন্যাটো' (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা) ঘোষণা করল যে, তার ভবিষ্যৎ রণকৌশল গড়ে উঠবে আণবিক অস্ত্রসজ্জার উপর। সারা ইউরোপ দেখল, তার ফলে, যে পক্ষই জয়ী হোক, ভবিষ্যতের যে কোনো যুদ্ধেই ইউরোপ সাবাড় হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারকে চীনের বিরুদ্ধে তাঁর যে ধরনের খুশি যুদ্ধ করার নিরঙ্কুশ অধিকার দিল। একজন লোকের বিচারবুদ্ধির উপর পৃথিবী ধ্বংস করার শক্তি দেওয়া হল; মনে হল, পৃথিবী যেন তার শেষ যুদ্ধের দিকে ছুটে চলেছে।

এ সবের জবাবে, মস্কো তার 'বৃহত্তম শান্তি' অভিযান চালাল। সে অভিযান শুরু হল, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি-চুক্তিটা দ্রুত সম্পাদন করে,—পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে মতবিরোধ থাকায় দশ বছর এটা নিষ্পন্ন হয়নি। এপ্রিলের প্রথম দিকে অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলরকে মস্কোয় আমন্ত্রণ করা হল: এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি একটা সন্ধি-পত্র হাতে করে দেশে ফিরলেন। এ সন্ধিতে রুশিয়া এত বেশী ভালো শর্ত দিয়েছিল যে, ওয়াশিংটন বেকুব বনে গেলেও, ১৫ই মে তারিখে সমস্ত জাতিই তাতে স্বাক্ষর দিল। সোবিয়েতের প্রধান দাবি ছিল: পূর্ব-পশ্চিমের যে কোনো বিবাদে অস্ট্রিয়া নিরপেক্ষ থাকবে।

* নিউ স্টেট্‌সম্যান এ্যাণ্ড নেশন, ১৫ই আগস্ট, ১৯৫৩

অস্ট্রিয়ার লোকে খুশিমতে তাতে রাজী হয়ে গেল। ঐ মাসেই, মস্কো আর একটা 'নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব' দিল—এবারকার প্রস্তাবটা রচিত হয়েছিল আগেকার একটা ইঙ্গ-মাকিন প্রস্তাবের ভিত্তির উপর। প্রস্তাব ভেস্তে গেল ; ওয়াশিংটন তাতে রাজী হল না।

অস্ট্রিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেই রুশিয়া থেমে গেল না। প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন আর পার্টি-সম্পাদক খ্রুশ্চেভ বেলগ্রেডে গিয়ে টিটোর কাছে যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রীসূত্র ছিন্ন করার জন্যে একটু বাড়াবাড়ি করেই ক্ষমা চাইলেন। এ অসাধারণ হলেও আনন্দময় সম্ভ্রম-ত্যাগের ফলে, সোবিয়েৎ ইউনিয়ন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আর একটা নিরপেক্ষ রাষ্ট্র পেল ; উভয়ের বন্ধুত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পাবে বলে মনে হল। ১৯৫৫ সালের বসন্তের শেষ দিকে বেশ বোঝা গেল যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সীমান্তের সংঘর্ষ এড়াবার মতলবে মস্কো ইউরোপের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত একটা নিরপেক্ষ বেষ্টনী তৈরি করে নিচ্ছে। পুনরায় অস্ত্রসজ্জার দ্বারা নয়, পূর্বোক্ত ধরনের নিরপেক্ষতার দ্বারা 'জার্মান ঐক্য' প্রতিষ্ঠার জন্যে জার্মানির ভেতর থেকে চাপ বেড়ে গেল।

১৯৫৫ সালের ঐ এপ্রিল ও মে মাসে এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি জাতির প্রতিনিধিরা ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে পারস্পরিক সাহায্যের একটা কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথমবার, ১, ৪০০, ০০০, ০০০ মানুষের—পৃথিবীর অধিকাংশ অবনমিত মানুষের প্রতিনিধিরা মুখ খুলল। এখানে এল বৃহৎ নিরপেক্ষতাবাদী রাষ্ট্রগুলো—ভারত, ব্রহ্ম আর ইন্দোনেশিয়া ; এ তিনের উদ্যোগেই এই সম্মেলন আহূত হল। এখানে এল সামন্ততন্ত্রী আরব রাষ্ট্রগুলো, আফ্রিকার আরণ্য লোকেরা, শিল্প-সমুন্নত জাপান, আর এল ওয়াশিংটনের টাকা-খাওয়া কয়েকটা ক্ষুদে রাষ্ট্র—এই শেষোক্ত রাষ্ট্রগুলো এল কমিউনিস্টদের আক্রমণ করে সম্মেলনের মধ্যে একটা খটাখটি বাধিয়ে দিতে। আর এলেন

চীনের প্রধান মন্ত্রী—কমিউনিস্ট চাও এন্-লাই; তিনি কিছুতেই চটলেন না, বরং বললেন, "আমি তো ঝগড়া করতে আসিনি। আমি এখানে সমবেত সমস্ত জাতির সাফল্য দেখতে এসেছি।" তাঁর এবং ভারতের নেহরুর রাজনৈতিক বুদ্ধির প্রভাবে এই বিভিন্ন মত ও পথের জাতিগুলো এক বাক্যে রাজী হল যে, (১) তারা পরস্পরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, একে অন্যকে আর্থিক সাহায্য দেবে; (২) পরস্পর সংবাদ ও ছাত্র বিনিময় করবে; (৩) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যে পৃথিবীর সকল জাতিই যাতে সদস্যপদ পায় তার জন্যে চেষ্টা করবে; (৪) আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার উৎপাদন, পরীক্ষা বা ব্যবহারের বিরোধিতা করবে।

সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে বান্দুং-এ আমন্ত্রণ করা হয়নি—সেটা ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার ব্যাপার। কিন্তু সোবিয়েৎ প্রধানরা টিটোর সঙ্গে দেখা করার পর বিমানে ভারত, ব্রহ্ম ও আফগানিস্তানে গেলেন। এ তিন দেশেই তাঁদের ভালো করে অভ্যর্থনা করা হল। তাঁদের দেখবার জন্যে কলকাতায় যত ভীড় জমেছিল, গান্ধীর 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার' সময়ও (গান্ধীর শেষকৃত্য হয়েছিল দিল্লীতে) এত ভীড় দেখা যায়নি। ভারতীয়রা রুশদের অনাড়ম্বরতা দেখে খুব খুশী হয়েছিল। বুলগানিন যখন মালার বোঝা বেশী হয়ে যাওয়ায়, কয়েকটা মালা ভারতীয়দের গলায় পরিয়ে দিলেন, ভারতীয়দের সেটা ভালো লাগল। খ্রুশ্চেভ যখন একটা চাষীর কাস্তে নিয়ে দেখালেন যে তিনিও কাস্তে চালাতে জানেন, তাদের তা ভালো লাগল। ভারতীয়দের সব চেয়ে বেশী ভালো লাগল, যখন এই মহামান্য বিদেশীরা গান্ধী টুপি পরলেন, ভারতীয় রীতিতে হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার জানালেন—পশ্চিমী ঢঙ-এ করমর্দন করলেন না। তারা ভাবতে লাগল, "কোনো পশ্চিমী কেন এর আগে এ সব করেনি?" উত্তর পরিষ্কার বোধ হল। কোনো পশ্চিমী কখনো ভারতীয়দের তার সমকক্ষ বলে মনে করেনি, ভারতীয়দের দেশে এসে শিষ্টাচারের খাতিরেও তাদের রীতিনীতি অনুকরণ করেনি। রুশরা যেন এ সব খুব স্বাভাবিক ভাবেই করল।

রুশনেতাদের এই ভ্রমণের ফলে বিবিধ বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হল ; নেহরু এবং রুশ প্রধানরা একটা যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করলেন। সে বিবৃতিতে বলা হল ; সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে চীনকে তার 'ন্যায়সঙ্গত স্থান' দেওয়া উচিত, 'ফরমোসার' উপর চীনের দাবি ন্যায্য ; 'বিনাশর্তে' আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। সে বিবৃতিতে ঘোষিত হল যে, "সামরিক জোট-বন্ধনের পথে শান্তি আসবে না, আসবে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেনের পথে।" বান্দুং ঘোষণার পর এই বিবৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ায় মানব জাতির দুই-তৃতীয়াংশেরই যে এই মত, সেটা কাগজে কলমে পাকা হয়ে গেল।

এই নীতিগুলোর প্রচার এত প্রবল হল যে, সেবার বসন্তকালে বৃটেনের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান বিবেচ্য বিষয়ই হয়ে গেল ; "আণবিক যুদ্ধ থেকে আমাদের দূরে রাখার জন্যে ইডেন কি তাঁর যথাকর্তব্য করেছেন ?" ইডেনকে নির্বাচনে জয়ী করার জন্যে এবং আইসেনহাওয়ারের কাছে চিঠির স্রোত আসতে লাগায়, ওয়াশিংটন দশ বছর ধরে যে উচ্চপর্যায়ের চতুঃশক্তি আলোচনায় রাজী হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্র তাতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হল। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে জেনেভায় এই আলোচনা সভা বসবে বলে স্থির হল।

তার আগে জুন মাসের শেষ দিকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে তার দশম জন্মোৎসবের অধিবেশন ডাকল। জন্মোৎসবটা মামুলী ধরনে পালন করার পরিকল্পনা থাকলেও, তিনটি বিশেষ কারণে এটা একটা বিশ্ব-শান্তি সমাবেশে পরিণত হল। (১) এই আণবিক যুগে প্রাণে বাঁচার জন্যে বিশ্বের সমস্ত লোকের দাবি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেও এসে পড়ল। (২) বান্দুং সম্মেলনের অন্তর্গত সদস্য-দেশের সংখ্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের চেয়েও বেশী, তা সত্ত্বেও ঐ সম্মেলন 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের' মাধ্যমে তার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির চেষ্টা করছিল। (৩) সোবিয়েৎ ইউনিয়ন এই অধিবেশনে ৮০ জন প্রতিনিধি সহ তার বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী মলোটভকে পাঠালে। মস্কোকে এই অধিবেশনের উপর এত গুরুত্ব দিতে দেখে

যুক্তরাষ্ট্র সরকারও এর উপর গুরুত্ব দিল। ডালেস এবং আইসেন-হাওয়ার দু'জনেই গেলেন; এই সব প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের উপস্থিতির ফলে জেনেভার কার্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা হল।

এতকাল সংবাদপত্রগুলো জোর দিয়েই বলে আসছিল যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সঙ্গে বৃহৎ চারপ্রধানের সম্মেলনের কোনো যোগ নেই; হঠাৎ তারা লক্ষ্য করল যে, জাতিপুঞ্জের সভায় সমস্ত বক্তৃতার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে, সারা পৃথিবীর আশা ও প্রার্থনা জমে উঠেছে জেনেভায় আসন্ন উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনকে ঘিরে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটা প্রবৃত্তি ওয়াশিংটনের মধ্যে ছিল। এবার কিন্তু পাশ কাটানো সম্ভব হল না। জেনেভার সভার জন্যে পদ্ধতি তৈরীর ভার দেওয়া হল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হাতে। জাতিপুঞ্জের মর্যাদা চরমে উঠল; তার নিজের কোনো কৃতিত্বের ফলে নয়; মলোটভ আর বান্দুং সম্মেলনের জাতিগুলোর মধ্যে দিয়ে ধ্বনিত বিশ্বের আশ।র বলে।

শেষ পর্যন্ত জুলাই মাসের শেষদিকে জেনেভায় বৃহৎ প্রধানরা মিলিত হলেন—দশবছর পরে এই প্রথমবার। আইসেনহাওয়ার আর বুলগানিনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হওয়ায় দুনিয়ার লোকে আশান্বিত হয়ে উঠল। 'জার্নাল দ্য জেনেভা' পত্র উল্ল[illegible] হয়ে লিখল: "ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সমাধি দেওয়া হল;" 'নেশন' পত্রে দেল্ ভায়োও লিখলেন, "ঠাণ্ডা লড়াই মারাত্মক আঘাত পেল।"

ডালেস এক সংবাদ-দাতাকে এই সম্মেলন সম্বন্ধে সংক্ষেপে বললেন: "আমরা বিশেষ কিছু ছেড়ে দিইনি।" বুলগানিন সোবিয়েৎ কংগ্রেসে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখিয়ে বললেন, "এর ফলে আন্তর্জাতিক মন কষাকষি কমেছে···পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক একটা মোড় ফিরেছে।" কলম্বিয়ার বেতার ঘাঁটি [illegible]াসল তথ্যটি ফাঁস করে দিল: "জেনেভায় কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি···কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার উদ্দেশ্যও এর কখনো ছিল না। ওঁরা শুধু মিটমাট করে ফেলার জন্যে চেষ্টা করার বিষয়ে একমত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও, এ থেকে ইতিহাসের

একটা নতুন যুগের সূচনা হতে পারে।" সম্মেলন সম্পর্কে এই সকল মন্তব্যই সত্য। দু' পক্ষের কেউই "কিছু ছেড়ে দেয়নি।" কিন্তু উভয় পক্ষই বহুকাল পরে এই প্রথম ভদ্রভাবে তাদের নীতি নিয়ে আলোচনা করল। দু' পক্ষই খোলাখুলি স্বীকার করল, আণবিক যুদ্ধের দ্বারা তাদের নীতির জয় হবার নয়—আণবিক যুদ্ধ হলে দু'টি জাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। সুতরাং উভয় পক্ষই অন্ততঃ তখনকার মতো, অন্য কোনো উপায়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টা করা সম্পর্কে একমত হল।

ঠাণ্ডা লড়াই শেষ হল। এর মূলে ছিল আমেরিকার হাতে আণবিক বোমার একচেটিয়া অধিকার; এ লড়াইয়ের শুরু হয়েছিল হিরোশিমার উপর আণবিক বোমা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সোবিয়েৎ ইউনিয়নের অর্থনৈতিক শক্তি বাড়তে থাকায়, সোবিয়েৎ ইউনিয়নও আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করায়, সোবিয়েতের মিত্রশক্তিরূপে নতুন চীনের উদ্ভব হওয়ায় এবং এশিয়ায় একটা নিরপেক্ষ শক্তি-জোট গড়ে ওঠায়, দীর্ঘ দশ বছর পরে এই ঠাণ্ডা যুদ্ধের শেষ হল। আণবিক শক্তিতে কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়, উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় এ কথা স্বীকৃত হওয়ায় ঠাণ্ডা লড়াইএর অস্ত্রটাই অকেজো হয়ে গেল।

মস্কো ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে তার বিশ্বাস ঘোষণা করল, ফিনল্যাণ্ডকে পোরখালা নৌঘাঁটি ফেরৎ দিয়ে,—ফেরৎ দেওয়ার কারণ দেখাল, রুশিয়ার প্রতিরক্ষার জন্যে ওটা দখল করে রাখার আর দরকার নেই; তার সৈন্য বাহিনী থেকে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য কমিয়ে দিয়ে। ১৯৫৬ সালে মস্কো আরো ১২ লক্ষ সৈন্য কমিয়ে দিল। ওয়াশিংটন এরকম কোনো ঘোষণা করল না বটে, কিন্তু তার পোষা 'ন্যাটো' এবং 'সিয়াটো' (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা) ভেতর থেকেই শুকোতে লাগল। সর্বত্র এটা স্বীকৃত হতে লাগল যে, সামরিক প্রতিযোগিতা নয়, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাই হয়ে উঠছে নতুন কালের নতুন নিয়ম।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে ইতিহাসের এই নূতন যুগের মূল্য নির্ণয় করা হল। খ্রুশ্চেভের মূলগত রিপোর্টে সোবিয়েতের নানা সিদ্ধির একটা চমকপ্রদ সংকলন পাওয়া গেল। পাঁচ বছরে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন শতকরা ৮৫ ভাগ বেড়ে গিয়েছে; ১৯২৮ সালে স্তালিন যখন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন তখনকার তুলনায় এখন উৎপাদন বেড়েছে বিশগুণ। চাষের অবস্থা তত সন্তোষজনক হয়নি; কৃষি উৎপাদনে যা ঘাটতি ছিল, কাজাকস্তান আর সাইবেরিয়ার পতিত জমিতে দেশপ্রেমীদের চাষ করতে বলায় সেটা পূরণ করা হয়েছে। লেনিনের আমল থেকেই দেশের সর্বসাধারণের সম্পদ বিকশিত করার জন্যে স্বেচ্ছাসৈনিকদের ডাক দেওয়া হচ্ছে। এ রকম ডাকে এখনো সাড়া পাওয়া যায়।

সংবাদ-দাতারা লক্ষ্য করলেন যে, খ্রুশ্চেভ এমন ভাবে কথা বললেন, যেন সাম্যবাদ "ইতিহাসের একটা নিয়ম" বলে স্বীকৃত হয়েছে। সোবিয়েৎ নেতাদের ধনিকতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যে কোনো আগ্রহ দেখা গেল না, তাঁদের দৃষ্টিতে ধনিকতন্ত্র এমনিতেই নষ্ট হতে চলেছে। তাঁদের ভাবনা, কি করে দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নত করে, শান্তিকে নিরাপদ করার জন্যে সারা পৃথিবীকে মৈত্রী-সূত্রে গেঁ... সমাজতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার করণীয়ের মধ্যে ধরা হলঃ মজুরদের জন্যে তাদের আসল মজুরির শতকরা ত্রিশভাগ বৃদ্ধি করা; তাদের কাজের সময় কমিয়ে দৈনিক ৭ ঘণ্টা অর্থাৎ সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা করা; শুধু প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, উচ্চতর বিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদের জন্যে বিনা শুল্কে শিক্ষালাভের সুযোগ দেওয়া। শাসন-ব্যবস্থা কতকটা বিকেন্দ্রিত করা হবে। এর আগেই আজারবাইজানের বিরাট পেট্রোল শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগের মালিকানা দেওয়া হয়েছিল আজারবাইজানের স্থানীয় সরকারের হাতে,—বাকিটা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। সব চেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে, এবারকার পরিকল্পনায় রাজনৈতিক

পুলিসের শক্তি খর্ব করে ক্রমেই লোকের নাগরিক স্বাধীনতা প্রসারিত করার ব্যবস্থা হল।

নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির সম্পর্কে এই কংগ্রেসের মতটা পৃথিবীর পক্ষে সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। ঘোষণা করা হল যে, 'এক দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের' যুগ শেষ হয়েছে; এখন পৃথিবীতে অনেকগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—মানব-জাতির এক-তৃতীয়াংশ এখন সমাজতন্ত্রের আওতায় এসেছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র-জোটের সঙ্গে এই সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র-গোষ্ঠীর বন্ধুত্বের ফলে, একটা 'শান্তি এলাকা' গঠিত হতে পারে,—তার মধ্যে পড়বে পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ, পৃথিবীতে শান্তি রক্ষা করার মত শক্তি তাদের আছে। ঘোষণা করা হল, এই সব কারণে "যুদ্ধ আর অনিবার্য নয়।" মার্ক্সবাদের একটা মৌলিক নীতি হচ্ছেঃ ধনিকতন্ত্রে অনিবার্যভাবে যুদ্ধ ঘটে থাকে। সে নীতিটা এর দ্বারা অস্বীকার হল না; সে নীতিটাকে সংশোধন করে বলা হল, অ-ধনিকতন্ত্রী জগৎ যদি বুঝে সুঝে, অবস্থা মত চাল বদল করে তার শক্তি প্রয়োগ করতে পারে, তবে তার এখন এমন শক্তি হয়েছে যে, সে যুদ্ধ নিবারণ করতে পারবে।

বলা হল, ধনিকতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে রূপান্তর সর্বত্রই যে রুশিয়ার ধারায় ঘটবে, এমন কোনো কথা নেই। প্রত্যেক জাতিই তার নিজস্ব ধারায় সমাজতন্ত্রে পৌঁছবে; কোনো কোনো দেশ পার্লামেন্টের পথেও সমাজতন্ত্রে পৌঁছতে পারে। সমাজতন্ত্র যে শ্রমিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটা অস্বীকার না করেও বলা হল যে, এখন তার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের শক্তি বেড়ে যাওয়ায় নতুন নতুন পথ সম্ভব হয়েছে। যা আগেই ঘটেছে, এখানে তাই সূত্রাকারে বলা হল। নতুন সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর কোনোটিতেই রুশিয়ার মতো, শ্রমিকদের বিদ্রোহ করতে হয়নি। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্র এসেছে সর্বদলের মিশ্র সরকারের মাধ্যমে। চীনেও, কমিউনিস্টরা চিয়াং কাই-শেকের সরকারে যোগ দিয়েছিল, আর চিয়াং কাই-শেক যখন সে যোগ ছিন্ন করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু

করলেন, তখন কমিউনিস্টরা চিয়াং-বিরোধীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জয়লাভ করল ; এই চিয়াং-বিরোধীদের মধ্যে বহু চীনা ধনিকও ছিল।

এই সব পরিবর্তন স্বীকার করতে গিয়ে স্বীকার করতে হল যে, 'স্তালিন যুগ' শেষ হয়েছে ; স্তালিনের যে মতবাদ বেদবাক্য ছিল, তা এখন আর খাটে না ; এখন নতুন রণকৌশলের, নতুন পথের সময় এসে গিয়েছে। এই সত্যটা মানতে গিয়ে অতীত যুগটার বিশ্লেষণ ও সমালোচনা করতে হল ; কংগ্রেসের অনেক বক্তাই তাতে যোগ দিলেন।

অধিকাংশ সমালোচনাই ছিল সংযত, দরকারি। সমালোচনায় বলা হল, স্তালিন যুগে বৈদেশিক নীতি অতি বেশী কড়া ছিল, 'এক ঘরো' ভাবের ছিল। যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে ভুল করা হয়েছিল। নিরপেক্ষ জাতিগুলোর ভূমিকা ঠিক মত আদৃত হয়নি। কোনো কোনো বক্তা স্তালিনের যুদ্ধ-চালনার বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন। সবচেয়ে খুঁটিনাটিভাবে সমালোচনা করা হল, স্তালিনের আমলে রাজনৈতিক পুলিসের ইচ্ছামত চলার অধিকার সম্পর্কে। সে পুলিস হাজার হাজার নিরীহ নির্দোষ লোককে শাস্তি দিয়েছিল, সোবিয়েৎ নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করেছিল। এই সমস্ত অশুভের জন্যে দায়ী করা হল 'ব্যক্তিপূজার রীতি'কে, অর্থাৎ বলা হল, লোকে স্তালিনকে দেবতা বানিয়ে ফেলাতে স্তালিনের একক ভাবে দেওয়া সিদ্ধান্ত একেবারে অপ্রতিহত হয়ে পড়েছিল—বিশেষ করে তাঁর জীবনের শেষ দিকটায়।

এ পর্যন্ত সমালোচনা বিস্ময়কর হলেও চাঞ্চল্যকর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কংগ্রেসের শেষ দিকে খ্রুশ্চেভ কেবলমাত্র প্রতিনিধিদের কাছে একটা বক্তৃতা করলেন—তার কোনো অনুলিপি রাখা হয়নি। সংবাদ-পত্রে এ বক্তৃতা প্রকাশের জন্যে দেওয়া হয়নি ; খ্রুশ্চেভ নিজেই বলেছিলেন এ বক্তৃতা যেন কাগজে না ওঠে। বিগত তিন বছর ধরে যে হাজার হাজার অন্যায় মামলার পুনর্বিচার হচ্ছিল, কিছুকাল আগে সেগুলো পড়ার ফলেই সম্ভবতঃ খ্রুশ্চেভ এই বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন ; এ

.বক্তৃতায় তাঁর হৃদয়াবেগ স্পষ্টতঃ ফেটে পড়েছিল। কয়েক মাস পরে, মার্কিন সরকারের বৈদেশিক দপ্তর থেকে সেই অনুলিপিহীন বক্তৃতার একটা অংশ 'সাচ্চা মাল' বলে প্রকাশ করা হয়েছে। সেটা সাচ্চা হলেও হতে পারে। সোবিয়েৎ সরকার খ্রুশ্চেভের এ বক্তৃতা অস্বীকার করেনি, সরকারীভাবে স্বীকার করেও নেয়নি। তা থেকে এটা ধরে নেওয়া যায় যে, বক্তৃতায় এত বেশী সত্য ঘটনা ছিল যে, তা অস্বীকার করা যেত না; অথচ এর মধ্যে এতখানা মাত্রাজ্ঞানের অভাব ছিল যে এটাকে সরকারী বিবৃতি হিসেবে স্বীকার করতেও পারেনি।

এই বইয়ে আমি স্তালিন যুগের অশুভ দিকটার বিবরণী হিসেবে আগা গোড়াই খ্রুশ্চেভের অনুলিপিহীন বক্তৃতাটা ব্যবহার করেছি এবং তাতে বর্ণিত অন্যায়গুলোকে আমি তাদের উপযুক্ত পটভূমিতে স্থাপন করে বিচার করেছি। আমি অবশ্য ওর সব কথাকেই পুরোপুরি প্রামাণিক বলে ধরে নেইনি, কারণ, সব সাক্ষ্য হাজির করা হয়নি, সময় ও অবস্থার মধ্যে স্থাপন করে সে সব সাক্ষ্যের মূল্য বিচারও করা হয়নি। যে সব বাড়াবাড়ির জন্যে খ্রুশ্চেভ স্তালিনকে আভাসে ইঙ্গিতে দায়ী করেছেন, তার সবেরই সংবাদ স্তালিন জানতেন কি না, সেটা পর্যন্ত পরিষ্কার বোঝা-যায় না; তা ছাড়া, এটাও ভুললে চলবে না যে, মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর এ দলিলটা প্রকাশ করেছে সোবিয়েৎ ইউনিয়নকে বেইজ্জৎ করার উদ্দেশ্যে; এ দলিলটা বেশ ব্যাপকভাবেই তার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। আমি এটাকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের শেষ বক্তব্য বলে গ্রহণ করতে পারি না; কারণ, সোবিয়েৎ সরকার বা খ্রুশ্চেভ এটাকে স্বীয় বক্তব্য বলে প্রচার করেননি।

স্তালিন যুগ সম্পর্কে কোনো মতই এখন শেষকথা বলে নেওয়া যায় না। স্তালিন হচ্ছেন তাঁদের একজন, যাঁদের বিচার চলে দীর্ঘকালের ইতিহাসে ও যাঁদের কাজের ধারা যতই দূরে থেকে দেখা যায় ততই বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা অন্ততঃ যা জানি তা হচ্ছে এই যে, ১৯২৮ সালে এক দেশে, একটা শত্রু-পরিবৃত অনুন্নত চাষী দেশে, তিনি সমাজতন্ত্র গড়তে অগ্রসর হন। তিনি যখন আরম্ভ করেন, রুশিয়া

তখন ছিল চাষী-প্রধান, নিরক্ষর ; তিনি যখন শেষ করেন, রুশিয়া হয়ে ওঠে পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় শিল্পোন্নত শক্তি। দু'বার তিনি দেশটাকে এই ভাবে গড়ে তোলেন ; প্রথমবার হিটলারের আক্রমণের পূর্বে, দ্বিতীয়-বার, যুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের উপরে। তাঁর এ কৃতিত্ব চিরকালের জন্যে ইতিহাসে রয়ে যাবে ; এ গড়ার কাজে স্তালিনই ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার।

এই গড়ার কাজ তিনি চালনা করেছিলেন নিষ্ঠুর ভাবে ; কারণ, তিনি জন্মেছিলেন একটা নিষ্ঠুর দেশে, আর শৈশব থেকে তাঁকে নিষ্ঠুরতাই সইতে হয়েছিল। এ গড়ার কাজ তিনি চালিয়েছিলেন সন্দিগ্ধভাবে ; কারণ, পাঁচ পাঁচবার তাঁকে নির্বাসনে যেতে হয়েছিল ; নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তাঁকে ধরিয়েও দেওয়া হয়েছিল। নিরীহ লোকদের উপর রাজনৈতিক পুলিসরা জঘন্য অত্যাচার করলে তিনি উপেক্ষা, এমনকি সমর্থনও করেছিলেন, কিন্তু এযাবৎ কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, তিনি জেনে শুনে ঐসব জঘন্য অত্যাচার উদ্ভাবন করেছিলেন ; অত্যাচারগুলো সম্ভবতঃ ঘটেছে কয়েকটা জটিল কারণে ; তার মধ্যে পড়ে স্তালিনের সন্দেহ করার প্রবৃত্তি এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির স্তালিনের সব কথাতেই হুঁ দেওয়ার প্রবৃত্তি। ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ সব অন্যায় করে থাকলেও, স্তালিন যখন বলতেন যে লোকরাই হচ্ছে যে কোনো জাতির সব চেয়ে মূল্যবান উপাদান, তখন তিনি যে ভণ্ডামি করতেন না—তার প্রমাণের অভাব নেই। তাঁর দিন কাটত শ্রমিকদের, চাষীদের, ইঞ্জিনিয়ারদের সব রকম সঙ্গত কামনার পথ থেকে সযত্নে সর্বপ্রকার বাধা সরিয়ে দেওয়ার কাজে ; তাঁর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে, জীবনে তারা ব্যর্থমনোরথ হত, অখ্যাত থেকে যেত ; তিনি বুঝতেন বলেই তারা কৃষি, শিল্প বা বিমান-চালনার ক্ষেত্রে এক একজন নেতা হয়ে উঠতে পেরেছিল।

লড়াই যত ঘনিয়ে এল, বয়স যত বেশী হল, শক্তি যত বাড়ল, পৃথিবীর ভবিষ্যৎকে নিয়ে যে দ্বন্দ্ব, সে দ্বন্দ্বের শ্রান্তি যত বৃদ্ধি পেল, স্তালিন না কি ততই স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছিলেন, ততই একমাত্র নিজের উপর নির্ভর করেছিলেন। তবু, যে ব্যক্তিত্বের পূজার ঘাড়ে অতীতের

সব অশুভের দায়িত্ব চাপানো হচ্ছে, সেটা তো শুধু পূজিতের দোষ নয়, পূজকেরও দোষ। স্তালিনের বিরুদ্ধে যত কথাই বলা হোক না কেন, ১৯২৮ সাল থেকে সোবিয়েৎ ইউনিয়নের উপর তিনি যে ভীষণ তাড়া লাগিয়েছিলেন, সেটা না লাগালে রুশিয়ায় সমাজতন্ত্র আদৌ গড়া যেত কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অতীতের দিকে চেয়ে দেখি, অন্য নেতারা—ট্রট্স্কী, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন্ প্রভৃতি দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার মনে হয়, এঁদের কারো মধ্যে লোকের দাবি সম্বন্ধে স্তালিনের মত অন্তর্দৃষ্টি ছিল না ; সে দাবি পূরণ করার মত বুকের পাটা, ইচ্ছাশক্তি, স্তালিনের মত এঁদের মধ্যে ছিল না।

প্রথম দিকের কয়েক বছর, রুশিয়ার ও রুশিয়ার বাইরের বড় বড় মার্ক্স্‌বাদীরা বলেছিলেন, ও-কাজ করা যাবে না। তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে রুশরা আমাকে বলেছে ; "আমাদের এই অজ্ঞ দেশে প্রথম সমাজতন্ত্র গড়তে হচ্ছে, ছুনিয়ার পক্ষে এটা লজ্জার কথা। তোমরা আমেরিকানরা যদি এটা করতে, কিংবা ঐ পরিশ্রমী জার্মানরা,—তা হলেই ঠিক হত। আমরা—অজ্ঞ জাতির লোকেরা—কোন্ সমাজতন্ত্র গড়তে পারব ?"

স্তালিন বললেন, "হয় গড়ো, নয়তো বিদেশী আক্রমণকারীরা দশ বছরের মধ্যে তোমাদের পায়ে চট্কাবে।"

লোকে গড়ল ; বৈদেশিক আক্রমণ যখন এল, তখন সমাজতন্ত্রী রুশিয়া ভেঙে পড়ল না। দেখা যাচ্ছে, স্তালিন ঠিক কথাই বলেছিলেন ; যারা রুশিয়ার শক্তিতে বিশ্বাস করত না তারাও ভুল করেনি। কারণ, রুশিয়ায় যে সমাজতন্ত্র গড়া হল, সেটা, যে সমাজ-তন্ত্রের স্বপ্ন লোকে দেখে এসেছে, যে সমাজতন্ত্রে সকল লোকেরই জন্যে প্রাচুর্য ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে, ঠিক সে সমাজতন্ত্র হল না ; তাতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব, রুশিয়ার অন্ধকারময় অতীত, নাৎসী পঞ্চমবাহিনীর কার্যকলাপ, আর চল্লিশ বছর ধরে যুদ্ধের আতঙ্ক—এগুলোর কোনটি এ ত্রুটির জন্যে কতখানি দায়ী সে

বিচার করবে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক। তারা এ দায়িত্ব ভাগ করতে গিয়ে আদৌ একমত হবে না, এটা নিশ্চিত।

একটা বিষয়ে তাদের মতভেদ থাকবে না। ঘটনার পরিচালককে যদি তার কর্তা বলা চলে, তবে লেনিন করেছিলেন রুশিয়ার বিপ্লবটা ; স্তালিন গড়েছেন পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশ। গড়ায় কোনো খুঁৎ থাকলে এখন তা শোধরাতে পারা যাবে।

* * *

সোবিয়েৎ ইউনিয়নের ভুল ত্রুটি সংশোধন করাটাই কোনো বড় সমস্যা নয় ; সেখানকার উদ্বুদ্ধ জনসাধারণ এবং মোটামুটি বুদ্ধিমান ও সৎ-সরকারী কর্মচারীরা সেটা করে নিতে পারবে। তার জন্যে সাংবিধানিক কাঠামো আছে, সম্পদ আছে ; লোকের ইচ্ছে আছে। পূর্ব ইউরোপ সোবিয়েৎ-গোষ্ঠীর মধ্যে স্তালিন যেসব গলদ রেখে গিয়েছেন সেগুলো গুরুতর। ইদানীং সংবাদপত্রের মাথা জুড়ে যখন সংবাদ বেরুচ্ছিল, 'পোলাণ্ডে বিদ্রোহ', 'হাঙ্গেরিতে গৃহযুদ্ধ', আমাদের পশ্চিমী পণ্ডিতরা তখন 'মস্কোর কর্তৃত্বের অবসান' দেখে খুশী হয়ে উঠেছিলেন। ওয়ারশ ও বুদাপেস্তের সরকাররা তাদের খুশীর জবাবে জানালেন যে, সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব অচ্ছেদ্য, তারা শুধু চায় 'সার্বভৌম শক্তি' ও 'সম মর্যাদা'। এ শব্দ দু'টোর অর্থ কি? এর জন্যে তারা বহুকাল অপেক্ষা করেছে—দেরি হয়ে গিয়েছে এখন।

আজকের দুনিয়ায় 'সার্বভৌম শক্তি' আছে কোন্ জাতির? পোলাণ্ডের মত একটা ছোট দেশ, বিশ কোটি লোকের বাসভূমি এবং পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ দেশ সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিতর্কে কোন্ সমতা দাবি করতে পারে? শব্দগুলোর সংজ্ঞা বুঝে নেওয়া দরকার। ইতিহাসে এগুলোর সংজ্ঞা বহুবার নির্দিষ্ট হয়েছে। সর্বদা নতুন পরিস্থিতিতে সে সংজ্ঞা পুনর্নিধারণ করতে হবে।

বর্তমানে এর সংজ্ঞা স্থির করতে হবে **সমাজতান্ত্রিক** অর্থে। সেটা যদি না করা হয় এবং দ্রুত না করা হয়, 'বন্ধুত্বের' সব কথাই নিঃসার শোনাবে। জাতির সঙ্গে জাতির বন্ধুত্বে পরিবর্তন ঘটে, মিত্রশক্তিরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গত দশ বছরের দিকে চেয়ে একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে ?

১৯৪৫ সাল থেকেই এ কাজ অপেক্ষা করছে, বিশেষ করে ১৯৫০ সাল থেকে ; স্তালিন মারা যাওয়ার পর এ কাজ জরুরী হয়ে ওঠে। স্তালিন এ সমস্যার সমাধান করেননি ; 'এক দেশে সমাজতন্ত্রের' চিন্তাতে তাঁর মন অতি বেশী অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল—মানব-জাতির এক-তৃতীয়াংশের সমাজতন্ত্রের ভিত্তির উপর তাঁর মন সক্রিয় হতে পারেনি। খ্রুশ্চেভ এটার সমাধান করেননি; আপাততঃ সমস্যাটা তিনি আরো জটিল করে ফেলেছেন। টিটোর কাছে তাঁর ক্ষমাভিক্ষা এবং স্তালিনের উপর তাঁর আক্রমণের ফলে পূর্ব ইউরোপে বিভেদকামী প্রবৃত্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়েছে। এ প্রবৃত্তিগুলো প্রবল ; কিন্তু সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবন্ধনের অনুকূল প্রবৃত্তিগুলোও দুর্বল নয়। বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে যে আকারে ঐক্যবন্ধন সম্ভব, সেটা এখনো উদ্ভাবিত হয়নি।

একটা কাহিনী দিয়ে কথাটা বোঝাবার চেষ্টা করা যাক। দশ বছর আগে আমার সঙ্গে একজন চেক্-এর দেখা হয়েছিল ; তিনি এসেছিলেন সোবিয়েৎ ইউনিয়নের সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক চুক্তি করতে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমেরিকানরা যে বলে মস্কো পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, সেটা কতখানি সত্যি। উত্তরে তিনি বললেন, "আমরা যখন সোবিয়েৎ শিল্প-কারখানা-গুলোর প্রধানদের সঙ্গে আলাপ করি, তাঁরা দামদস্তুর করতে বসেন, আমরাও দরাদরি করি। তাঁরা দরাদরিতে বেশ পাকা। কিন্তু তাঁরা বেশী চাপ দিলে আমাদের গটওয়াল্‌ড্ স্তালিনের কাছে গিয়ে একটা 'রাজনৈতিক মীমাংসা'র কথা পাড়েন, বলেন, "এ রকম শর্তে আমরা মারা পড়ব।" ...স্তালিন তখন আমাদের সাহায্য দেন।

এই যে স্তালিন ব্যক্তিগতভাবে গটওয়াল্ড্‌কে বিশেষ সুবিধা দিতেন, এটা দিয়ে তো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্থান পূরণ করা যায় না! সোবিয়েৎ ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় রেলপথ আর কয়লাখনিগুলোর মধ্যে কয়লার দর নিয়ে ঝগড়া আছে। সে ঝগড়া মেটানোর জন্যে আছে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা বোর্ড, সুপ্রীম সোবিয়েৎ ও কমিউনিস্ট পার্টি। সোবিয়েৎ-গোষ্ঠীর মধ্যে ঝগড়া মেটানোর জন্যে কোনো পরিকল্পনা বোর্ড আছে? কোনো উচ্চতম সোবিয়েৎ? কমিনফর্ম ভেঙে দেওয়ার পর থেকে কোনো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা? 'সার্বভৌম' পোলাণ্ড আর 'সম-মর্যাদাসম্পন্ন' সোবিয়েৎ ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি থাকলেই যথেষ্ট হয় কি? 'ওয়ারশ চুক্তি'তে কি এ সব প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে?

পোল্‌রা স্বাধীনতাও চায়, যে সোবিয়েৎ-গোষ্ঠী তাদের সাহায্য করার শক্তি রাখে তার সঙ্গে মিলনও চায়—যে মতবাদের ভিত্তির উপর, যে বাস্তব আকারে তাদের এই দুই কামনার মিলন ঘটানো যায়; সে তত্ত্বগত ভিত্তি ও সে আকার উদ্ভাবন করবে কে? কোন্ পুরুষ বা কোন্ নারী বা কোন্ সমিতি তা করবে? রুশ, পোল্, না চেক্—কে এটা করবে? আমার মনে হয়, কোনো রুশ এটা করবে না, কারণ, রুশরা নিজেদের দেশেই একটা প্রকাণ্ড কাজে ব্যস্ত—সে কাজের মূল আবার রয়েছে 'স্তালিন যুগে'। কোনো চীনা হয়তো করতে পারে—এ পর্যন্ত লিউ শাও-চি'ই জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার সম্পর্কে সব চেয়ে ভালো তত্ত্ব নির্ণয় করেছেন। ইতালির তোগ্‌লিয়াত্তিও করতে পারেন—সমাজতন্ত্রের বিভিন্ন স্বতন্ত্র পথ সম্বন্ধে, নতুন যুগের নতুন অবস্থার উপযোগী নতুন গড়ন ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সম্বন্ধে তিনি অনেক মৌলিক চিন্তা করেছেন। আমার মনে হয়, কোনো একজন চেক্‌ও এ কাজ করতে পারে—কারণ তাদের দেশ ছিল ইউরোপের রঙ্গভূমি, বৃহৎ শক্তিগুলোর বহু আক্রমণ তাকে সইতে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনোদিন তার স্বাধীনতা-প্রীতি বা সহযোগিতা-বোধ হারিয়ে ফেলেনি।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর নতুন পারস্পরিক সম্বন্ধের রূপ যিনিই নির্ধারণ করবেন, তিনি রুশ হোন বা চীনা বা চেক্ হোন, তিনিই হবেন ইতিহাসে স্তালিনের উত্তরাধিকারী, আর একটা যুগের গঠয়িতা। শুধু তাই নয়, তিনি কেবল সমাজতান্ত্রিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কাঠামোই খাড়া করবেন না, যে বিশ্ব-সরকার একদিন গড়ে উঠবেই উঠবে, তারও তিনি ভিত্তি পত্তন করবেন।